দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য

বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি

2515 Msc/15

6020

6020

অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য

এম্, এস্, সি ; বি, টি.

জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন রিসার্চ স্কলার—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

অধ্যাপক—শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়,

ভূতপূর্ব রিসার্চ ফেলো—পরিসংখ্যান বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং দার্জিলিং

শ্রীরামকৃষ্ণ বি, টি, কলেজের

ভূতপূর্ব অধ্যাপক

দি

নিউ বুক ষ্টল

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

৫/১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯
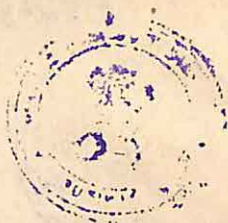
2515
6020
M/Se
15
SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য পিতামহ পণ্ডিত
৺হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের শ্রীচরণে
আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পিত হইল

নিবেদন

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে, যথা—শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, যাতায়াত, শিক্ষা প্রভৃতিতে প্রয়োগ পৃথিবীর সকল মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীতে ও তাহাদের মানসিক রাজ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু মানুষ নিজেকে এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিবর্তনের সহিত সুষ্ঠুভাবে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছে না।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত বৈজ্ঞানিক ধ্বংস লীলা মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টি করিতেছে। দেশ যখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় প্রভৃতির আশু সমাধানের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে, তখন আণবিক ভস্মের ধূম্রজাল তাহার সর্বপ্রকার ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। বিজ্ঞান সাধারণ মানুষকে এই ভাল ও মন্দের দোটানায় ফেলিয়াছে। "বিজ্ঞান কি" এবং "বিজ্ঞানী কি করিতে পারেন বা পারেন না"—এই সম্বন্ধে ভুল বুঝাবুঝির জন্য এই সংশয় ও সন্দেহ দেখা দিয়াছে।

বিজ্ঞান দেশের কয়েকটি মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষকের সৃষ্টি অল্পই হইবে। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়—অপ্রয়োজনীয়ও বটে। সে জানিবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি—যাহার উপর নির্ভর করিয়া বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তাহার জীবনের নিত্য সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইবে। বিষয়বস্তুর সহিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তাই আজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে।

খুবই আনন্দের কথা যে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে স্থান পাইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত না করিয়া এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরীর জন্য শিক্ষার্থীর সম্মুখে অখণ্ডরূপে সাধারণ বিজ্ঞানকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। আর তাহা ছাড়া বিষয়বস্তুতে পারদর্শী হইলেও যে

ভাল শিক্ষক হওয়া যায়—ইহা ঠিক নহে। দক্ষ শিল্পির ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইলে শিক্ষককে কিছু কৌশলও আয়ত্ত করিতে হয়। উক্ত দুইটি বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-বিজ্ঞানীর মূল্যবান অভিজ্ঞতার সহিত নিজ অভিজ্ঞতা মিশ্রিত করিয়া ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই বইখানি রচিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতির কোন বাংলায় লেখা বই বর্তমানে নাই। বইখানি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকার শিক্ষাদানকার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিবে—এই আশা রাখি।

বইখানি রচনার সময় অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন। বন্ধুবরকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রুফ সংশোধন কার্যে সহযোগিতা করিবার জন্য আমার স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমাখনলাল ভৌমিককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

সুধীবৃন্দের মূল্যবান উপদেশ ও সুপারিশ পাইলে বাধিত হইব। যাঁহাদের উদ্দেশ্যে বইখানি লিখিত হইয়াছে তাঁহাদের কাজে লাগিয়াছে জানিতে পারিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

গ্রন্থকার

নববর্ষ

১৩৬৯ সাল

সূচীপত্র

———

পৃথিবী ও বিজ্ঞান

আধুনিক জীবনে বিজ্ঞানের স্থান

ব্যবহারিক মূল্য :—বিজ্ঞান পাঠের ব্যবহারিক মূল্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে পরিদৃশ্যমান। নিত্য নূতন আবিষ্কার অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুত জগতের রুদ্ধ দুয়ার উন্মোচন করিয়া মানুষের চেতনা রাজ্যে এক আলোড়ন তুলিতেছে। নূতন সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে—নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইতেছে—পুরাতন বাণিজ্য ও শিল্পের ধারা দিন দিন পরিবর্তিত হইতেছে। গমনাগমনের সুযোগ উত্তরোত্তর বর্ধিত হওয়ায় দূরের মানুষ ধীরে ধীরে কাছে আসিতেছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর প্রান্ত পর্যন্ত একই সূত্রে গাঁথা হইয়াছে। মানুষের জ্ঞান তাহাকে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে লইয়া যাইতে নিত্য প্রেরণা জোগাইতেছে। ইহা সত্য যে আণবিক বোমায় পৃথিবী নিশ্চিহ্ন করা যায়—তবে এ কথাও ঠিক যে পৃথিবীর অভাব, অনটন, রোগ প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়া সমগ্র মানব-জাতিকে এক স্বাচ্ছন্দ্যময় ও প্রাণবন্ত জীবনের অধিকারী করিতে, সর্বদা সন্দেহ ও ক্ষুধার হাত হইতে রক্ষা করিতে এবং মানুষের সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধন করিতেও আণবিক শক্তি অক্ষম নহে।

বুদ্ধিগত মূল্য :—ব্যবহারিক মূল্য ছাড়া বিজ্ঞানের আর একটি বিশেষ দাম আছে—সেটি হইতেছে বুদ্ধিগত মান। বিজ্ঞান মনকে সুশৃঙ্খল করে। ধৈর্য ও অধ্যবসায় বিজ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ। সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং কুসংস্কারমুক্ত ও ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত উদার ও মুক্ত চিন্তা বৈজ্ঞানিককে অন্য সকল হইতে পৃথক করিয়া ফেলে। সমাজ জীবনে যাঁহারা লিপ্ত যেমন অর্থনীতিবিদ্,

রাজনীতিবিদ্, দেশনায়ক বা ব্যবসায়ী—সকলেই নির্লিপ্তভাব ও আবেগবিহীন বিচারের সঙ্গে নিজেদেরকে সহজে খাপ খাওয়াইতে পারেন না। কিন্তু সত্যের জন্য উৎসর্গীকৃত জীবনের ছোঁয়াচ সমাজে না লাগিয়া থাকিতে পারে কি?

সৌন্দর্যবোধ :—বৈজ্ঞানিকের কার্যাবলী এবং মানবকৃষ্টিতে তাহার দানের একটি সৌন্দর্যবোধের দিকও রহিয়াছে। নিম্নস্তরে সে মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে নিত্য সমৃদ্ধ করিয়া বিমল আনন্দের অধিকারী হইতেছে; অপরদিকে উচ্চস্তরে বিভিন্নমুখী ঘটনার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, নূতন ধারণা প্রদান করিয়া ও জ্ঞানরাজ্যের নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতেছে। যতই ক্ষুদ্র হউক নিজের উদ্ভাবনী শক্তিতে একটি যন্ত্র তৈরী করিয়া তাহাকে প্রয়োগসিদ্ধ করার মধ্যে এক অপরিসীম আত্মতুষ্টি বিদ্যমান। পর্য্যবেক্ষণের ত্রুটি বা যন্ত্রের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য দক্ষতার প্রয়োজন; হাসিমুখে নিজের চাহিদা অনুসারে বৈজ্ঞানিক তাহা অর্জন করেন। পরীক্ষা ও প্রতিপাদকের সময় বৈজ্ঞানিককে সকল সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ইহার মধ্যে তাহার সংস্কৃত মনের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। যুক্তি এবং কাজের মধ্যে এমন সহযোগিতা সচরাচর দেখা যায় না। গণিতের সূত্রের ন্যায় বিজ্ঞান পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণে একটি সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে। বিজ্ঞানে সাধারণীকরণের সামান্য চিন্তাটুকুও সমগ্র কল্পনা রাজ্যকে আলোড়িত করে। দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের সাহায্যে বিস্ময় ও সৌন্দর্যের নূতন জগতের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এতটুকু জীবন্ত প্রাণী অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারী হয়—একটু বরফ টুকরা চুনী বা হীরা অপেক্ষা বেশী আদৃত হয়—দূরের তারকা বিশ্ব সৃষ্টি করে। এই পর্যায়ে কলা ও বিজ্ঞানে ব্যবধান থাকে না, দুইই মানব সমাজে সৌন্দর্য দান করিবার ক্ষমতা অর্জন করে।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সীমা :—বৈজ্ঞানিক্ জ্ঞানের সীমা বহুদূর বিস্তৃত। প্রথমেই আসে গণিত। ইহার যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে তৈরী সূত্র বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক হিসাবের একমাত্র হাতিয়ার। সচল জিনিসের গতি, কাজ প্রভৃতি পরিমাপের ক্ষেত্রেও গণিতের প্রয়োগ দেখা যায়। আর একটি বিভাগ স্থির জিনিসে নিযুক্ত। কি করিয়া বিভিন্ন শক্তি প্রযুক্ত হইয়াও পদার্থ নিশ্চল থাকে, কি করিয়া

সেতু রেলগাড়ী বা ভারি জিনিস বহনে সক্ষম হয়, ক্রেন বা কপিকলের সাহায্যে কি করিয়া মাল উঠান বা নামান হয়—তাহা ফলিত গণিতের সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে। এমন কি জলে স্থির ও সচল বস্তুর গতি, কাজ প্রভৃতির পরিমাপও সম্ভব হইয়াছে।

পদার্থ বিদ্যা পদার্থের বিভিন্ন গুণের পরিমাপ করে। পদার্থের ঘনত্ব, তাপ গ্রহণ বা বিকিরণ করার ক্ষমতা, তাপের প্রভাব—আলোকের গতি—লেন্সের ধর্ম —শব্দের গতি বা কম্পনের হার—বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাব প্রভৃতি পদার্থ বিদ্যার এলাকার মধ্যে রহিয়াছে।

পদার্থ বিদ্যা হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া রসায়নবিদ্যা কি করিয়া পদার্থের উপাদানগত পরিবর্তন ঘটে তাহা লইয়া কারবার করে। যেমন লোহায় মরিচা পড়িলে কি ঘটে, খড়ি কি করিলে চূণে পরিণত হয়—কি করিয়া কোন প্রাণী জটিল খাদ্য হজম করে প্রভৃতি—এ সবই রসায়নবিদ্যা উত্তর দিতে পারে। এই সকল রূপান্তরের মধ্যে আণবিক পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে। পদার্থবিদের কাছে পদার্থ তিন প্রকার—কঠিন, তরল ও বায়বীয়; কিন্তু রসায়নবিদের কাছে পদার্থ দুই প্রকার—মৌলিক ও যৌগিক।

বিশ্বের গ্রহ, তারকা, উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতি লইয়া জ্যোতির্বিদ্যার এলাকা, নভমণ্ডলে তাহাদের অবস্থান ও গতি এবং আকৃতিগত ও রাসায়নিক পরিবর্তন লইয়া জ্যোতির্বিদ্যা ব্যস্ত থাকে।

জীববিদ্যা জীবের প্রকৃতি পরিবেশ দ্বারা কি ভাবে প্রভাবান্বিত হয় এবং পরিবেশকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করে প্রভৃতি আলোচনা করে। জীব জগতের বিজ্ঞানই হইতেছে জীববিদ্যা। উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা. বীজাণুবিদ্যা প্রভৃতি জীববিদ্যারই এক একটি অংশ।

বিজ্ঞানের নিখুঁত শ্রেণী বিভাজন সম্ভব নয়—উচিতও নয়। বিজ্ঞানে এক বিদ্যার জ্ঞান বিভিন্ন বিদ্যায় প্রযুক্ত হইতে পারে। যতই দিন যাইতেছে এক এক বিভাগের বিভাজন স্বতঃই ঘটিতেছে। সাধারণ বিজ্ঞান বিভাজিত হইয়া ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিশেষ বিজ্ঞানে পরিণত হইতেছে।

বিজ্ঞানের ধারণ ঃ—বৈজ্ঞানিকের কাছে দুই ধরনের অনুমান বিদ্যমান। প্রথমতঃ প্রতি ঘটনার একটি কার্যকারণ সম্পর্ক আছে ; দ্বিতীয়তঃ একই সর্তে একই কারণ সর্বদা একই ফল প্রদান করিবে। প্রথমটিতে বিশ্বাসবান হইয়া সে সীমাহীন অনুসন্ধানের পথে আনন্দ ও উদ্দীপনা লাভ করে এবং দ্বিতীয়টিতে বিশ্বাসবান হইয়া অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করে।

বিজ্ঞানের সীমা ঃ—বিশ্বের জ্ঞান সম্পদের মাঝে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক হিসাবে বৈজ্ঞানিক নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। এই বিশেষ বাস্তব ঘটনা এবং তাহাদের কার্য-কারণ সম্পর্ক লইয়া তিনি ব্যস্ত থাকেন। কোথায় বা সেই ঘটনার আরম্ভ, আর কোথায় বা তার লক্ষ্যস্থল, সে সম্বন্ধে তিনি নির্বাক। প্রাণী লইয়া তাঁহার কারবার—সেই প্রাণী কিরূপে পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়ায় তাহা তিনি অবগত আছেন ; কিন্তু তাহাদের অস্তিত্বের কারণ সম্বন্ধে তিনি নির্বাক। পদার্থের সহিত তাঁহার সম্পর্ক—তাহার মাপ নির্ণয় তাঁহার এলাকার বাহিরে। আণবিক বোমা তৈরীর কাজে তিনি আগ্রহী—ব্যবহারে লাভ বা ক্ষতি তাঁহার হিসাবের মধ্যে নাই।

বিজ্ঞান কোন জিনিসের ভাল বা মন্দের বিচার করে না। কোনটি "হওয়া উচিত" বা "হওয়া উচিত নয়" তাহা লইয়া মাথা ঘামায় না। একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে বৈজ্ঞানিক এই সব বিষয়ে অভিমত দিতে পারেন ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক নীতি তাঁহাকে ঐ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ করে না। এক কথায় যে সকল বুদ্ধিমান লোক এই সকল সমস্যা লইয়া মাথা ঘামায় তাঁহাদের এ সকল বিষয়ের অভিমত অপেক্ষা তাঁহার অভিমত নিকৃষ্ট হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি ?

সত্যের পশ্চাতে ধাবমান গর্বিত বর্তমান বৈজ্ঞানিক কিন্তু একটি অতি সাধারণ মানুষ। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে যাহার জন্য তাঁহার এই জীবনব্যাপী সাধনা তা কেবল সত্যের এক কণিকা মাত্র। তাঁহার এলাকার বাহিরের সকল রকম সমস্যায় নিজে অভিমত প্রদানে তিনি বিরত থাকিবেন। কত প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মুখে শোনা যায় যে সারা জীবন সত্যের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া

তাঁহারা সঙ্গীত, সাহিত্য, কবিতা বা জীবনধারণের সুস্থ ও স্বাভাবিক কার্যাবলী হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান সীমাবদ্ধ হইতে পারে ; কিন্তু সত্যের জন্য তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ঘটনাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইতে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মধ্যে তাঁহার যে অন্তর্দৃষ্টি ও দক্ষতা রহিয়াছে তাহা অন্যান্য এলাকায় সঞ্চারিত হইবে। তাই বিশ্বের দরবারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকের অমূল্য দানের কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

বিজ্ঞানের এলাকা আজও সীমাবদ্ধ এবং সেইজন্য বিজ্ঞান শিক্ষককে অসুবিধায় পড়িতে হয়। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীকে ক্রমান্বয়ে অনুধাবন করিতে হইবে যে তাহাদের সকল ব্যাখ্যাগুলি ঠিক শেষ ব্যাখ্যা নহে। শিক্ষক সমস্যাটিকে ঠিক সমাধান করিতে পারে না—সমাধানের শেষ পর্যায়ের নিকটবর্তী করে।

সরু কাঁচের নলের মধ্যে জল উপরে উঠে। কেন? কারণ তলচাপ (Surface Tension)। শিক্ষক কি এইখানেই থামিবেন—না আরও অগ্রসর হইবেন? ঘটনাটিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে—কারণ অনুসন্ধান করা হইয়াছে—এবং তলচাপ রূপ ছাঁচের মধ্যে তাহাকে ফেলা হইয়াছে। এই প্রসংগে হয়তো আরও দুই এক ধাপ অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। তখন তিনি প্রশ্নটিকে এইখানে ছাড়িয়া দিতে পারেন (যদি শিক্ষক মানিয়া লন যে "সরু কাঁচের নলের মধ্যে জল উপরে উঠে কেন?" এই প্রশ্নটির সঠিক জবাব মিলে নাই) ; কিন্তু আরও দক্ষ শিক্ষক প্রশ্নটিকে এখানে ছাড়িয়া দিতে নারাজ হইবেন। প্রশ্ন করিবেন, "তলচাপ কিরূপে হয়?" উত্তর আসিবে—"পদার্থের অণুদের মধ্যে আকর্ষণের ফলে।" উত্তরটি সমাধানের দিকে এক ধাপ ঠেলিয়া দিল। পরে তিনি প্রশ্ন করিবেন—"কেন এক অণু অন্য অণুকে আকর্ষণ করে?" উত্তর আসিবে—"মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (Gravitation) জন্য।" এইখানে শিক্ষক আবার একটি ছাঁচে ফেলিয়া দিলেন। কারণ "কেন মাধ্যাকর্ষণ কাজ করে" এই প্রশ্নের উত্তর তাঁহারও অজ্ঞাত।

কতদূরে গিয়া শিক্ষক ছাড়িয়া দিবেন তাহা তাঁহাকেই নির্ণয় করিতে হইবে।

তাঁহার জ্ঞানের সীমা, শিক্ষার্থীর বয়স ও আগ্রহ, পাঠ্যতালিকার সময় এবং পাঠ্যক্রমের চাপের উপর শিক্ষকের এই বিচার নির্ভর করিবে। কিন্তু যখন শ্রেণীর বুদ্ধিমান শিক্ষার্থী এইরূপ প্রশ্নের পর প্রশ্নে সমস্যাটিকে এক ধাপ করিয়া আগাইয়া লইয়া যাইবে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলে পাল্লা দিয়া শেষ সমাধানটির পশ্চাতে ধাবিত হইবে—তখন শ্রেণী এবং শিক্ষক যে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে তাহা উত্তেজনাপূর্ণ, চাঞ্চল্যকর ও চমকপ্রদ।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ঃ—বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা, তার প্রতিটি অংশের বিশ্লেষণ করা এবং যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে জ্ঞাত ঘটনাগুলির মধ্যে সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করাই বৈজ্ঞানিকের কাজ। সেইজন্য তাঁহাকে সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা পরিচালনা করিতে হয়। পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া দেখিবার জন্য তিনি বিবিধ পদার্থ গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য জিনিস বায়ুর চাপ, তাপ প্রভৃতি ধ্রুবক রাখিয়া তিনি পরীক্ষা করেন। কেবল মাত্র বিভিন্ন পদার্থের (কঠিন, তরল, বায়বীয় পদার্থ) উপর তাপ প্রয়োগ করিয়া তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাকে এইরূপ নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার সাহায্য লইতে হয়। এইরূপ বিশেষ বিশেষ ঘটনা ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি একটি সাধারণ সূত্র তৈরীর চেষ্টা করেন। বিশেষ বিশেষ ঘটনার সাধারণীকরণের মাধ্যমে একটি ধারণা (Hypothesis) গড়িয়া উঠে, আরও বিভিন্ন ঘটনায় সেই ধারণার প্রয়োগ চলে। ধীরে ধীরে ধারণাটি প্রয়োগসিদ্ধ হয় এবং তখন ধারণা "তথ্যে" পরিণত হয়। ঐ তথ্য বৈজ্ঞানিক অন্যান্য তথ্যের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইলে এবং ভবিষ্যৎবাণী করিবার অধিকারী হইলে "আইনে" পরিণত হয়। বৈজ্ঞানিক "আইন" ও দেশের "আইন" এক জিনিস নয়। প্রথমতঃ একটি আইন অপরটির বিরুদ্ধাচরণ করিলে একটিকে পরিবর্তিত বা নিশ্চিহ্ন হইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক আইন বলে "ইহা হইতে পারে" বা "যতদূর জানি ইহা সত্য।" বৈজ্ঞানিক নীতির কোন নৈতিক চাপ নাই—ব্যক্তিবিশেষের আচরণ সমর্থন বা বিরুদ্ধাচরণের উপর ইহা নির্ভরশীল নয়। বৈজ্ঞানিকের অভিমত সম্ভাবনার নীতি অনুসরণ করে এবং তাঁহার সকল প্রকার ব্যাখ্যা বিভিন্ন প্রকার

সমস্যার নূতন সমাধানের পথ পরিষ্কার করে। তাঁহার কৌতূহলের চরম নিবৃত্তি সম্ভবপর নয়।

ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানঃ—বিশ্বের বিশালত্ব এবং তৎসংক্রান্ত তথ্যের জটিলতা ক্ষিপ্র গতিতে বর্ধিত হইতেছে। অসংখ্য আবিষ্কার সত্ত্বেও জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত তথ্যের ব্যবধান ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।। নিত্য নূতন জগতের দ্বার বৈজ্ঞানিকের কাছে উন্মুক্ত হইতেছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দির ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অধিকাংশ প্রশ্নের জবাব দিতে সাহায্য করে। কিন্তু এই আবিষ্কার চরম নয়। শূন্য মার্গের রহস্য, ঔষধ হিসাবে আইসোটোপের ব্যবহারে জটিলতা প্রভৃতি বিস্ময়কর তথ্যানুসন্ধানে আজ বৈজ্ঞানিক ব্যস্ত। এমন দিন হয়তো শীঘ্রই আসিবে যে দিন শিক্ষার্থীদের চাঁদের দেশে চড়ুইভাতি করার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হইবে।

অজ্ঞাত রাজ্যে বিজ্ঞানঃ—বিশাল বিশ্বে বিবিধ আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও মানুষ এখনও বহু মৌলিক প্রশ্নের জবাব পায় নাই। শতাব্দির পর শতাব্দি এই সকল প্রশ্ন মানুষকে বিহ্বল এবং ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এরূপ বহু প্রশ্ন আছে। যেমন "আমরা কিরূপে দেখি?" আমরা জানি যে চক্ষুর লেন্সের দ্বারা পশ্চাতের পরদার উপর আলো পড়ে, সেখানে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে এবং উহা ঐ পর্দার পশ্চাতে সংযুক্ত অসংখ্য স্নায়ু প্রান্তে বৈদ্যুতিক স্রোতের মত উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এই স্রোত বিভিন্ন সংযোগগ্রন্থি পার হইয়া চক্ষুর স্নায়ু দ্বারা মগজে নীত হয়। কিন্তু কিরূপে আমরা বিচার করি যে, এটা একটা বই, ওটা একটা টেবিল —তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আমাদের শরীরের একই রক্তরস কিরূপে এখানে হাড়ে—ওখানে মাংসপেশীতে—আবার অন্যস্থানে শিরা বা ধমনীতে খাদ্য জোগাইতেছে? পরগাছা কিরূপে আত্মনির্ভরশীল থাকে? স্নায়ু সংযোজনায় যে সাইন্যাপস্ আছে কিরূপে তাহারা কাজ করে? জীবনী শক্তি (life force) কি? জীবিত ও মৃত প্রাণীতে তফাৎ কি? এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত জবাব এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। শিশুদের পাঠদানের সময় শিক্ষক বিজ্ঞানের রহস্যের কথা—তাহার আবিষ্কারের কথা জানাইবেন। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর নিকট

জ্ঞানদানের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের অক্ষমতাকেও বুদ্ধিমান শিক্ষক প্রকাশ করিবেন। এই অজ্ঞাত রহস্য সুসংহত মনের নূতন খোরাক হইবে।

বিজ্ঞানের চাহিদা ঃ—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অস্বাভাবিক দারিদ্র্যের মধ্যে কাল কাটাইতেছে। কি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারে তাহা তাহাদের কাছে অজ্ঞাত। প্রাচুর্যের দেশে অভাব বিরাজ করিতেছে। হাজার হাজার বিঘা জমি পতিত রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক পন্থায় ফসল ফলাইতে পারিলে খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হইতে পারিত; লক্ষ লক্ষ লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণ হারাইতেছে—স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারিত; অসংখ্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন—খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, সামুদ্রিক সম্পদ, বাতাস, জলপ্রপাত, সূর্যের তাপ প্রভৃতি অকারণে নষ্ট হইতেছে—উন্নত জীবন যাপনের জন্য কার্যকরীভাবে তাহাদিগকে ব্যবহার করা যাইত। এইরূপ উদাহরণের শেষ নাই। কিন্তু ঐগুলিকে কাজে লাগানোর অন্তরায় অনেক। যাহারা ইহার ফল ভোগ করিবে তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে ইহা সম্ভবপর নয়। তাহাদের জ্ঞানের পর্যায়কে উন্নত করিতে হইবে। ভাঙ্গা হাতুড়ি ও অদক্ষ মিস্ত্রী কাজের পরিবর্তে অকাজই বেশী করিয়া থাকে। সেরা বীজ অনুপযুক্ত সময়ে ও পরিবেশে বপন করিলে তাহাতে ভাল ফল নাও জন্মিতে পারে। তাই বৈজ্ঞানিক পরিবেশিত পদ্ধতিগুলি যদি বৈজ্ঞানিক সাধারণ জ্ঞানে সমৃদ্ধ মানুষের হাতে পড়ে তবেই তাহাতে সুফল আশা করা যায়—নতুবা সহযোগিতার অভাবে দারিদ্র্যের সহিত হতাশা আসিয়া মানুষকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। তাই কোন দেশের জীবনযাত্রাপ্রণালী উন্নত করার পথ দুইটি। একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং অপরটি হইতেছে ঐ জ্ঞানকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করিতে সক্ষম এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ মানুষ। এই দুইটির কোন একটির অভাব হইলে চলিবে না।

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের স্থান

ক্রমবর্ধমান বিশ্বের প্রতিটি অংশে বিজ্ঞানের কল্যাণকর স্পর্শ রহিয়াছে। কি ব্যক্তিগত জীবনে—কি সমাজ জীবনে—সর্বত্রই বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদিগকে প্রভাবান্বিত করিয়া চলিয়াছে। মানুষ সমুদ্রের তলদেশ হইতে মূল্যবান সম্পদ আহরণ করিতেছে—স্থলে প্রাকৃতিক সম্পদকে তাহার জীবন-ধারণের সহায়ক করিতেছে—মহাশূন্য হইতে শক্তি কাড়িয়া লইয়া তাহার নিজের কাজে লাগাইতেছে—পৃথিবীর আকাশে কৃত্রিম গ্রহ ছাড়িয়া গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে যাইবার জন্য সিঁড়ি তৈরী করিতেছে—আণবিক বিস্ফোরণকে মানবকল্যাণ কাজে নিয়োজিত করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে। এমনকি অনুন্নত দেশগুলিকে ধীরে ধীরে উচ্চ পর্যায়ে লইয়া যাইবার দায়িত্ব বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং জীবনের এইরূপ এক অপরিহার্য বন্ধুকে বিষয় হিসাবে পাঠ্যক্রমে স্থান দিবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ নিতান্তই অমূলক। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পাঠের বিবিধ উদ্দেশ্য বিদ্যমান। তাহাদের মধ্যে কয়েকটিকে আলোচনা করা হইল।

ব্যবহারিক মূল্য ঃ—আমরা বৈজ্ঞানিক যুগে বাস করিতেছি এবং প্রতি নিয়তই বিজ্ঞান সমুদ্রে হাবু-ডুবু খাইতেছি। জীবনের প্রতি স্তরে বৈজ্ঞানিক প্রভাব বিদ্যমান। পরিবেশের সহিত খাপ খাইতে হইলে বর্তমানে বিজ্ঞানের কি অবস্থা বা অগ্রগতি তাহা বিশেষ ভাবে জানা দরকার। আমরা যে কাপড় পরিধান করি, যে বাড়িতে বাস করি, আমাদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিস তৈরী, খাদ্য উৎপাদন, যানবাহন, বিলাস সামগ্রী, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি—সমস্তই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ব্যতিরেকে আমাদের পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইত।

বিজ্ঞান ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রচুর সাহায্য করিতেছে। ইহাকে সুষ্ঠু পরিচালনের কৌশল শিখাইয়াছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যানের সাহায্যে তাহাকে ব্যাখ্যা করিতে শিখাইয়াছে। বিজ্ঞান ব্যতীত শিল্প এক মুহূর্ত চলিতে পারে না। খনি হইতে

প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনে সাহায্য করিয়াছে—বিভিন্ন প্রকার ইস্পাত সৃষ্টি করিয়াছে—স্ফটিকস্বচ্ছ চিনি উৎপন্ন করিতেছে। বিজ্ঞানের জন্য বিভিন্ন পাতন-কেন্দ্র সৃষ্টি হইয়াছে। বড় বড় রাস্তা, সেতু, অগ্নিনিরোধক ইস্পাত ও সিমেণ্টের অট্টালিকা, তাপ ও বায়ু নিয়ন্ত্রিত সিনেমাগৃহ—এ সবই বিজ্ঞানের কল্যাণে সম্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর এক প্রান্তে বসিয়া অপর প্রান্তের সহিত যোগাযোগ স্থাপন, টেলিভিশন, রেডিও প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য উপভোগ্য বস্তু আমাদিগকে দান করিয়াছে। ট্রেণ, বাস, ট্রাম, জলজাহাজ, উড়োজাহাজ, হেলিক্যাপ্টার প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া গমনাগমনের সুবিধা করিয়াছে এবং দূরকে নিকট করিয়াছে। মানুষ আরও সময় সংক্ষেপ করার জন্য যানবাহনে রকেট ব্যবহার করার কথা চিন্তা করিতেছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে বিজ্ঞানের দান অপরিসীম। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে চিকিৎসাশাস্ত্র অনুন্নত ছিল। বৈজ্ঞানিক কৌশল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে চিকিৎসাবিদ্যা উন্নত হইয়াছে ও ভবিষ্যতে আরও অনেক হইবে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে যখন আত্মীয়স্বজন রোগীর রোগমুক্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতেছে—তখন বিজ্ঞান স্বর্গের অমৃতভাণ্ড হস্তে লইয়া মানুষের কাছে আসিয়া মুহূর্তে রোগের উপশম ঘটাইয়াছে। টীকা, সিরাম, এ্যান্টিভ্যাক্সিন, পেনিসিলিন, আইসোটোপ, প্রভৃতি রোগপ্রতিষেধক ও রোগ-নিরোধক ঔষধের আমদানী করিয়া মানুষকে নিরাপত্তা দান করিয়াছে। বিভিন্ন জৈব ও অজৈব ঔষধ সৃষ্টি করিয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। শরীর বিদ্যাতেও বিজ্ঞান বর্তমানে এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশের নিখুঁত জ্ঞান তাহাকে এক নূতন জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশাধিকার দিয়াছে। দেহের বিভিন্ন সূক্ষ্ম অংশকে অসাড় করিয়া যন্ত্রণাবিহীন অস্ত্রোপচারে মানুষকে সাহায্য করিয়াছে।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা জ্যোতির্বিদ্যাতেও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের প্রকৃতি ও সংগঠন সম্পর্কে অনুধাবন করিতে সে সাহায্য করিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে বিশ্বের তুলনায় আমাদের পৃথিবী যে কত ক্ষুদ্র তাহা ধরা পড়িতেছে।

নূতন গ্রহের সহিত আত্মীয়তাসূত্র রচনা করিতেছে। পৃথিবীর উপরে যে মহাশূন্য বিরাজমান বিজ্ঞান তাহার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করিতেছে। বাতাসের গতিবিধি ও তাহার উষ্ণতা দেখিয়া সেই সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে ভূমি ও কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সুবিধা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ঐ সকল বিষয়ে পূর্বের কুসংস্কার দূরীকরণে সাহায্য করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান জীবনের বিভিন্ন কার্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। শিক্ষা এবং মনস্তত্বে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে বিজ্ঞানের যুগান্তকারী দান বর্তমানে আশীর্বাদ হিসাবে দেখা দিয়াছে। কি মনোবিজ্ঞান—কি সমাজবিজ্ঞান—সর্বত্রই বিজ্ঞানের প্রভাব পরিদৃশ্যমান। মানুষের ক্ষমতা, দক্ষতা, আগ্রহ, মেজাজ বা তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ দেখিয়া বিভিন্ন কার্যে নিয়োগ করা যাইতেছে।

অবসর মানুষের কাছে আর একঘেয়ে কালোপহরণ নয়। বিজ্ঞান মানুষকে যথাযথভাবে অবসর কাটাইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছে। বিজ্ঞানে সাধারণ জ্ঞান থাকিলে শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবনে বিভিন্ন কল্যাণকর কার্যে প্রেরণা যোগাইবে। যেমন অবসর সময়ে মানুষ যে উদ্যানে সব্জি বা ফুলের চাষ করিবে তাহার জন্য চারা তৈরী, মাটি, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা, বৈজ্ঞানিক প্রথায় সার তৈরী, আবহাওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহার ন্যূনতম জ্ঞান থাকা দরকার।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিজ্ঞান একাধারে ব্যক্তি ও সমাজকে উন্নতির চরম শিখরে লইয়া যাইবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর সমস্যা সমাধানে এবং সুস্থ জীবনযাত্রা প্রণালীতে প্রযুক্ত হইয়া ব্যক্তি ও সমজাকে প্রতি নিয়তই উন্নততর পর্যায়ে লইয়া যাইতেছে।

সঞ্চরণ মূল্য ঃ—বিজ্ঞান শিক্ষাদানের মধ্যেই তাহার সঞ্চরণ ক্ষমতা রহিয়াছে। কোন এক বিষয়ের শিক্ষা এবং তাহার মান অন্য বিষয়ে সাহায্যকরী হওয়ার নামই সঞ্চরণ। বিজ্ঞান মানুষের মনকে শিক্ষিত করে এবং সুঅভ্যাস সৃষ্টিতে সাহায্য করে। বিজ্ঞান মানুষকে চিন্তাশক্তি প্রদান

করে, তাহার বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে, তাহাকে অধিকতর সচেতনতা দান করে এবং যুক্তিযুক্ত বিচারের অধিকারী করে। ইহা দুঃখ ও কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করিতে, সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, অনুসন্ধিৎসু মন, অজানাকে জানিবার বাসনা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা প্রদান করে। আবিষ্কারে ধৈর্য এবং অধ্যবসায় একান্ত প্রয়োজনীয়। আবিষ্কারের পথ কণ্টকপূর্ণ। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া জীবনের সর্বপ্রকার বিলাসব্যসন এড়াইয়া স্থির চিত্তে নিজের লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য বৈজ্ঞানিককে জীবনব্যাপী সাধনা করিতে হয়। কুসংস্কার বৈজ্ঞানিককে বিপথগামী করিতে পারে না। ঘটনার উপর তাহার কার্য-কারণ সম্পর্কের উপর তাঁর মত প্রতিষ্ঠিত।

সঞ্চারিত ক্ষমতাগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান—(১) সমস্যাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করা, (২) সমস্যাকে সমাধান করিবার জন্য পদ্ধতি নিরূপণ, (৩) সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে সংখ্যাগত মান সংগ্রহ এবং (৪) সংগৃহীত মান হইতে সিদ্ধান্ত সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্যবহারিক মূল্য আলোচনায় যে সকল ক্ষেত্রের কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে সে সকলই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ফল।

আর একটি উল্লেখযোগ্য সঞ্চারিত ক্ষমতা হইতেছে—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। এ কথা ঠিকই যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক তৈয়ারী করিতে পারা যায় না; ইহা এই পর্যায়ের শিক্ষার গণ্ডীর বাহিরে অবস্থিত; কিন্তু এ কথা ঠিক যে ভবিষ্যৎ সকল নাগরিকের পক্ষে বিজ্ঞানে ন্যূনতম দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করিবার দায়িত্ব, অধিকার ও যোগ্যতা বিজ্ঞানের রহিয়াছে। ইহারই ফলে শিক্ষার্থী প্রতি ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করিতে শিখে, ঘটনার কারণ সম্পর্কে দুর্দমনীয় ঔৎসুক্য পোষণ করে, তাহাকে ঠিক মত ওজন করিয়া গ্রহণ করে এবং অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করিবার মত উদার মনের অধিকারী হয়। সে হঠাৎ কোন সূত্র চরম বলিয়া গ্রহণ করে না—পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সূত্রের জন্য প্রতীক্ষা করে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খুব কার্যকরী ভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব। কারণ শিক্ষার্থী এখানে বিশেষ বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করে। এই গুলিকে ঠিকমত শাণিত করিলে শিক্ষার্থীর চিন্তা সুসংহত ও বলিষ্ঠ হইবে।

কৃষ্টিগত মূল্য ঃ—বংশ পরম্পরাক্রমে বিজ্ঞান তাহার সামাজিক ঐতিহ্য ক্রমান্বয়ে হস্তান্তরিত করিয়া চলিয়াছে। বিজ্ঞান তাই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারক, বাহক এবং সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। কৃষ্টি শব্দটি কৃষ্-ধাতু হইতে আসিয়াছে। ইহার অর্থ কর্ষণ করা। কৃষ্টির মধ্যে তাই দুই প্রকারের ক্রিয়া বিদ্যমান—সংরক্ষণ ও অপরটি সৃজন। সর্বপ্রকার গবেষণা, তথ্য এবং সাহিত্য বিজ্ঞান নিজের বুকে ধারণ করিয়া অতীতের সকল রকম সম্পদের সাক্ষ্য দিতেছে। ইহারই ভিতরে বিজ্ঞানের নিজের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাস, বৈজ্ঞানিকের রোমাঞ্চকর তথ্যানুসন্ধান, তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী এবং আত্মোৎসর্গের কাহিনী—বিজ্ঞানকে এক শ্রেণীর মানবীয় সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে।

কিন্তু এইখানেই বিজ্ঞানের শেষ নয়। পুরাতনকে সংরক্ষণের ভার লইলেও ইহাতে সে সন্তুষ্ট নয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ মানুষের মন যুক্তিযুক্ত হয়, তাহার বিচার শক্তি, বৈজ্ঞানিক সংগঠনের শক্তি বহু পরিমাণে বর্ধিত হয়। জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করিবার জন্য তাহার কল্পনাশক্তি বাড়ে। পুরাতনকে কেবল নকল করা নয়—এই ক্রমবর্ধমান সমস্যাসঙ্কুল সামাজিক পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াইবার জন্য কল্পনাশক্তির দ্বারা নূতন আবিষ্কারের পশ্চাতে অদম্য উৎসাহে অগ্রসর হইতে হয়। তাই সংরক্ষণ ও সৃষ্টি সমভাবে পাশাপাশি চলিয়া বৈজ্ঞানিকের জীবন তথা সামাজিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে। এই দুই-এর সার্থক সংমিশ্রনে তৈয়ারী হইয়াছে মানুষের সভ্যতা ও কৃষ্টি। এই সভ্যতা ও কৃষ্টিকে রক্ষা করা এবং উন্নয়ন করার সকল দায়িত্ব আমাদেরই। তাই নূতন আবিষ্কারে যে সম্পদ আহৃত হইতেছে তাহাকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবার ব্রত আমাদেরই গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃত্তিমূলক মূল্যঃ—বিজ্ঞান বর্তমানে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের পথ সুগম করিয়াছে। দেশে চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দিন দিন গড়িয়া উঠিতেছে। তাই বিজ্ঞান বহু লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের এক মাত্র অবলম্বন হিসাবে গণ্য হইয়াছে। ব্যক্তি নিজস্ব ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন বৃত্তিগত কৌশল অর্জন করিতেছে, অপরদিকে তাহার বৃত্তিগত উন্নত যোগ্যতা সমাজ উন্নয়নের কাজে সাহায্য করিয়াছে।

উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে ব্যবহারিক মূল্য, সঞ্চরণ মূল্য, কৃষ্টিগত মূল্য এবং বৃত্তিগত মুল্যের জন্য বিজ্ঞানকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করা উচিত।

বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্যঃ—কোন গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার যে সকল সাধারণ উদ্দেশ্য বিদ্যাদান, পাঠ্যক্রমের যে কোন বিষয়ে সেই সকল উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হওয়া উচিত। শিক্ষানীতিতে শিক্ষার সেই সকল উদ্দেশ্য লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে কার্যকারিতা এবং নির্বাচনের পটভূমিকায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলিকে আলোচনা করা হইবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যের কার্যকারিতাঃ—পাঠ্যক্রম যে কোন বিষয়ের উদ্দেশ্য বর্ধনের দিক (direction of growth) প্রদর্শন করাইবে—কখনও শেষ লক্ষ্যে পৌছিয়া দিবে না। বিজ্ঞানে ইহার ব্যতিক্রম নাই। এই প্রকারে উদ্দেশ্য বাছাই করা উচিত যেন ব্যক্তির বর্ধন ও ক্রমবিকাশ সে দিকে পরিচালিত হয়। বাস্তব দৃষ্টিতে উদ্দেশ্য নির্বাচন এবং সংগা প্রদান এমন হইবে যে তাহার পরিমাপ যেন সম্ভবপর হয়। সেইখানে এমন উদ্দেশ্যের সঙ্গে মূল্যায়নের নিকটতম সম্পর্ক বিদ্যমান। এইরূপ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নির্ণয় করা খুব কঠিন নয়। কয়েকটি নীচে আলোচিত হইল। মনে রাখিতে হইবে যে ঐ গুলি ছাড়াও আরও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে।

১। বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য গণতান্ত্রিক পরিবেশে শিক্ষার উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত হইবে।

২। শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহের দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

৩। শিক্ষার্থীর নাগালের মধ্যে থাকিবে।

৪। শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা নির্বাচনে পথদ্রষ্টা হইবে।

৫। শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা সংগঠনে সাহায্য করিবে।

৬। শিক্ষার্থীর আচরণ সংস্কৃত করার কাজে শিক্ষাকে পরিচালিত করিবে।

৭। শিক্ষার ফলাফল জ্ঞাত হওয়ার জন্য তাহার মূল্যায়নে সাহায্য করিবে।

উদ্দেশ্য নির্বাচনে নীতি নির্ধারণ :—সভ্যতার সংগে সংগে সামাজিক জটিলতা দ্রুত বর্ধিত হইতেছে। বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী পরিবেশে সেইজন্য খাপ খাওয়া শিক্ষার্থীর পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ের সময় সেইজন্য যেগুলি কার্যকরী সেইগুলিকে নির্বাচন করিতে হয়। এই কারণে উদ্দেশ্য এবং খাপ খাওয়ানোর মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার জন্য কিছু নীতি নির্ধারণ করার দরকার হয়। নীচে কয়েকটি নীতি আলোচিত হইল :

("Science Education in American Schools," Forty-ninth yearbook of the National Society for the study of Education Part 1. Uuiversity of Chicago Press, Chicago, 1947)

১। প্রথমতঃ উদ্দেশ্য যেন ব্যবহারোপযোগী হয় ; একটি পর্যায়ের সংগে অপর আর একটি যুক্তিযুক্তভাবে গ্রথিত থাকিবে।

২। দ্বিতীয়তঃ উদ্দেশ্যের বিবৃতি যেন মনস্তত্ত্বসম্মত হয়। ইহাকে শিক্ষানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

৩। তৃতীয়তঃ উদ্দেশ্য যেন পরিবেশের অনুকূলে লভ্য হয়।

৪। চতুর্থতঃ গণতান্ত্রিক সমাজে প্রতি উদ্দেশ্যই যেন সর্বজনীন (Universal) হয়।

৫। পরিশেষে উদ্দেশ্যের বিবৃতি এবং ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষভাবে শ্রেণীর কাজ এবং অভীপ্সিত পরিবর্তিত আচরণকে নির্দেশ করিবে।

উক্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া উক্ত সমিতি যে উদ্দেশ্যের তালিকা প্রণয়ন করেন তাহা নীচে আলোচিত হইল ঃ

১। ঘটনা সম্পর্কে কার্যকরী জ্ঞান ঃ—

(ক) বিশ্ব—পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, আবহাওয়া।

(খ) জীব—উদ্ভিদ ও প্রাণী।

(গ) মানব শরীর—গঠন, কাজ এবং তত্ত্বাবধান।

২। কার্যকরী ধারণা ঃ—

(ক) আকাশ অনন্ত।

(খ) পৃথিবী প্রাচীন।

(গ) ক্ষুদ্র জীব হইতে সকল প্রাণীর সৃষ্টি।

(ঘ) সকল পদার্থেই প্রায় বৈদ্যুতিক গঠন বিদ্যমান।

৩। নীতি সম্বন্ধে কার্যকরী জ্ঞান ঃ—

(ক) সকল জীবেরই প্রজনন ক্ষমতা আছে।

(খ) শক্তি এক প্রকার হইতে ভিন্ন প্রকারে রূপান্তরিত হয়।

৪। যান্ত্রিক দক্ষতা

৫। সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ঃ—

(ক) সমস্যা অনুধাবন

(খ) অস্থায়ী ব্যাখ্যা ও ধারণা সৃষ্টি

(গ) ধারণাকে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই।

৬। দৃষ্টিভঙ্গী ঃ—

(ক) সংস্কার মুক্ত উদার মন এবং নূতন মত গ্রহণে আগ্রহ

(খ) মানসিক সততা—বৈজ্ঞানিক সুসংহতা প্রকাশ।

৭। উপলব্ধি ঃ—

(ক) বৈজ্ঞানিকদের কার্যাবলীর উপলব্ধি।

(খ) মৌলিক কার্য-কারণ সম্পর্কে উপলব্ধি।

৮। আগ্রহ ঃ—

(ক) অবসর সময়ে বা শখ (hobby) হিসাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশে আসক্তি।

(খ) বৃত্তি হিসাবে বিজ্ঞানে আগ্রহ।

বিজ্ঞানের উক্ত উদ্দেশ্যগুলি আমেরিকার প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে পরিদৃশ্যমান।

উপরে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য আলোচনা করা হইয়াছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নের নিমিত্ত একটি নিখিল ভারত সেমিনারের ব্যবস্থা করেন। তাহাতে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠের কি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত তাহা আলোচিত হয়। তাঁহাদের মতে—

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য হইবে—

১। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করা ও তাহা রক্ষা করা।

২। শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ, পুনরাবিষ্কার ও শ্রেণীবিন্যাসের অভ্যাস সৃষ্টি করা এবং যথাযথ চিন্তাশক্তির উন্মেষ সাধন করা।

৩। সৃষ্টিমূলক এবংআবিষ্কারমূলক শক্তির বিকাশ সাধন।

৪। পরিচ্ছন্ন এবং সুশৃংখল অভ্যাস তৈরী করা।

৫। জীবন যাত্রা প্রণালীর স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠন।

(খ) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উক্ত উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও নিম্নে প্রদত্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি থাকিবে।

৬। প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ এবং সাধারণ বিজ্ঞান পাঠের বুনিয়াদ সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন।

৭। সাধারণীকরণের ক্ষমতা সৃষ্টি করা এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্যায় সেগুলির প্রয়োগ।

৮। জীবনের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব অনুভব করা।

৯। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শখের (hobbies) জন্য আগ্রহ সৃষ্টি।

১০। বৈজ্ঞানিকদের জীবন এবং তাহাদের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান পাঠে আগ্রহী করা।

(গ) উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইবে—

(১) নিজের বাসভূমি পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ এবং সমাজের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে ওয়াকিবহাল করা।

(২) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান দান এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তৈয়ারী করিতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

(৩) বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা প্রদান—যাহাতে শিক্ষার্থী বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের বিবর্তন ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

বিজ্ঞান শিক্ষাদানের মনস্তত্ত্ব

শিক্ষাদান কি ? অনেকের ধারণা শিক্ষাদান বলিতে আমরা বুঝি—কোন ব্যক্তি বা প্রাণীকে কিছু শিক্ষা করিতে সাহায্য করা, অর্থাৎ কিছু জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গী, আদর্শ, অভ্যাস প্রভৃতি যেগুলির অধিকারী সে পূর্বে ছিল না সেইগুলির অধিকারী হইতে সাহায্য করা। শিক্ষাদান হইতেছে উত্তেজনা এবং শিক্ষা তাহারই প্রতিক্রিয়া। সেইজন্য বিজ্ঞান শিক্ষকের কাজ হইতেছে শ্রেষ্ঠ উত্তেজনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষায় অধিকারী করা। এখন প্রশ্ন আসিতে পারে—শিক্ষা দান ক্রিয়াটি কলা না বিজ্ঞান ? তাহার উত্তরে বলা যায় যে ইহা দুইই। যতই দিন যাইতেছে শিক্ষাদান নিত্য নূতন তথ্যে সমৃদ্ধ হইতেছে। নূতন তথ্য ও ঘটনা পুরাতনের সংগে সংযুক্ত হইয়া তাহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটাইতেছে। তাই বিষয় জ্ঞানের সংগে সংগে নূতন পদ্ধতি ও কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষক যতই ওয়াকিবহাল থাকিতে পারেন ততই শিক্ষাদান কার্য সফল হইবে।

একথা বলাই বাহুল্য যে ঘটনা বা নীতি জ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা থাকিলেও শিক্ষাদান ভাল নাও হইতে পারে। গানের সুর সম্বন্ধে সমগ্র ব্যাকরণ জানা সত্ত্বেও অনেকে ভাল গায়ক নাও হইতে পারেন। সুগায়ককে এর দুইই উত্তমরূপে জানিতে হইবে। শিক্ষাদান সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তাহার সার্থক প্রয়োগ এক কথা নহে। শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের উপর শিক্ষকের শিক্ষাদান যাচাই হয়।

বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্যের উপর যথাযথ নজর দিয়া শিক্ষার্থীকে সেই লক্ষ্যে পৌছাইয়া দেওয়াই শিক্ষকের কাজ। এই অধ্যায়ে (১) মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্যের বিশ্লেষণ, (২) শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে এমন সব ঘটনা এবং (৩) শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক নীতি নির্ধারণ—এই তিনটি বিষয় আলোচনা করা হইবে।

TRAINING COLLEGE BANIPUR

১। **বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ঃ**

(ক) **কার্যকরী জ্ঞান লাভ**—উত্তেজনা ও তাহার প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কোন বিষয় সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করি। শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি দ্বারা এই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ক্রমে এই উত্তেজনার অর্থ শিক্ষার্থীর নিকট পরিস্ফুট হয়। তাই তখন অর্থযুক্ত সংবেদন 'বেদন'-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়। পূর্ব জ্ঞানের আলোতে শিক্ষার্থী উত্তেজনার অর্থ বাহির করে।

সংবাদবহুল পাঠকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) প্রত্যক্ষ-ভাবে কোন জিনিসকে দেখা, যেমন—কোন বস্তু বা নমুনা পরীক্ষা করা, প্রদর্শনীতে যোগদান, পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি। (২) অন্যের নিকট হইতে শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে নূতন করিয়া অনুবাদ করা। সংবাদবহুল পাঠকে প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। পূর্ব জ্ঞানের সাহায্যে তাহার অর্থ উদ্ধার করিতে হয়—তাহার অনুশীলন করিতে হয়। বিজ্ঞানের প্রতীকগুলি (M. V. T. ρ. ইত্যাদি) শিক্ষার্থীর নিকট কেবল নূতন অর্থ সৃষ্টি করে। পাথর শিক্ষার্থীর নিকট কেবল মাত্র শিলা নহে। কোন জাতীয় শিলা সে তাহা অনুধাবন করিতে চেষ্টা করে।

শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ধারণার (concept) অধিকারী করিয়া তুলিতে হয়। তাহাকে আয়তন, ওজন, অণু, গতি, বীজ, কাণ্ড প্রভৃতি শব্দের সহিত সর্বদা সংযোগ রক্ষা করিতে হয়। শব্দ যদি চিন্তার হাতিয়ার হয় তবে প্রতি শব্দের বিশেষ অর্থ থাকিবেই। এই অর্থই হইতেছে 'ধারণা'। এই বিষয়ে শিক্ষার্থীর বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। তাই বৈজ্ঞানিক শব্দ বা প্রতীকগুলিকে বারবার মনে করাইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং বৈজ্ঞানিক 'ধারণা' সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞান না থাকার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষার্থীর নিকট সরস হইয়া উঠিতে পারিতেছে না।

এখন কি করিয়া এই সকল 'ধারণা' তৈরী হয়? বয়সের সংগে সংগে শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও আয়ত্বের গণ্ডী বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাহার মানসিক পুষ্টি লাভ ঘটে। কিন্তু শিশু কাল হইতেই এই

অর্থবোধ ক্ষমতা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তবেই সে ক্রমবর্দ্ধমান অভিজ্ঞতার সাহায্যে ভবিষ্যৎ জীবনকে আনন্দের সংগে বরণ করিবে। বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে 'ধারণা' সরল হইতে ক্রমে জটিল আকার ধারণ করে। গাছ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর 'ধারণা' প্রথমে তাহার আকৃতি, আয়তন, রং প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু পরে সেই গাছ কোন্ শ্রেণীভুক্ত বা তাহার বিভিন্ন অংশ—যথা—মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতির কার্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তৃত হইতে থাকে। ধারণা সৃষ্টির সময় মনে রাখিতে হইবে যে তাহার নিখুঁত সংজ্ঞা যেন শিক্ষক দেন। তাহার পরে শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাহাকে উত্তেজনা—প্রতিক্রিয়া দ্বারা শিক্ষাদান করিতে হইবে। তাহাতে পাঠে নীরসতার অবসান ঘটিবে। অনেক সময় শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে 'ধারণা' তৈরীর সময় মনে মনে একটি সমস্যা চিন্তা করিয়া লয়, পরে তাহার সমাধান করে। লোহায় মরিচা পড়িতে CO_2-এর প্রভাব কতটুকু? এই সমস্যাটি সে মনে মনে সৃষ্টি করে। পরে তাহার সমাধানের জন্য সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং একটি 'ধারণা' তৈরী করে।

'বেদন' বিশেষ বিশেষ অবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া তৈরী হয়, কিন্তু 'ধারণা' একটি সাধারণ ও সার্বজনীন অবস্থায় প্রযোজ্য। এই দুইটির মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান বিজ্ঞান শিক্ষক শিক্ষার্থীকে তাহা পূর্বেই অবহিত করিবেন। প্রথমটি এক একটি ঘটনার অভিব্যক্তি; কিন্তু দ্বিতীয়টি ঐ শ্রেণীর সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত। বিভিন্ন অবস্থা, ঘটনার বা অভিজ্ঞতার মধ্যে যখন সাধারণ মৌল বর্তমান থাকে, তখন অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ ঘটে এবং 'ধারণা' তৈরী হয়। ইহার পরে তৈরী হইবে নীতি, সংজ্ঞা বা এমনকি বৈজ্ঞানিক আইন। অভিজ্ঞতা এইরূপে সাধারণীকৃত হইয়া ধারণা এবং পরে এই ধারণা জ্ঞানের সঞ্চরণ ঘটায় ও জীবনের নূতন পরিবেশে উপযুক্ত ভাবে খাপ খাওয়াইতে সাহায্য করে। মানসিক পুষ্টির সংগে সংগে এই ধারণার বিভিন্ন স্তর দেখা যায়। 'লাল' বলিতে প্রথমে রংয়ের ছবিই শিক্ষার্থীর মনে ভাসিয়া উঠে; কিন্তু পরে লাল রংয়ের বৈশিষ্ট্য, আলোকের বিচ্ছুরণ, আলোর বিভিন্ন উপাদানের তরঙ্গ-

S.C.E.R.T. W.B. LIBRARY
Date 9405

দৈর্ঘ্য প্রভৃতিতে তাহার মন আকৃষ্ট হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সাধারণতঃ ধারণাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথমটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থপূর্ণ স্নায়ুর উত্তেজনা—প্রতিক্রিয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত, অপরটি কল্পনা এবং শুদ্ধ গণিতের উপর নির্ভর করিয়া যে সকল বৈজ্ঞানিক নীতি সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল ধারণা। বলা বাহুল্য যে শেষোক্ত প্রকার ধারণা তৈরী করা একটু জটিল ব্যাপার। এই জন্য বিজ্ঞান পাঠের প্রথমেই এই প্রকার ধারণা শিক্ষা না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

(খ) **রসবোধ সৃষ্টি**:—বিজ্ঞানে বিষয় জ্ঞান উত্তরোত্তর এত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে যে বিজ্ঞান সৃষ্টির মূলে যে মনোভাব, অভিজ্ঞতার বিমল আনন্দ বা ঔৎসুক্য, রসবোধ প্রভৃতি রহিয়াছে তাহা বিস্মৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। বিষয়ের চাপে শিক্ষার্থীর রসবোধ, সামাজিক সচেতনতা, দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি মূল উদ্দেশ্যগুলি ব্যাহত হইতে পারে। বিভিন্ন ঘটনার বৈচিত্র্য, আকস্মিকতা, প্রক্ষোভ-জনিত উল্লাস, আবেগময় অভিজ্ঞতা প্রভৃতির মধ্য দিয়া বিজ্ঞানের বিষয়গুলি জন্মলাভ করিয়াছে। বিজ্ঞানী কি পরিবেশ বা কি রকম চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া বিজ্ঞানের তথ্য খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন—কঠোর তপস্যায় জীবনের মূল্যবান দিনগুলিকে অতিবাহিত করিয়াছেন, কেহ স্বীয় লক্ষ্যে উপনীত হইয়া বিজয়লক্ষ্মী লাভ করিয়াছেন—কাহারও বা জীবন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু জয়টীকা ভাগ্যে জোটে নাই, বর্তমান বিজ্ঞানী জটিল আবেষ্টনীর মধ্যে কিরূপে নূতন তথ্যের অন্বেষণে প্রাণ-পাত পরিশ্রম করিতেছেন—এই সব রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলিকে শিক্ষার্থীকে না জানাইলে বিজ্ঞান নিরস হইবে—বিজ্ঞানশিক্ষক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন। এই ঐতিহাসিক জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী, প্রক্ষোভ, সুসংহত চিন্তা প্রভৃতি জানিতে পারিবে ও তাহাদের অনুকরণ প্রবৃত্তি জাগরিত হইবে। বিজ্ঞান পাঠের মধ্যদিয়া মনের সংকীর্ণতা বিদূরিত হইবে; বিশাল পৃথ্বী, ভৌগোলিক সময়-চক্র, সুশৃঙ্খল প্রকৃতির রসাস্বাদন করিয়া শিক্ষার্থী পরম তৃপ্তি লাভ করিবে। বৈজ্ঞানিক কোন আইন বা নীতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিভিন্ন আবিষ্কার ও সৃষ্টি একটির সহিত আর একটিকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাই দিনে দিনে

বিজ্ঞানবোধের স্তর চক্রবৃদ্ধি হারে বর্ধিত হইতেছে এবং প্রয়োগের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় অংশকে বিতাড়িত করিতেছে।

(গ) **দৃষ্টিভঙ্গী সৃজন**:—বিজ্ঞান পাঠের মধ্য দিয়া সকল শিক্ষার্থীই যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী হইয়া উঠিবে তাহা ঠিক নয়। তবে ইহাতে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গী যে পরিবর্তিত হইবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান শিক্ষায় দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করা এক অপরিহার্য উদ্দেশ্য। অনেকের ধারণা বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলে পরোক্ষভাবে ঐ উদ্দেশ্য আসিয়া যাইবে; কিন্তু ইহা ঠিক নহে। বিষয় বস্তুর মত এই উদ্দেশ্যকে প্রত্যক্ষভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা দিতে হইবে।

এখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কি কি? বিজ্ঞান শিক্ষকের সেই বিষয়ে অবহিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বিজ্ঞানীকে নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হইতে হইবে।

(১) পরিবেশ সম্বন্ধে তাঁহার ঔৎসুক্য থাকিবে।

(২) তিনি কার্য-কারণ সম্পর্কে বিশ্বাসী হইবেন।

(৩) তাঁহার মন উদার হইবে।

(৪) তিনি বিশ্লেষণে পটু হইবেন।

(৫) যথোপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে কথিত কোন ঘটনাকে বিশ্বাস করিতে তিনি গররাজি হইবেন।

(৬) কোন কুসংস্কারকে গ্রহণ করিতে তিনি রাজি নন।

(৭) নূতন ঘটনা দেখিলে তিনি তাঁহার বিশ্বাস পরিবর্তন করিতে রাজি থাকিবেন।

(৮) অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীকে শ্রদ্ধা করিবেন।

(৯) সততা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, নির্ভুলতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইবেন।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চালিত করার সমস্ত দায়িত্ব শিক্ষকের। তিনি কেবল আদেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না—তিনি নিজে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবেন। শ্রেণীতে শিক্ষার্থীকে গণতন্ত্রসম্মত স্বাধীনতা দান করিবেন—

কৃত্রিম গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দিয়া শিক্ষার্থীর সহিত তাঁহাকে একাত্ম হইতে হইবে। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে শিক্ষার্থীর নিকট পরিবেশন করিতে হইবে। কোন সিদ্ধান্তে পৌছানর পূর্বে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিতে হইবে। ভ্রান্তির অকপট স্বীকৃতি, জ্ঞানের বিস্তৃতি, সকলের মনোভাব জানিবার ধৈর্য ও আগ্রহ এবং নিরপেক্ষ ব্যবহার দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া বসেন।

(ঘ) **সমস্যা সমাধান পদ্ধতি** ঃ—শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞানের বিষয় ও নীতিগুলিকে শিক্ষা দিলেই প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইল না। বর্তমান শিক্ষা বিজ্ঞানীর মতে বিষয়বস্তু ছাড়াও শিক্ষার অন্যান্য মান, যেমন—রসবোধ, সামাজিক সচেতনতা, সমস্যা সমাধানে দক্ষতা প্রভৃতি প্রদান করিবে। তাই আধুনিক মতে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার জন্যই বিষয় শিক্ষা নয়। ইহা শিক্ষার্থীর মনে নিয়ত নূতন চিন্তার উন্মেষ সাধনে সাহায্য করিতে, তাহার সুসংহত মন তৈরী করিতে, প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার পথ নির্ণয়ের সাহায্যকারী বন্ধু। এই নীতি যদি গৃহীত হয় তবে বিজ্ঞান শিক্ষককে চিন্তার পরিপুরক হিসাবে নিম্নলিখিত পর্যায়গুলি সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে—১। সমস্যাপূর্ণ অবস্থা, ২। সমস্যার সংজ্ঞা নির্ধারণ, ৩। সমস্যানুগ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, ৪। ধারণা সৃষ্টি এবং ৫। ধারণাকে প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষা করা।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে দুই দিক দিয়া বিচার করা যায়। প্রথমটি কাজের দিক এবং দ্বিতীয়টি দৃষ্টিভঙ্গী অথবা চিন্তার দিক। এই দুইটির মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। কোন সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীকে নিম্নের একটি বা সবগুলি পদ্ধতির সাহায্য লইতে হয়।

ক। প্রশ্নবোধ।

খ। পরীক্ষা ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ দ্বারা তথ্য আহরণ।

গ। ঐ সকল তথ্যকে সজ্জিত করা ও মূল্যায়ন করা।

ঘ। কোন একটি ধারণার অনুমান করা।

ঙ। সেই ধারণার পুনরায় পরীক্ষা করা।

চ। মৌলিক সত্য আবিষ্কার করা।

ছ। বিশেষ বিশেষ কাজে তাহাকে প্রয়োগ করা।

উক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহিত পরিপূরক হিসাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ইহার একটিকে বাদ দিলে অপরটি অসম্পূর্ণ থাকে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

২। শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের কারণসমূহ ঃ

অভিজ্ঞ বিজ্ঞান শিক্ষক মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রেণীর কার্য পরিচালনা করিবেন। শিক্ষাদান ক্রিয়ায় যে সকল মূল নীতি বিদ্যমান সেগুলি তিনি বিশেষভাবে অবহিত থাকিবেন। নতুবা বিচক্ষণতার সহিত কার্যকরী পাঠদান সম্ভব হইবে না। কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ প্রদত্ত হইল।

(ক) **আগ্রহ সৃষ্টি** ঃ—শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ হইতেছে আগ্রহ সৃষ্টি। আগ্রহ শিক্ষা প্রক্রিয়ায় আত্মা সদৃশ। কোন কাজ করিতে আগ্রহ না থাকিলে সেই কাজে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যে পৌছিবার আকুতি থাকিলে মনোবেগ সৃষ্টি হয় এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। বিজ্ঞান শিক্ষক এই আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রচুর কার্যকরী চিন্তা এবং শক্তিকে কাজে লাগাইবেন। তাহাতে শিক্ষার্থীর উৎসাহ, উদ্দীপনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। আগ্রহ আভ্যন্তরিণ এবং বাহ্যিক—দুইই হইতে পারে। যখন বিষয়টি শিক্ষার্থীর নিকট অর্থপূর্ণ হয় এবং শিক্ষার্থী আনন্দের সংগে মন প্রাণ দিয়া বিষয়টির ভিতর উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রবেশ করে তখন বিজ্ঞান শিক্ষা নিজেই নিজেকে পুরস্কৃত করে। ইহা আভ্যন্তরিণ আগ্রহ এবং ইহাই আদর্শ শিক্ষা। শিক্ষকের উচিত কৌশলে এই আগ্রহ সৃষ্টি করা। নীচে এইরূপ কয়েকটি কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

(১) **শিক্ষার ফল** ঃ—শিক্ষার্থীকে তাহার শিক্ষার ফল সম্বন্ধে অবহিত করাইতে হইবে। শিক্ষার্থী পাঠে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে তাহা জানিবার

জন্য উৎসুক থাকে। এই বিষয়ে **ডেভিসের** কয়েকটি সুপারিশ নীচে আলোচিত হইতেছে ঃ

(অ) যখন শিক্ষার ফলটি সংশ্লেষিত এবং বিশ্লেষিত অবস্থায় শিক্ষার্থীর নিকট আনা হয়, তখন শিক্ষার্থীর পাঠে আগ্রহ বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

(আ) যখন নূতন কোন কাজ হাতে লওয়ার পূর্বে শিক্ষার্থী পুরাতন ফলটির খু টিনাটি একবার ভালভাবে দেখিবার সুযোগ পায় তখন শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

(ই) শিক্ষার্থীর নিকট ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে ফল দিলে শিক্ষার্থী কাজে নূতন উদ্দীপনা পায়।

(ঈ) মেধাবী অপেক্ষা স্বল্পধী শিক্ষার্থী বারবার পরীক্ষায় উপকৃত হয়। স্বল্পধীর অন্তর্দৃষ্টি কম। তাই বারবার পরীক্ষা দ্বারা না শোধরাইলে তাহারা পাঠে মন দিতে আগ্রহান্বিত হয় না।

(খ) **পুরস্কার ও শাস্তি ঃ**—পুরস্কার আগ্রহসৃষ্টিকারী; কিন্তু বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত তাহার প্রয়োগ দরকার। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন যে শিক্ষায় কৃতকার্য হইলে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এবং অকৃতকার্যের দুঃখই সবচেয়ে বড় শাস্তি। এইখানে বুদ্ধিমান পদক্ষেপে শিক্ষককে অভিজ্ঞতা ও ধৈর্য লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সেই কারণে শিক্ষাদান একটি কলা।

(গ) **প্রশংসা ও নিন্দা ঃ**—অনেকে মনে করেন প্রশংসা শিক্ষাদানের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। কিন্তু ইহাও সত্য যে ঠিকমত প্রয়োগ না করিতে পারিলে প্রশংসা ও নিন্দায় মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই বেশী হয়। বিজ্ঞ শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থীর পরিচয় রাখেন। সুতরাং স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া তিনি এই হাতিয়ার দুইটি ব্যবহার করিতে পারেন। ইহার সাধারণ কোন নিয়ম নাই।

(ঘ) **সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা ঃ**—অনেক শিক্ষক শ্রেণীতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং এ দলে ও দলে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিয়া উৎসাহ দিতে চান। প্রতিযোগিতা আগ্রহবর্ধক সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে রেষারেষি, স্বার্থপরতা দেখা যায়। তাহাতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যে কুঠারাঘাত পড়ে। কারণ সহযোগিতা

সৃষ্টি বর্তমান শিক্ষানীতির একটি প্রধান লক্ষ্য। তবে শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মপ্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিতে পারেন তবেই কার্যকরী আগ্রহের সৃষ্টি হইবে।

(ঙ) **শারীরিক কারণ**ঃ—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জ্ঞান স্নায়ু বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং জ্ঞান লাভে শারীরিক সুস্থতা অনেক খানি সাহায্য করে। শরীরের অংগ প্রত্যংগে কোন দোষ থাকিলে তাহা শিক্ষালাভে বাধা সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে শতকরা প্রায় কুড়ি জন শিক্ষার্থীর চোখের দোষ আছে। পূর্বে তাহা জানার চেষ্টা করা হয় না। পরে অনেকখানি খারাপ হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এই দোষ থাকার দরুণ অনেকের মাথা ধরে, আলস্য অনুভব করে এবং পড়ায় অমনোযোগী হইয়া পড়ে। দেহের সংগে মনের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকায় দেহের প্রতিক্রিয়া মনে গিয়া স্পর্শ করে।

(চ) **পরিবেশের ক্রিয়া**ঃ—বিদ্যালয় গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশে পাঠদান বা গ্রহণ খুবই সুখকর। তাহা না হইলে শরীরে এবং সেইজন্য মনে অবসাদ আসে। তাহা ছাড়া শ্রেণীতে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মধ্যে এক সাচ্ছন্দ্য পরিবেশ থাকা দরকার। এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে শিক্ষালাভ সুষ্ঠু ও সহৃদয়তার সংগে সম্পন্ন হয়।

(৩) শিক্ষানীতি ঃ

বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টা থাকে কি করিয়া অভিজ্ঞতাপ্রসূত ঘটনাকে আইনে আবদ্ধ করা যায়। এই প্রচেষ্টা মনস্তত্ত্ববিদকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কি করিয়া শিক্ষা হয় এবং কোন্ কোন্ সর্ত্তের উপর তাহা নির্ভর করে—তাহাকে নিয়মে বাঁধিবার জন্য হাজার হাজার পরীক্ষা নিরীক্ষা সংঘটিত হইয়াছে। এই নিয়ম বা আইন এখনও শেষ পর্যায়ে আসে নাই। ইহা শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছিবার অস্থায়ী সিঁড়ি মাত্র। কালে পরিবর্তিত হইয়া হয়ত আবার নূতন রূপ লইবে।

মনস্তত্ত্বে বহু শ্রেণীর মতবাদ মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে ; কিন্তু ইহা এখনও শিশু পর্যায়ে রহিয়াছে। প্রকৃতি বিজ্ঞান যেমন পদার্থ বা রসায়ন

বিদ্যার পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার এখনও অনেক দেরী আছে। বিভিন্ন রকম মতানৈক্য থাকা সত্বেও **থর্নডাইকের** শিক্ষা আইনগুলি নীচে আলোচিত হইতেছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান শিক্ষা কি রকম হওয়া উচিত তাহারও কিছু সুপারিশ করা হইতেছে।

প্রস্তুতির আইনঃ—প্রস্তুতির আইনকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে যখন কেহ কাজ করিবার জন্য উন্মুখ থাকে তখন তাহাকে কাজ করিতে সুযোগ দিলে সে সন্তুষ্ট হয়, আর সুযোগ না দিলে সে বিরক্ত হয়। আবার বিপরীত পক্ষে যে কাজ করিতে অনিচ্ছুক তাহাকে কাজ করিতে বলিলে সে বিরক্ত হয়। সেই নিয়মানুসারে পাঠ গ্রহণের পূর্বে পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি থাকা একান্ত দরকার। বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং শিক্ষা পদ্ধতি উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন; শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য এবং মানসিক অবস্থা পাঠের অনুকূল হওয়া উচিত; পাঠটি তাহার কাছে সুখকর হওয়া উচিত। পাঠের পূর্বে শিক্ষাথীর দৃষ্টিভঙ্গী পাঠের সপক্ষে আনয়ন করা শিক্ষকের এক কঠিন এবং অবশ্য করণীয় কাজ। বিজ্ঞান পাঠে এই সুরু ভালভাবে হওয়া উচিত। পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক ছাত্রদের ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী কাজ বণ্টন করিবেন। প্রথমে সহজ হইতে শুরু করিয়া ক্রমে কঠিন পর্যায়ে যাইবে। শ্রেণীর কাজে শিক্ষার্থী সফল হইলে শিক্ষক, বিদ্যালয় এবং ঐ কাজের উপর তাহার শ্রদ্ধা বাড়ে।

পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টার আইনঃ—এই আইনকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে অন্যান্য বিষয় একই থাকিলে পুনঃ পুনঃ একই কাজ করিলে অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অবস্থিত গ্রন্থি শক্তিশালী হয়—কাজ না করিলে ঐ গ্রন্থি শিথিল হয়। 'পুনঃ পুনঃ চেষ্টা মানুষকে খাটি করে'—এই প্রবচন এখানে প্রযোজ্য। এই আইনের দুইটি অনুসিদ্ধান্ত আছে। প্রথমটি হইতেছে পুনঃ পুনঃ কাজের আইন। এই আইনে বলে যে শিক্ষার সহিত পুনঃ পুনঃ কাজের একটা আনুপাতিক সম্বন্ধ বিদ্যমান। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে নূতনত্বের আইন। অন্যান্য বিষয় ঠিক থাকিলে সম্প্রতিলব্ধ শিক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হয়।

কিন্তু অনেকে এই আইনে একমত নন। এক শিক্ষার্থী বহুবার এক জিনিস পড়িয়াও আয়ত্ত করিতে পারে না। কারণ কেবলমাত্র পুনরাবৃত্তি শিক্ষার সহায়ক নয়। এই পুনরাবৃত্তির সহিত যদি মনোযোগ এবং আন্তরিক পর্যবেক্ষণ সংযুক্ত হয় তবেই শিক্ষালাভ সহজে সম্ভব হইবে। তাই অভ্যাস পরিমাণগত এবং গুণগত দুই প্রকারেই হওয়া উচিত। বুদ্ধিমত্তার সংগে অভ্যাস মানুষকে খাঁটি করে।

ফলের আইন ঃ—ফলের আইনে বলে যে সুখকর ফল অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অবস্থিত গ্রন্থিকে দৃঢ় করে ; ফল পীড়াদায়ক হইলে গ্রন্থিকে শিথিল করে। ফলশূন্য কাজে কেহ বেশীদিন মনোযোগ দিতে পারে না। অবশ্য আচরণবাদী ও গেষ্টাল্টবাদীরা এই আইনের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে এই আইন ঠিক হইলে মানুষ তাহার দুঃখ দিনের কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখে কেন তাহা ব্যাখ্যা করা যায় না।

উক্ত মনস্তাত্ত্বিক আইনগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে প্রস্তুতি, অভ্যাস এবং ফলের সংগে আগ্রহ, মনোযোগ এবং চেষ্টার একটি অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক বিদ্যমান। শিক্ষককে আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইবে। শিক্ষার্থী কাজ করিবার জন্য যখন মন প্রস্তুত করিবে এবং শিক্ষায় সুফল পাইবে তখন পুনঃ পুনঃ পাঠ চিন্তা ও কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি করিবে এবং শিক্ষাকে দীর্ঘস্থায়ী করিবে।

বিজ্ঞান পাঠ্যক্রম

জগৎ সমক্ষে বিজ্ঞানের অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রকৃত শিক্ষার বিষয়গুলির মধ্যে সে উচ্চ আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সভ্য জগতে তাই আজ বিজ্ঞান অপরিহার্য। একথা বলিলে ভুল হয় না যে আমরা "বিজ্ঞান-যুগে" বাস করিতেছি। বিশ্বের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের কষ্টার্জিত সাধনার ফলস্বরূপ যে উন্নত পরিবেশে আমরা বাস করিতেছি—যে সুস্থ এবং সাবলীল আবহাওয়ায় আমরা বিচরণ করিতেছি—আমাদের জীবনকে সুন্দর ও উদ্দেশ্যমূলক নীতির দ্বারা পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতেছি—এ সবই ব্যর্থ হইবে যদি আমরা শিক্ষাদর্শনের ভিতর বিজ্ঞানকে স্থান দিতে কুণ্ঠাবোধ করি।

কলা চর্চায় পুরস্কার পাওয়া যায়—মনের সংগে তার সংযোগ; কিন্তু তাহার গঠন ক্রিয়া খুব ধীরে সংঘটিত হয়। বিজ্ঞান চর্চাতেও পুরস্কার পাওয়া যায়—আংশিক ভাবে সে মনকে স্পর্শ করে। সে বাস্তবধর্মী—সংগে সংগে প্রাপ্ত ফলকে উপভোগ করা যায়।

আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞানের দানে গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়াই যে বিজ্ঞানকে পাঠ্যক্রমে রাখিতে হইবে তাহা নহে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া মানুষের অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণে সমর্থ হইয়াছে এবং মানুষের সময় ও চিন্তার অযথা অপচয় হইতে মানুষকে রক্ষা করিয়াছে। সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বিভিন্ন ধর্মী কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করিয়া সে সৃষ্টিমূলক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। বিভিন্ন উত্তেজনা আমাদের কল্পনাশক্তির বিকাশে সাহায্য করিয়াছে—যুক্তিযুক্ত শৃঙ্খলা এবং সঙ্গতি আমাদের মেধা এবং যথাযথ পুষ্টি প্রদান করিয়াছে। বিজ্ঞানের এই সকল দানকে অবহেলা করা যায় না—উচিতও নয়। গত অর্ধশতাব্দি ধরিয়া বিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে নিজের আসন লাভ করিবার

জন্য চেষ্টা করিতেছে। আজ বিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া যদি বিভিন্ন পুরাণ বিষয়ের মধ্যে ফাটল ঘটায় তবে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

আধুনিক পাঠ্যক্রমের সমালোচনা :—বর্তমান বিজ্ঞান শিক্ষা পূর্বালোচিত নীতি বা উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আজ বিজ্ঞানালোকিত সভ্য সমাজের উন্নত পরিবেশেও এই সকল উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া বিজ্ঞান পাঠ শিক্ষায় একটি বোঝা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতিতে পারদর্শী বিজ্ঞানী বিজ্ঞানকে আরও বাস্তবধর্মী এবং কার্যকরী করিতে উৎসুক। একক পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়া এবং মনস্তত্ব সম্মতভাবে সজ্জিত করিয়া বিজ্ঞানের অধিকাংশ বিষয় বাছাই করিতে হইবে যে তাহাতে ছাত্র ছাত্রীরা নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে এবং নিজ পরিবেশে প্রয়োগ করিয়া অভূতপূর্ব আনন্দের অধিকারী হইতে পারে।

গত বিশ বৎসর ধরিয়া বিদ্যালয়ে সাধারণ বিজ্ঞান পঠনের অনুকূলে মত ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষাবিদের সমর্থন না পাইয়া তাহাকে ঠিক কাজে লাগান যাইতেছে না। কিছু স্বীকৃতি পাইলেও সাধারণ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু তৈরী করিতে বহু অসুবিধা আছে। বর্তমানে বিজ্ঞানকে আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠে রক্ষা করিয়া পাঠদান করা হইয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞান অখণ্ড। তাহাকে এইরূপে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়। কারণ তাহা মনস্তত্বসম্মত নয়। সমস্ত বিশেষ বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ধারাবাহিকভাবে সম্মিলিত করিয়া কাঠিন্যের ক্রমানুসারে সুবিন্যস্ত করিয়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর জন্য নির্বাচিত করা উচিত। বর্তমান পাঠ্যক্রমে তাহার কোন সুযোগ নাই।

বর্তমান পাঠ্যক্রম শিশুর মনোজগতের খবর রাখে না। বিভিন্ন পরিবেশ হইতে বিভিন্ন মানসিক কাঠামো লইয়া শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসে। কেহ গ্রাম, কেহ শিল্প-প্রধান নগর, আবার কেহ বা সহর বা পার্বত্য এলাকার অধিবাসী। আমাদের পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থী বা পরিবেশের চাহিদা মিটাইতে অক্ষম। তাই ছাঁচে ঢালা বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যক্তি বা সমাজের কাজে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয় না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের বর্তমান পাঠ্যক্রম ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান

পাঠের অসংলগ্ন সিঁড়ি মাত্র। কিন্তু কত শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষার দ্বার হয়তো মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিত্যাগের পরই রুদ্ধ হইবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আত্মনির্ভরশীল বিজ্ঞান পঠনের অভাবে বিজ্ঞানের জ্ঞান অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে।

আধুনিককালে বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম এইরূপে তৈরী যে অন্যান্য অনুরূপ বিষয়গুলির সহিত তাহার যোগ নাই। তাই শিক্ষার্থীর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে একই জিনিসকে দেখে। তাহাদের মধ্যে অনুবন্ধ সৃষ্টি করিতে না পারার দরুণ শিক্ষার্থীর নিকট বিভিন্ন বিষয় ভারস্বরূপ হইয়া উঠে।

উপরে বর্তমান বিজ্ঞান পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে কিছু সমালোচনা করা হইয়াছে। নীতিগতভাবে সকলেই একমত যে বিজ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পড়াইলে বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্যে ফাঁক থাকিয়া যায় এবং সেই ফাঁক বিশেষ করিয়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর পক্ষে ক্ষতিকর। অপেক্ষাকৃত মেধাবী শিশু বুদ্ধির সাহায্যে বিজ্ঞানের এই সকল অসংলগ্ন বিষয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহির করিয়া অধীত বিষয়গুলিকে ভালভাবে আয়ত্ত করে; কিন্তু অল্পধী শিশুর পক্ষে তাহা সম্ভবপর নয়। তাই বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে সামঞ্জস্যভাবে একত্রীভূত করিয়া এক অখণ্ড বিজ্ঞান তৈরী করা উচিত। তাহার নাম **সাধারণ বিজ্ঞান**। সাধারণ বিজ্ঞানের এলাকায় পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, শরীরবিদ্যা প্রভৃতি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে সজ্জিত থাকিবে। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া সাধারণ বিজ্ঞান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ্য হইবে। সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম রচনা করিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে—

(১) প্রথমতঃ সকল বিজ্ঞানের আদি রীতি কি তাহা ঠিক করিতে হইবে। প্রাপ্ত ঘটনা বা উপকরণের পরিধি যথাসাধ্য বিস্তৃত করিয়া তাহা হইতে সকল বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্র বাহির করিতে হইবে।

(২) দ্বিতীয়তঃ বিষয়ের বাছাই কার্য বিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করিবে। পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা সূত্র নির্ণয় সকল সময় সব শিক্ষার্থীর পক্ষে

সহজ নয়; যে সূত্র রচনা যে বয়সের শিশুর পক্ষে প্রযোজ্য তাহাকে সেখানে স্থান দিতে হইবে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সূত্র নির্ণয় করিবার দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। শিশু "যাহা জানে" সেই জ্ঞানকে কেন্দ্র করিয়া বিজ্ঞানের বিষয়কে সাজাইতে হইবে। তাহা হইলে সে জানা হইতে অজানায়—মূর্ত হইতে বিমূর্তে—সহজ হইতে জটিল তথ্যে যাইতে এবং অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান হইতে যুক্তিপূর্ণ বিচারে অধিকারী হইবে।

(৩) সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম তৈরীর সময় শিশুর মেধার পরিপুষ্টির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নূতন জ্ঞানকে তিনটি স্তরের মাধ্যমে সে গ্রহণ করে। প্রথম স্তরে শিশু বিস্ময় রাজ্যে বাস করে। বিস্ময় উদ্রেক করিয়া জ্ঞান পরিবেশন করিলে শিশুরা এই স্তরে তাহা অল্পায়াসেই গ্রহণ করিতে পারে। লিট্‌মাস্ কাগজের রং বদলান, কৃত্রিম উপায়ে ফোয়ারা তৈরী প্রভৃতি শিশু কোন দিনই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। বয়সের সংগে সংগে ধীরে এই বিস্ময়ভাব কাটে বটে; কিন্তু তা কোনদিন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় না। বিস্ময়ের মাত্রা এবং প্রকাশ পাল্টায় মাত্র। দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ কৈশোরে শিক্ষার্থী অধীত সংবাদ-বহুল তথ্যের উপযোগিতা বাহির করিতে শিখে। পূর্বে সে লিট্‌মাসের রং বদলাইতে দেখিয়াছে—এখন সে দেখে যে অ্যাসিড এবং অ্যাল্‌কালির সংমিশ্রণে লবণ এবং জল হইতেছে। শুধু তাহাই নহে। জমিতে অ্যাসিড বেশী হইলে কতখানি চূণ ব্যবহার করা উচিত—তাহার হিসাব বাহির করিয়া দিতে পারে। তৃতীয় এবং শেষ স্তর হইতেছে অধীত বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত করা—সুসংগঠিত করা। নূতন জ্ঞান আহরণের এই পর্যায়ে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়, তুলনামূলক বিচার, বিভিন্ন ঘটনার সাধারণীকরণ, সূত্র নির্ণয় প্রভৃতি হইয়া থাকে। যেমন পূর্বের উদাহরণে নির্দেশকের (indicator) নীতি নিরূপণ, কেন এবং কখন বিশেষ বিশেষ নির্দেশক ব্যবহৃত হয়—প্রভৃতি নির্ণয়-পদ্ধতি এই স্তরে হইয়া থাকে। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তিনটি স্তরের উপযোগিতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে।

(৪) বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমের চতুর্থ আলোচ্য বিষয় হইতেছে যে শিশু

প্রকৃতিগতভাবে বিভিন্ন। আমাদের বিভাগের ধারায় তাহারা বিভক্ত নয়। কিছু ছাত্র আছে যাহারা পদার্থ এবং রসায়ন শাস্ত্রের গাণিতিক হিসাব করিতে দক্ষ। আবার কেহ পরীক্ষার মারফৎ যে সকল তথ্য পাওয়া যাইতেছে—তাহাদিগকে জানিয়াই সুখী। আবার কেহ বা সংবাদ বা বিবরণবহুল জ্ঞানে সন্তুষ্ট, সে হিসাব বা তথ্য সংগ্রহে কোন আনন্দ পায় না। তাহারা প্রাণী, উদ্ভিদ, প্রভৃতি বিদ্যা শীঘ্রই আয়ত্ত করিতে পারে। আবার প্রায়ই দেখা যায় যে বালকেরা বিজ্ঞানে যুক্তিযুক্ত বিচার এবং গাণিতিক দিক বিশেষ করিয়া পছন্দ করে এবং বালিকারা বিজ্ঞানের উপযোগিতা এবং বিবরণের দিক্ আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করে।

(৫) বিজ্ঞানকে কার্যকরী করিতে হইলে শিশু কি কি পরিবেশ হইতে আসিয়াছে তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। শিশুর মানসিক কাঠামো তাহার পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান পাঠের সময় শিক্ষক ঐ পরিবেশ হইতে দৃষ্টান্ত পরিবেশন করিয়া শিক্ষাকে জীবন্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী করিতে সক্ষম হইবেন।

(৬) শিক্ষার সময় শিশুকে সমাজের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং সমাজের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যসূচী প্রস্তুতির প্রয়োজন অনুভূত হয়। যে সমাজে শিশুকে বুদ্ধিমত্তার সহিত খাপ খাইতে হইবে তাহার প্রয়োজন বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

(৭) পাঠ্যসূচী প্রস্তুতির আর একটি বিশেষ অসুবিধা অনুভূত হয়। কিছু ছাত্র প্রাথমিক, কিছু মাধ্যমিক, আবার কিছু ছাত্র কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অধ্যয়ন করিবে। এইরূপ বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্রের জন্য বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পাঠ্য হইবে। ইহা কিরূপে সম্ভব?

কোন একক নিয়ম নাই যে বিভিন্ন উদ্দেশ্য একই পাঠ্যসূচী দ্বারা লাভ করা যাইবে। তবে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যের সর্বোৎকৃষ্ট সংমিশ্রণে উৎকৃষ্ট সমাধান মিলিতে পারে। ঐ সংমিশ্রণ একাধারে শিশুর মানসিক কাঠামো তৈরী করিবে, তাহাকে বৃত্তির জন্য প্রস্তুত করিবে এবং ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান পাঠের দুয়ার খুলিয়া দিয়া তাহাকে বিজ্ঞানী করিয়া তুলিবে।

তবে একথা ঠিক যে উক্ত নিয়ম মানিয়া পাঠ্যসূচী তৈরী করিলেও পাঠ্যসূচী নিরর্থক হইবে—যদি শিক্ষক নিষ্ক্রিয় হন। এখানে শিক্ষক সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হইয়া পাঠ্যসূচীর ফাঁকগুলিকে পূরণ করিয়া দিবেন। তাঁহার কর্মোদ্দীপনা শিশুর মনে স্থায়ী ফল প্রদান করিবে।

সাধারণ বিজ্ঞানের সহিত পাঠ্যক্রমের অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক ঃ

(১) কোন বিষয়ে অর্জিত দক্ষতা বা প্রবণতা অন্য বিষয়ে সহজে সঞ্চারিত হয় না। শিক্ষক ছাত্রদিগকে এমনভাবে তৈরী করিবেন যে তাহারা পঠিত বিষয় যুক্তিযুক্তভাবে সজ্জিত করিবে, তাহাদিগকে যথাযথভাবে বিবৃত করিবে। ফলে তাহারা সংযত এবং পরিচ্ছন্ন হইবে। বিজ্ঞানে অর্জিত এই সকল গুণাবলী কি সাহিত্যে, কি দর্শনে, কি ইতিহাসে বা ভূগোলে—কি গৃহে বা বৃহত্তর সমাজে—জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(২) বিদ্যালয়ে ক্লাস প্রমোশনের সময় আমরা বিভিন্ন বিষয়ের নম্বরের সমষ্টি নির্ণয় করিয়া ছাত্র ছাত্রীর পারদর্শিতা যাচাই করি। এখানে মনে রাখা দরকার যে বিভিন্ন নম্বরের মধ্যে অনেক সময় সঙ্গতি থাকে না। বিভিন্ন বিষয়ে—উচ্চতম নম্বর কত হইবে—হাতে কলমে কাজ বা লিখিত পরীক্ষায় কি হারে নম্বরের বণ্টন কার্য সম্পন্ন হইবে—বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতার মাপ কাঠি কি ভাবে স্থির করিলে সকল বিষয়ের উপর সমান বিচার দেওয়া যাইবে—প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের জন্য বিভিন্ন বিষয়-শিক্ষকের যুক্ত আলোচনা বিশেষ কার্যকরী।

(৩) যখন একই সময়ে কোন একটি পাঠের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন ভাবে পড়ান, তখন সেই পাঠ পৃথক পৃথক সময়ে পাঠদান অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী হয়। সেই কারণে সাধারণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে অনুবন্ধ সৃষ্টি করার দায়িত্ব শিক্ষকগণের উপর ন্যস্ত। আমরা ইতিহাসের বিষয়বস্তুর সংগে তৎকালীন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যের সম্পর্ক যোজনা করিতে পারি। ইতিহাসের সময় তালিকার সংগে বৈজ্ঞানিক ঘটনার অনুবন্ধ বাহির করিয়া ছাত্রছাত্রীদের নিকট বিষয়বস্তুর ভার লাঘব করিতে পারি।

এইরূপে শিক্ষকের আগ্রহ থাকিলে কার্যকরীভাবে সাহিত্যের সহিত সাধারণ বিজ্ঞানের অনুবন্ধ ঘটান যায়। তবে এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে অংক, ভূগোল এবং ভূবিদ্যাকে সাধারণ বিজ্ঞানের সহিত সম্পর্কযুক্ত করিয়া পড়ান খুব কঠিন কার্য নহে। পাঠনের পূর্বে ঐ সকল বিষয়-শিক্ষকের সুচিন্তিত পরিকল্পনা—নিজেদের মতামত ঐ অনুবন্ধ স্থাপনে সহায়ক হইবে।

(৪) এ ছাড়া প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে ঠিক করিতে হইবে সাধারণ বিজ্ঞানকে পরীক্ষামুলক কাজের জন্য কতটা সময় দেওয়া হইবে। একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে শিক্ষক কর্তৃক পরীক্ষা দেখান বা ছাত্রদের ব্যক্তিগত পরীক্ষা করার সুযোগ দান, বিজ্ঞান শিক্ষার একটি অপরিহার্য অংগ। হাতে কলমে কাজের মধ্যে শিক্ষাগত এবং মনস্তত্ত্বের দিক রহিয়াছে। কিন্তু পরীক্ষায় প্রচুর সময় লাগে। এই সময় আসিবে কোথা হইতে? তাই অন্যান্য বিষয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া যে সময়টুকু সাধারণ বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য দেওয়া হইবে বিজ্ঞান শিক্ষক যেন তাহার সদ্ব্যবহার করেন।

সাধারণ বিজ্ঞানের সহিত বিশেষ বিজ্ঞানের সম্বন্ধ ঃ

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে একটা বিশেষ ধাপ পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য সাধারণ বিজ্ঞানকে অবশ্যপাঠ্য করিতে হইবে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশকে ছাত্র-ছাত্রীর বুদ্ধি, বয়স এবং মানসিক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া পরিবেশন খুব সহজ কাজ নহে। কিন্তু ততোধিক শক্ত কাজ হইবে যে ছাত্র কোন একটি অংশে বিশেষ পারদর্শিতা বা অনুরাগ দেখাইতেছে—তাহার জন্য ভিন্ন রাস্তা তৈরী করা। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপন্ন ছাত্রের চাহিদা সমাজেরও রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন দেখা দিবে যে কোন্ বয়সে ছাত্র ছাত্রী বিশেষ বিজ্ঞান পাঠ আরম্ভ করিবে? কখন সাধারণ বিজ্ঞানের পরিবর্তে ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা বা শরীরবিদ্যা অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে?

উক্ত প্রশ্নের সহজ উত্তর দান সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন দিক বিচার করিয়া একটা সিদ্ধান্তে আসিতে পারা যাইবে। নিম্নে কয়েকটি প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে ঃ

(১) শিক্ষার্থীর বুদ্ধির মাত্রাই আমাদের প্রথম প্রশ্ন। হীনবুদ্ধি, সাধারণ এবং বুদ্ধিমান—এই তিন শ্রেণীতে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীকে যদি বিভক্ত করি তবে সাধারণ বিজ্ঞানের এলাকা কোন্ শ্রেণী পর্যন্ত থাকিবে? যে সকল শিক্ষার্থী ১৪+বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিবে তাহাদের বিজ্ঞান পঠনের সংগে ১৭+ বয়সের শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান পঠন কখনও সমান হইতে পারে না। আবার যাহারা ১৭+ বয়সের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে তাহাদের মধ্যে এবং প্রথমোক্ত শিক্ষার্থী-কুলের পঠনের ব্যবধান আরও অনেক বেশী। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া সেই শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বা কলাকে বিশেষ বিষয় হিসাবে লইবে কিনা তাহাও বিবেচ্য। মেধাবী ছাত্র সাধারণতঃ বিজ্ঞানের সব বিভাগের পারস্পরিক সংযোগ সম্বন্ধে শীঘ্র সচেতন ও পারদর্শী হইতে পারে। সেই রকম ছাত্র যদি ১১+ বয়সের পর ৩ বৎসর অর্থাৎ ১৪+বয়স পর্যন্ত সাধারণ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে তবে তাহাকে এর পরে বিশেষ বিজ্ঞান লইতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। তবে একথা ঠিক যে, যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া বিজ্ঞান পড়িবে না তাহাদের পক্ষে সাধারণ বিজ্ঞান ১৭+বয়স পর্যন্ত পড়াইলে ফল শুভ হইবে।

(২) দ্বিতীয়তঃ বিশেষ বিজ্ঞান পাঠ বিদ্যালয়ের আয়তনের উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে যখন নূতন ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রতি বৎসর এক বা একাধিক শ্রেণীতে বিভাগ খুলিবার চাপ আসে, সে সময়ে তাহারই সমান্তরালরূপে বিশেষ বিজ্ঞান বিভাগ খুলিবার পূর্বে দুইটির কোন্‌টি অধিকতর প্রয়োজনীয় তাহা বিবেচনা করা উচিত।

(৩) তৃতীয়তঃ আমাদের সাজ সরঞ্জামের অভাব বিশেষ বিজ্ঞান খুলিবার পক্ষে এক বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি, বিশেষ বিজ্ঞানের যন্ত্রাদির ন্যায় ব্যয়বহুল নয়। শিক্ষকের উদ্ভাবনী শক্তি ব্যতীত সীমিত গণ্ডীর মধ্যে নূতন নূতন বিজ্ঞান বিভাগ খুলিবার আশা সুদূর-পরাহত। যন্ত্রাদি ব্যতিরেকে বিজ্ঞান শিক্ষা পুঁথিগত বিদ্যায় পর্যবসিত হইবে—

বিদ্যালয়ের বাহিরে গৃহ বা সমাজের সংগে তাহার সংযোগ হারাইবে এবং যাহার উপর ভিত্তি করিয়া প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ চিরস্মরণীয় হইয়াছেন—সেই অনুসন্ধিৎসা এবং অধ্যবসায়ের অভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে।

(৪) সাধারণ ও বিশেষ বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষে আর একটি বাধা হইতেছে—সুদক্ষ শিক্ষকের অভাব। কোথাও সাধারণ বিজ্ঞানের—আবার কোথাও বা বিশেষ বিজ্ঞানের শিক্ষক পাওয়া সহজ নয়। বিশেষ বিজ্ঞান পড়াইবার মত যোগ্যতা আমাদের দেশে অনেক শিক্ষকের কম ; এর কিছুটা কারণ হয়তো এও হইতে পারে যে আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিকে উন্নত পর্যায়ে লইবার চিন্তা কিছুদিন পূর্বেও শিক্ষকদের মনে স্থান পায় নাই। আবার বিশেষ বিজ্ঞানে দক্ষ শিক্ষকগণ সাধারণ বিজ্ঞান পড়াইবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য সে উৎসাহ এবং সময় দিতে নারাজ। শিক্ষকের এই অধ্যবসায়ের অভাব ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চালিত হইতেছে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে বিশেষ বিজ্ঞান শিক্ষক সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষক অপেক্ষা নিজেকে বেশী পণ্ডিত এবং সামাজিক খ্যাতির অধিকারী বলিয়া প্রচার করেন ; কারণ তাঁহার মাধ্যমেই তো শিক্ষার্থী নিজের বৃত্তি নিরূপণ করিয়া আহার বাসস্থান জোগাড় করিবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ দান বেশী কঠিন।

(৫) বিদ্যালয়ে কোন কোন বিষয় শিক্ষাদানের বিশেষ ঐতিহ্য থাকে। ছাত্রছাত্রীরা সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নবোদ্দমে ঐতিহ্য রক্ষার চেষ্টা করে। আবার বিপরীতক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের ভগ্নমনোরথ হওয়ার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। কিন্তু শিক্ষার্থীকে কার্যকরী শিক্ষাদান যদি শিক্ষকের উদ্দেশ্য হয় তবে তিনি হতাশ হইবেন না। তিনি মনে রাখিবেন শিশুর জন্য বিদ্যালয়—বিদ্যালয়ের জন্য শিশু নয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বলা যাইতে পারে যে ১৪+বয়স পর্যন্ত সাধারণ বিজ্ঞান পাঠ সকল শিশুর জন্য প্রযুক্ত হওয়া উচিত। তবে এর পরে এক বা একাধিক বৎসরের জন্য সাধারণ বিজ্ঞান

পাঠ উক্ত বিষয়গুলির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হইতে পারে। ১৪+ বয়সের পর অনুকূল ক্ষেত্রে বিশেষ বিজ্ঞান পাঠ দেওয়া উচিত।

পাঠ্যক্রমে বিষয় নির্বাচন ঃ

উপরে সাধারণ বিজ্ঞান পাঠের উপযোগিতা এবং বিষয় নির্বাচনে বিশেষ কয়েকটি অসুবিধার কথা আলোচিত হইয়াছে। উহাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া বিষয় নির্বাচনে কয়েকটি মৌলিক নীতি স্থির করা হয়। নীচে সেইরূপ কয়েকটি নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

সাধারণ বিজ্ঞানের বিষয়গুলি—

(ক) প্রাথমিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(খ) সামাজিক চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইবে।

(গ) শিক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবে।

(ঘ) শিক্ষাদান কার্যে—

(i) শিক্ষার্থীর মানসিক বৃদ্ধি, মেজাজ, প্রয়োজন এবং আগ্রহের অনুকূল হইবে।

এবং (ii) শিক্ষার্থীর পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হইবে।

(ক) ঐতিহাসিক পটভূমিকায় প্রাথমিক জ্ঞান নির্বাচন ঃ

আজিকার বীজ ভবিষ্যতে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। শিশুর জ্ঞানের পরিধি—সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্বুদকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠে। তাহার প্রাথমিক জ্ঞানকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রথমটি মানুষ সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয়টি তার চতুষ্পার্শ্বের পৃথিবী সম্বন্ধে। আবার পৃথিবীতে জীব ও জড়ের অবস্থিতি বিদ্যমান। শিশুর কৌতূহল চলমান জিনিসের উপর বা প্রাণীর উপর নিবদ্ধ থাকে। সর্ব প্রথমে জীবজগতের উপর এই ঔৎসুক্য শিশুর জ্ঞানের প্রাথমিক সিঁড়ি তৈরী করে। সেইজন্য উদ্ভিদ এবং প্রাণীবিদ্যা একটি প্রাথমিক জ্ঞান। মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীতে

আসিয়াছিল তখন আজিকার তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী সম্বন্ধ ছিল তাহার প্রকৃতির সংগে। জীবন যুদ্ধে বাঁচিয়া থাকার জন্য প্রকৃতির বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণীর আকৃতি—তাহাদের অভ্যাস সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইয়াছিল। পরে মানুষ তাহাদিগকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে এবং পরিচালিত করিতে লাগিল। কোন কোন প্রাণী গৃহপালিত হইল। একথা কৃষির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিভিন্ন উদ্ভিদকে হয় খাদ্য, ঔষধ বা অন্য কারণে নিয়োজিত করিল। চাষ আবাদ করিয়া জীবিকাহরণের ব্যবস্থা করিল। সেই জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সংস্পর্শে আসে এমন সকল জীবন্ত জিনিসের বিষয় সাধারণ বিজ্ঞানে স্থান পাওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ প্রথমে অবাক বিস্ময়ে আকাশের তারকারাশি, গ্রহ উপগ্রহ, মেঘ, ঝড়, বিদ্যুৎ নিরীক্ষণ করিত। পরে এই উদ্দেশ্যবিহীন নিরীক্ষণ উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং ধারাবাহিক হইল। নিজের জীবনের তাগিদে সে তাহাদের জ্ঞানকে জীবনে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। কখন বৃষ্টি হইবে, কখন বায়ু প্রবাহিত হইবে, কখন জমিতে বীজ বপন বা রোপণ করিবে প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের জন্য আকাশকে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিল। বিশ্বের জ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যা তাই মানুষের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয়।

তৃতীয়তঃ লৌহ এবং তাম্র যুগে রসায়নশাস্ত্র আরম্ভ হইল। খনি হইতে ধাতব পদার্থ উত্তোলিত হইল। অভিজ্ঞতাপ্রসূত হইলেও এই জ্ঞান মূল্যহীন নয়। তাই পাঠ্যসূচীতে রসায়নের স্থান পরিদৃশ্যমান।

চতুর্থতঃ জটিল জীবনের সংগে খাপ খাওয়ানোর জন্য মানুষ নূতন নূতন যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করিতেছে। অল্প সময়ে, অর্থে ও সামর্থ্যে মানুষ অধিক লাভবান হইতে ইচ্ছুক। জীবনযুদ্ধে তাই সময়ের সঙ্গে মানুষ প্রতিযোগিতা করিতেছে। "প্রকৃতির লিখন" বা "ভাগ্যের বিড়ম্বনা" বলিয়া মানুষ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়াকে কাপুরুষতা বলিয়া মনে করিয়াছে। তাই সে নিজ প্রতিভা বলে প্রকৃতিকে জয় করার জন্য ট্রাক্টার, যন্ত্রপাতি, চাকা, কলকব্জা, তৈরী করিয়াছে। তাই যন্ত্রবিজ্ঞানের স্থান পাঠ্যসূচীতে রাখিতে হইবে।

সুতরাং উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় জীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যা—এই চারিটিকে সাধারণ বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

সাধারণ বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান পাঠ্যসূচীতে থাকিবে সত্য, কিন্তু কি জ্ঞান দেওয়া হইবে? ফলিত বিজ্ঞান? না, সংশুদ্ধ বিজ্ঞান? নীতি মূলক শিক্ষা? না, হাতে কলমে শিক্ষা? বলা বাহুল্য এই দুইটির প্রয়োজনীয়তা সমান ভাবে অনুভূত হয়। কারণ প্রয়োজনের তাগিদে নূতন সূত্রের উদ্ভব হয় সত্য; কিন্তু একথা ঠিক যে মানুষের চিন্তাই কাজের তুলনায় অনেক অগ্রগামী। চিন্তার প্রয়োগই মানুষের চাহিদা মিটাইয়াছে। তাই 'বিশুদ্ধ' বিজ্ঞান 'ফলিত' রূপ লইয়াছে। 'প্রয়োজন' আসিয়াছে 'জ্ঞানের' পশ্চাতে। তাই সাধারণ বিজ্ঞানে এই দুয়ের সার্থক সমন্বয় প্রয়োজন। সেখানে সামাজিক চাহিদা মিটাইবার জন্য থাকিবে বিষয়বস্তু এবং সেই বিষয়বস্তুই আবার মনকে শাণিত করিবে।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের আয়াসলব্ধ মূল্যবান তথ্যের মূল সূত্রগুলি ছাত্র-ছাত্রীকে পরিবেশন করা সাধারণ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে উদাহরণ লইয়া সেই উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব। কিন্তু শিক্ষার্থীর জ্ঞাত বস্তুর উপর নির্ভর করিলে ফল আরও ভাল পাওয়া যায়। তাই সাধারণ বিজ্ঞানকে ছাত্রছাত্রীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সহিত যুক্ত করিয়া পাঠ দিলে শীঘ্র তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী প্রস্তুতির সময় বিভিন্ন বিজ্ঞান শিক্ষককে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়া দুই প্রকার কাজে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। একদল বিজ্ঞানী বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে শিশুর পক্ষে প্রযোজ্য বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলিকে তালিকাভূক্ত করিবেন। অন্যদল শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনে দৃষ্ট আগ্রহপূর্ণ ঘটনাবলীকে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(খ) আজ তথাকথিত 'শিক্ষিত' যুবসমাজ চাকুরির জন্য গ্রাম ছাড়িয়া

শহরের দিকে বেগে ধাবিত হইতেছে। শহরে দূষিত বাতাস বা অসুস্থ পরিবেশ থাকা সত্বেও তাহারা গ্রামের সমাজ ভাঙ্গিয়া এই যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গ্রামের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি—যিনি আন্তরিক চেষ্টা করিলে গ্রামে থাকিয়া গ্রামের সমস্যা সমাধান করিয়া তাহাকে উন্নত করিতে পারিতেন—তিনি গ্রামের কথা শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাই পল্লীসমাজ আজ বিধ্বস্ত। কিন্তু একথা ঠিক যে তিনি চেষ্টা করিলে তাঁহার প্রতিভা এবং যোগ্যতা বিশেষ কার্যকরীভাবে সেই গ্রামের কাজেই নিযুক্ত করিতে পারিতেন।

শহরকেন্দ্রিক এই মনোভাবের হয়তো যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। বস্তুবাদী পৃথিবীর হয়তো রীতিই এই। কিন্তু সমাজ বিচ্ছিন্ন শিক্ষাও তাহার জন্য কম দায়ী নয়। শহরের উন্নত পরিবেশ হইতে আগত শিক্ষাবিদ্ উন্নত পরিবেশ অনুগামী শিক্ষারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। কৃষিপ্রধান দেশে যে অসংখ্য লোক অসংখ্য পরিবেশে বাস করিতেছে তাহাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের কাণ্ডারী কই—পথ কই? সাধারণ বিজ্ঞান কিয়দংশে সেই সমস্যার সমাধান করিতে পারে। সাধারণ বিজ্ঞানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য, উন্নত পর্যায়ে চাষের পদ্ধতি, বিভিন্ন সামাজিক অভ্যাস সম্বন্ধীয় জ্ঞান, বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গ্রামে কৃত্রিম উপায়ে সার উৎপাদন, শস্যহানির কারণ উল্লেখ এবং তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়ার নিয়মাবলী অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঘটনাগুলি আলোচিত হইবে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কারণ অনুসন্ধান বা যথোপযোগী ব্যবস্থাবলম্বনের সুযোগ থাকিবে। শিক্ষক এইরূপে শিশুর পরিবেশের মাধ্যমে পাঠদান করিবেন এবং তাহার পরিবেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নতি সাধনে যত্নবান হইবেন।

(গ) ইহা সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ বৃত্তি নিরূপণের জন্য নির্ধারিত নয়। যে সকল ছাত্র ছাত্রী ভবিষ্যতে বিশেষ বিজ্ঞান পড়িবে সাধারণ বিজ্ঞান তাহাদের ঐ সকল পথে যাইবার আগ্রহ বাড়াইবে সন্দেহ নাই। আবার যে সকল ছাত্র ছাত্রী বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া

বিজ্ঞান পাঠ ত্যাগ করিবে—তাহারাও বর্তমান জটিল পৃথিবীতে সুষ্ঠুভাবে খাপ খাওয়াইতে সক্ষম হইবে এবং বিজ্ঞ নাগরিক হইবে। সুতরাং সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনের সহিত সম্পর্কযুক্ত করিতে সহায়ক হইবে।

(ঘ) সাধারণ বিজ্ঞানের শিক্ষাদান শিশুর প্রয়োজন ও আগ্রহের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। তাহার বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর মানসিক বুদ্ধি, মেজাজের দিকে নজর দিতে এবং তাহার পরিবেশের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইবে। প্রাত্যহিক ঘটনার সহিত সংযোগ রাখিয়া শিক্ষক বিষয়গুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিবেন। এইখানেই শিক্ষকের যত্ন ও আগ্রহ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

অল্পবয়স্ক শিশু বিপরীতধর্মী বিষয়গুলির প্রতি ঔৎসুক্য এবং আগ্রহ বেশী পরিমাণে দেখায়। সাবেক কালের ইঞ্জিন এবং একালের ইঞ্জিনের পার্থক্য, লাল ও নীল লিট্‌মাসের কার্যাবলী সহজে শিশুর মনে সাড়া জাগায় এবং তাহার মনে দীর্ঘস্থায়ী রেখাপাত করে।

এ ছাড়া নূতন আবিষ্কারসমূহ শিশুকে বিস্ময় প্রদান করে। সেইরূপ আবিষ্কারের ঐতিহাসিক দিক অপেক্ষা নূতন আবিষ্কার পদ্ধতি শিশুর বেশী আকর্ষণীয়। তাই ঐতিহাসিক ভারে অযথা ভারাক্রান্ত করিলে বিষয়বস্তু শিশুর বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে। অল্প কিছু ঐতিহাসিক পটভূমিকা তৈরী করিয়া আবিষ্কারের নূতন অংশটি পাঠ্যসূচীতে বেশী পরিমাণে রাখিতে হয়। পুস্তক ছাড়াও শিক্ষক এই বিষয়ে দৈনিক বা মাসিক পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত নূতন তথ্যগুলিও শিশুকে জানাইয়া বর্তমান সম্বন্ধে তাহাদিগকে ওয়াকিবহাল করিতে পারেন।

এ কথা সত্য যে কোন পাঠ্যপুস্তকে নিজ পরিবেশের সকল তথ্য প্রদান করা সম্ভবপর নয়। দক্ষ শিক্ষকের কর্তব্য সময়োপযোগী উদাহরণ সংযোজিত করিয়া পাঠকে সজীব করা। ইহা শিশুর স্মৃতিকে সাহায্য করে। গ্রামে গোবর বহুল পরিমাণে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাকে নষ্ট না করিয়া অন্য কাজে কার্যকরীভাবে যে ব্যবহার করা যায়—শিক্ষক তাহার নির্দেশ দিতে পারেন। গোবরের গ্যাস জ্বালানি বা আলো হিসাবে ব্যবহার এবং বাকী অংশ

উত্তম সার হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কূপ হইতে বিভিন্ন রকমে জল তুলিয়া সিঞ্চন কাজ, রুটী তৈরী, পোকার গুটী হইতে রেশম প্রস্তুত প্রণালী, বিভিন্ন প্রকার পাতা, ফুল, ফল, শিকড় প্রভৃতি বিষয়ের সময়োচিত উদাহরণ দ্বারা শিক্ষক শিশুর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিতে পারেন। এইভাবে গ্রামের ছাত্রকে গ্রাম ছাড়াও শহরের এবং শহরের ছাত্রকে শহর ও গ্রামের লোকের জীবনযাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবৃতি দিয়া জ্ঞানের একটি সাধারণ পটভূমি তৈরী করিতে শিক্ষক সক্ষম হইবেন।

পাঠ্য পুস্তকের স্থান ঃ—মনে রাখা দরকার সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠদানে পাঠ্য পুস্তকের স্থান অনস্বীকার্য। দক্ষ শিক্ষাবিদের বুদ্ধিমত্তায় শিশুর বয়সের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত এবং বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য প্রদানে সক্ষম পাঠ্য-পুস্তক অধিকতর কার্যকরীভাবে শিক্ষকের অধ্যাপনার পরিপূরকরূপে সাহায্য করিবে। সেইজন্য সাধারণ বিজ্ঞান পাঠদানে পাঠ্য পুস্তকের স্থান বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্য বিষয়কে সজ্জিত করার পদ্ধতি ঃ—

সাধারণ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সজ্জিত করা যায়। মোটামুটি ভাবে তাহাদিগকে যে সকল পদ্ধতিতে সজ্জিত করা যায় তাহাদের কয়েকটি নীচে আলোচিত হইল ঃ

(ক) ঐতিহাসিক ধারায় সজ্জিত করা।

(খ) যুক্তির ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সজ্জিত করা।

(গ) বিভিন্ন সাধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সজ্জিত করা।
—উক্ত বিষয় বিজ্ঞানের মূল নীতি বা শিক্ষার্থীর আগ্রহসৃষ্টিকারী পরিবেশের উপর গঠিত হইতে পারে।

(ঘ) শিক্ষার্থীর মানসিক বয়স এবং প্রক্ষোভ অনুসারে সজ্জিত করা।

উক্ত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে—

(১) বিদ্যালয়ে প্রদত্ত স্থানের উপযোগী করিয়া বিষয়বস্তুকে সাজাইতে হইবে।

(২) বিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষকের উপস্থিতি, তাঁহাদের উৎসাহ এবং কর্মক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিষয়বস্তুকে সাজাইতে হইবে।

এখানে মনে রাখা দরকার যে উক্ত পদ্ধতিগুলি প্রত্যেকে স্বতন্ত্র নয়—একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করে। নীচে প্রতি পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে ঃ

(ক) **ঐতিহাসিক ধারা** ঃ—পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে বালক বালিকা সাধারণতঃ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে চায় না। বিভিন্ন প্রকার বীজাণু, বীজাণু মুক্ত করার পদ্ধতি, নির্বীজন প্রভৃতির পাঠদান কালে Leeuwenhoek, Pasteur বা Lister-এর নাম অনায়াসেই যুক্ত করা যায়। রসায়নবিদ্যার প্রারম্ভে প্রকৃতি বিজ্ঞান আসিয়াছিল। জ্যোতির্বিদ্যার পরে ভূবিদ্যা আসিয়াছে। ঐতিহাসিক ধারায় "অজৈব" পদার্থের জ্ঞান (দুই একটি ছাড়া) 'জৈব' পদার্থের জ্ঞান প্রাপ্তির পূর্বেই আসিয়াছে। এই ঐতিহাসিক ধারাকে সরস করিয়া শিশুমনের আগ্রহ ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিবেশন করিলে তাহা কখনও নিরস হইতে পারে না। শিক্ষকের প্রচেষ্টায় উহা বিষয়-বস্তুকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবে।

(খ) **যুক্তির ধারাবাহিকতা** ঃ—শিশু বয়সে বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষার্থী শিক্ষকের নিকট হইতে পাইয়া থাকে। সেখানে তাহাকে শিক্ষকের পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। বিজ্ঞান পাঠ কালে শিশুর জ্ঞানলাভের পদ্ধতিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ

(১) উপস্থাপনের সময় পরীক্ষা করা,

(২) উপস্থাপনের সময় কতকগুলি ঘটনা ধরিয়া লইয়া পরে সেগুলিকে পরীক্ষা করা,

এবং (৩) বই বা শিক্ষক পরিবেশিত জ্ঞানকে মানিয়া লওয়া।

প্রথম পদ্ধতিতে বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ করে এবং তাহা হইতে সিদ্ধান্তে আসে ও সূত্র নির্ণয় করে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কতকগুলি ঘটনা শিক্ষার্থী মানিয়া লয়। শিক্ষক প্রতিশ্রুতি দেন যে ঐগুলির পরীক্ষা পরে প্রদত্ত হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে তিনি সে সকল প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন।

তৃতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী কতকগুলি ঘটনাকে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করে। এই পদ্ধতি কেবল বিজ্ঞানে নহে, শিক্ষার যে কোন বিষয়ে ইহা আংশিকভাবে বিশেষ কার্যকরী।

মনে রাখা দরকার বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে সজ্জিত করা সহজ কার্য নহে। একই বিষয়কে বিভিন্ন স্থানে কার্যকরীভাবে স্থাপন করা যাইতে পারে। যেমন—ঐতিহাসিক ধারাকে যুক্তিযুক্তভাবে সজ্জিত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। আবার যুক্তির উপর নির্ভরশীল তথ্যগুলির পর্যায়ক্রমে সাধারণীকরণের মাধ্যমে ঘটনাগুলিকে সজ্জিত করা যায়। একই বিষয় (জীব) যুক্তিযুক্তভাবে বিভিন্নরূপে সজ্জিত করার উদাহরণ নীচে দেওয়া হইল।

প্রথমতঃ গঠন প্রকৃতি হিসাবে বিভিন্ন ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে জীবের আলোচনা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ শারীরিক বিভিন্ন কার্যাবলীর উপর নির্ভর করিয়া বিষয়গুলিকে সাজান যাইতে পারে। যেমন—পাচনক্রিয়া, প্রজনন, উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া প্রভৃতি। আবার অ্যামিবা হইতে সুরু করিয়া জটিলতার পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করা যায়।

আবার কোন বৈজ্ঞানিক নীতিকে কেন্দ্র করিয়া তাহার স্বাভাবিক প্রয়োগের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে সজ্জিত করা যায়। যেমন—মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রয়োগ হিসাবে দোলক ঘড়ির দোলন, উদ্ভিদের বৃদ্ধির গতি নির্ণয়, পশুর দৈহিক কাঠামোর স্বপক্ষে যুক্তি স্থাপন প্রভৃতিকে সংযোজিত করা যাইতে পারে। Inverse Square Law-এর প্রয়োগ—আলোর তীব্রতা এবং পরিমাণ নির্ণয়, ক্যামেরাতে বক্রতালিক কাঁচের আয়তন নির্ণয় ও ছবি তুলিতে সময় প্রদান, এমন কি চুম্বকদণ্ডের শক্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে। বিষয়গুলি যতই যুক্তিযুক্তভাবে সজ্জিত হউক না কেন—বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিকবার বিষয়গুলির আলোচনা অপরিহার্য এবং একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে।

বিষয়বস্তুকে যুক্তিযুক্তভাবে সজ্জিত করিতে হইবে ঠিকই, কিন্তু শিক্ষার্থীর পরিবর্তনশীল মানসিক কাঠামোর কথা সংগে সংগে মনে রাখা বিশেষ দরকার।

কারণ শিক্ষার্থীর জন্যই বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা। তাই বিজ্ঞানের যুক্তির সহিত শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনকে যুক্ত করিতে পারিলে উক্ত পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী হইবে।

(গ) সাইকেলের 'স্পোক'গুলি রিমের এক পাশ হইতে অন্য পাশ পর্যন্ত ব্যাস-এর ন্যায় বিস্তৃত বা মধ্যে অবস্থিত 'হব' হইতে 'রিম' পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকেও সেইরূপভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

আমরা যখন কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি সেই বিষয়টি আমাদের মনে একক ভাবে স্থান দখল করে না। জ্ঞাত অন্যান্য বিষয়ের সহিত তাহার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করিয়া নূতন জ্ঞানকে গ্রহণ করি। তাই এক বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দানা বাঁধিয়া উঠে। বিভিন্ন বিষয় যখন একটি সূত্রে গ্রথিত হইয়া উঠে তখন 'একক পদ্ধতি' অবলম্বনে বিষয়বস্তুকে সজ্জিত করা যায়।

(১) পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে কোন বৈজ্ঞানিক নীতির উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন বিষয়কে সজ্জিত করা যায়। যেমন—মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, Inverse Square Law ইত্যাদি। 'কাজ'-কে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র যন্ত্রবিদ্যাকে সাজান যায়। 'শক্তি'-কে কেন্দ্র করিয়া প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন ধারণ, খাদ্যের দ্রব্যগুণ, শরীরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়কে সাজান যাইতে পারে। 'বায়ুর ঢেউ'-কে কেন্দ্র করিয়া পদার্থের কম্পন, ঢেউ সংযোজন, বিভিন্ন স্বরের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়, আলোর গতি, বিদ্যুৎ-চুম্বকের বর্ণালী, রেডিওর কার্যাবলী প্রভৃতি বিষয়কে সজ্জিত করা যায়। এইরূপে জীববিদ্যার বিভিন্ন বিষয়, যেমন—প্রাণী ও উদ্ভিদের নির্ভর-শীলতা, পরিবেশের সহিত প্রাণী বা উদ্ভিদের খাপ খাওয়া প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে সংযোজিত করা যায়। শিক্ষার্থীর ঝোঁক ও দক্ষতার উপর নির্ভর করিয়া কোন বিষয়কে কেন্দ্রনীতির সহিত সংযুক্ত করা উচিত।

(২) কতকগুলি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া বিষয়বস্তুকে সজ্জিত করার সময় মনে রাখিতে হইবে যে সেগুলি যেন শিক্ষার্থীর নিজ আগ্রহের সংগে যুক্ত হয়। ঐ বিষয়গুলিকে তাহার নিজ পরিবেশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিলে ঐ আগ্রহ সৃষ্টি

হইতে পারে। গ্রামীণ পরিবেশ হইতে তৎকালীন উদাহরণের সংগে সংগে দূর দেশের উদাহরণ আনয়ন করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সাহায্য লইতে হইবে। প্রশ্নের ধরনে বিষয়গুলি নির্বাচিত করিলে শিশুর আগ্রহ অধিক পরিমাণে উজ্জীবিত হইবে। 'জিনিস পোড়াইলে কি হয়?'—এই প্রশ্নের মাধ্যমে রসায়নবিদ্যার দহন, পদার্থবিদ্যার উত্তাপ ও তাহার সঞ্চালন, উদ্ভিদবিদ্যার উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়া, প্রাণীবিদ্যার মানুষ এবং পশুর শ্বাসক্রিয়াকে একত্রীভূত করা সম্ভবপর। ইহার আনুসঙ্গিক বিষয় হিসাবে খাদ্য, ভিটামিন, কৃত্রিম সার উৎপাদন প্রভৃতিকেও যুক্ত করা যায়। যে সকল দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে সেখানে ভূগোল পাঠের সংগে বিজ্ঞানকে সংযুক্ত করা সম্ভবপর। সেই দেশের আবহাওয়া, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, প্রাকৃতিক অবস্থা ভূগোলের সীমানার মধ্যে আসে। কিন্তু জলশক্তি, ডাইনামো, শক্তির রূপান্তর বা সস্তায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সাহায্যে দেশকে সমৃদ্ধ করা প্রভৃতি বিষয়কে উহার সহিত সংযুক্ত করিয়া শিক্ষার্থীর আগ্রহকে জাগরিত করা বা জ্ঞানের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা যায়। আমাদের দেশে দামোদর, হীরাকুঁদ, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি বাঁধের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন।

(ঘ) শিশু খেলা ভালবাসে ; কিন্তু সব রকম খেলা সব বয়সে ভালবাসে না। বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে কয়েকদিন অন্তর সে এক খেলা ত্যাগ করিয়া অন্যটিকে গ্রহণ করে। শিশু বেশী দিন ধরিয়া এক বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। সে বৈচিত্র্য চায়। এই কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া তাহার পাঠ্যবিষয় নির্বাচিত হওয়া উচিত। সাধারণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় তাহার আগ্রহ সঞ্চার এবং ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে সক্ষম। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক এমন ভাবে পরীক্ষা ও পাঠ সজ্জিত করিবেন যেন অবসাদ ও বিরক্তি উৎপাদনের পূর্বে শিশু সেগুলিকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে পারে। সেইজন্য শিশুর মানসিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্তভাবে সজ্জিত বিষয়বস্তু এ পর্যায়ে পরিবেশন করা অনুচিত। সহজবোধ্য অথচ আগ্রহসৃষ্টিকারী বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় পাঠ্যসূচীতে স্থান

পাওয়া উচিত। সেখানে যুক্তির অবতারণা করিলে হয়তো শিশুর সব রকম আগ্রহ নষ্ট হইতে পারে। বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে শিশুর আগ্রহ বজায় থাকার কাল বর্ধিত হয়; তখন সে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং যুক্তিপূর্ণভাবে সজ্জিত বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিতে উৎসাহী হয়—প্রয়োজনবোধে শিক্ষক তাহাকে উৎসাহী করিয়া তোলেন। আরও বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে শিক্ষার্থীর মন পুষ্টিলাভ করে এবং চিন্তা সুসংহত হয়। দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া সে পরিতুষ্টি লাভ করে।

উপরে পাঠ্যসূচী প্রস্তুতির কয়েকটি পদ্ধতি দেওয়া হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে কোন্ পদ্ধতি সর্বোৎকৃষ্ট? এই প্রশ্নে কোন একক উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। শ্রেষ্ঠ উত্তর হইবে—পরস্পর বিরোধী এই পদ্ধতিগুলির শ্রেষ্ঠ সমন্বয় সাধন। বিশেষ শিশু এবং বিশেষ ছাত্রের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পথই হইতেছে ইহার শ্রেষ্ঠ সমাধান। সাধারণ বিজ্ঞানে এই পথ বাছিয়া লইতে হইবে। পদার্থ বা রসায়নবিদ্যা অপেক্ষা জীববিদ্যায় কম যুক্তি বিদ্যমান। পদার্থ এবং রসায়নবিদ্যার মূল নীতিগুলি বাছিয়া জীববিদ্যার উদাহরণগুলিকে যথাযথ স্থানে সংযুক্ত করা যাইতে পারে। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে তাহার উপযোগী জীববিদ্যার বিষয় পাঠদান করা যাইতে পারে এবং সেগুলি বিভিন্ন সমস্যামূলক কার্যাবলীর দ্বারা সম্ভব হইতে পারে।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে **অখিল ভারত সেমিনারে** (The First Seminar on the Teaching of Science in Secondary Schools) গৃহীত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর সুপারিশগুলি নীচে আলোচিত হইতেছে।

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যসূচী

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী এইভাবে তৈরী করিতে হইবে যে তাহা যেন শিক্ষক, গ্রন্থকার, পরিচালকমণ্ডলী এবং এমন কি শিক্ষার্থীর কাছে সত্যসত্যই কার্যকরী হয়। সুসংবদ্ধ পাঠ্যসূচীতে বিষয়বস্তু, প্রজেক্ট, সমস্যাপূর্ণ

একক, আবিষ্কার, ওয়ার্কশপ কার্যাবলী, শিক্ষণীয় সুপারিশ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। এই বিষয়ে UNESCO রচিত 'Teaching of Science to Tropical Primary Schools' বইটিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সুসংবদ্ধ প্রণালীতে বিষয়বস্তুকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) জীব, (২) পৃথিবী ও বিশ্ব এবং (৩) পদার্থ ও শক্তি। বক্তৃতা, প্রতিপাদক, কার্যসমস্যা প্রভৃতি পদ্ধতিতে বিষয়গুলির শিক্ষণ চলিতে পারে। বিষয়ের দিকে নজর দিয়া শিক্ষক শিক্ষিকা পদ্ধতি নির্বাচন করিবেন। পাঠ্যসূচীর মধ্যে বিষয়বস্তু ছাড়াও প্রতি এককে শিক্ষার্থীর কাজ, শিক্ষকের প্রতি নির্দেশনা, যন্ত্রপাতি এবং পদ্ধতির উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বৎসরে এক শত ঘণ্টার একটি পরিকল্পনা দেওয়া হইল। যে সকল বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কৃষিকে Basic Craft হিসাবে লওয়া হইয়াছে সেখানে ঘণ্টার পরিমাণ কিছু বেশী হইবে। আবার বুনিয়াদী নয় এমন বিদ্যালয়ে ঘণ্টার পরিমাণ কম হইবে।

(১)	শিক্ষামূলক ভ্রমণ, প্রদর্শনী প্রভৃতি	২০ ঘণ্টা
(২)	প্রজেক্ট এবং অনুরূপ কার্যাবলী	৫০ ঘণ্টা
(৩)	শ্রেণীর পাঠ, আলোচনা, প্রতিপাদক, বক্তৃতা প্রভৃতি	৩০ ঘণ্টা
		মোট···১০০ ঘণ্টা

প্রথম শ্রেণীর জন্য পাঠ্যসূচীর নমুনা

(১) **জীব**—নিত্য পরিবেশের সাধারণ উদ্ভিদ, বিভিন্ন উপায়ে বীজের বিস্তৃতি, পশু ও পক্ষীর পরিচিতি ও তাহাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, শ্রেণীকক্ষের সজ্জা ও পরিচ্ছন্নতা।

(২) **পৃথিবী ও বিশ্ব**—সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, চন্দ্র, চন্দ্রালোক, চন্দ্রকলা, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, নিত্য পরিবেশে জলের প্রাপ্তিস্থান।

মোট পিরিয়ডের সংখ্যা··· ২০০

বলা বাহুল্য যে পাঠ্যসূচীতে পাঠ্যবিষয় ছাড়াও প্রতিপাদক, পরীক্ষা এবং বাহিরের কার্যাবলী নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। স্থানাভাবে এখানে তাহা উল্লেখ করা সম্ভব হইল না।

(২) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যসূচী

(ক) Secondary Education Commission তাঁহাদের সুপারিশে গণিত এবং সাধারণ বিজ্ঞানকে একটি core subject হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী উহাদিগকে দুইটি পৃথক core subject হিসাবে গণ্য করা উচিত। সাধারণ বিজ্ঞানের জন্য নিম্নলিখিত পিরিয়ডগুলি থাকা দরকার।

নবম শ্রেণী ... ... সপ্তাহে ৪ পিরিয়ড বা বৎসরে ১৪১ পিরিয়ড
দশম শ্রেণী ... ... সপ্তাহে ৩ পিরিয়ড বা বৎসরে ৯৪ পিরিয়ড
একাদশ শ্রেণী ... সপ্তাহে ২ পিরিয়ড বা বৎসরে ৭৫ পিরিয়ড

অর্থাৎ সাধারণ বিজ্ঞানের জন্য সারা বৎসরে ৩১০ পিরিয়ড নির্দিষ্ট থাকা উচিত।

(খ) উক্ত সেমিনার A. I. C. S. E. প্রণীত পাঠ্যসূচীর খসড়াটি যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিয়া তাহার সহিত অতিরিক্ত সহযোগিতাপূর্ণ কার্যাবলী এবং বিদ্যালয়ের বাহিরের কার্যাবলী যুক্ত করিয়াছেন। এই নূতন পাঠ্যসূচীটি জীবনের সহিত—শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সহিত আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ। সেমিনার মনে করেন যে শিক্ষার্থীর পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করা সম্ভবপর এবং ইহার মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সুসংবদ্ধতা গড়িয়া উঠিবে। দুই প্রকার এককে পাঠ্যবিষয়কে বিভক্ত করিয়া তাহা সম্ভবপর—(১) পরিবেশ-কেন্দ্রিক একক, এবং (২) জীবন-কেন্দ্রিক একক।

পরিবেশ-কেন্দ্রিক একক সমূহ

১ নং একক—আবহাওয়া
২ নং একক—জীবনের অত্যাবশ্যকীয় বস্তু—জল
৩ নং একক—পৃথিবী-পৃষ্ঠ
৪ নং একক—অগ্নি ও উত্তাপ
৫ নং একক—বায়ুও জলের উপর তাপের ক্রিয়া
৬ নং একক—আলো
৭ নং একক—সভ্যতা ও ধাতুর ব্যবহার
৮ নং একক—কাজ ও শক্তি
৯ নং একক—গমনাগমনের সমস্যা
১০ নং একক—উদ্ভিদ ও পশু
১১ নং একক—দেহ যন্ত্রের জ্ঞান
১২ নং একক—নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন
১৩ নং একক—বিজ্ঞান ও জীবন দর্শন, সময় নির্দেশক চার্ট ও জীবনী

জীবন-কেন্দ্রিক একক সমূহ

১ নং একক—বিজ্ঞান-সৃষ্ট পৃথিবী
২ নং একক—আমাদের ব্যবহৃত বায়ু
৩ নং একক—আমাদের ব্যবহৃত জল
৪ নং একক—আমাদের ব্যবহৃত খাদ্য
৫ নং একক—মানুষ কিরূপে খাদ্য সংগ্রহ করে
৬ নং একক—আমাদের ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ
৭ নং একক—আমাদের বাসোপযোগী গৃহ
৮ নং একক—আমাদের ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ
৯ নং একক—শক্তি
১০ নং একক—রোগের হাত হইতে ত্রাণ

১১ নং একক—জীববিদ্যার সামগ্রীর প্রাপ্তিস্থান

১২ নং একক—খনিজ সম্পদের প্রাপ্তিস্থান

১৩ নং একক—গমনাগমনের উপায়

১৪ নং একক—পৃথিবীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন

১৫ নং একক—আমাদের বাসভূমি—বিশ্ব

১৬ নং একক—জীবনের ইতিহাস

১৭ নং একক—স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপায়

(গ) পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা

(১) (ক) A. I. C. S. E. প্রণীত পাঠ্যসূচীর খসড়াটি ভালবাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া সেমিনার জানান যে যদিও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তুর অধিকাংশই শিক্ষার্থীর মানসিক যোগ্যতার উপযোগী, কিন্তু এমন কয়েকটি বিষয় সেখানে বিদ্যমান যেগুলি শিক্ষার্থীর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা মোটেই সম্ভব নয়। পাঠ্যসূচী হইতে সেগুলি বাদ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

(খ) বিপরীতপক্ষে অন্যান্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়কে পাঠ্যসূচীতে স্থান দেওয়া দরকার।

(গ) নূতন পাঠ্যসূচীতে বিস্তারিতভাবে পাঠ্যবিষয়, প্রতিপাদক, পরীক্ষা এবং বাহিরের কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

(২) যে বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগার এবং বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষক বিদ্যমান সেইখানেই কেবল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্যসূচীর সমস্ত বিষয়ে পাঠদান সম্ভবপর; কিন্তু আমাদের দেশে এখনও বহু বিদ্যালয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত না হওয়ায় প্রদত্ত পাঠ্যসূচীকে আগামী পাঁচ বৎসর ধরিয়া বিশেষ-ভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং অভিজ্ঞতা অনুসারে তাহাকে পরিবর্তিত করিতে হইবে।

(৩) কার্যকরী শিক্ষাদানের পক্ষে শ্রেণীতে চল্লিশ জনের অনধিক শিক্ষার্থী থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৪) পরীক্ষা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতি কুড়ি জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন অতিরিক্ত শিক্ষক বা ডেমন্‌স্ট্রেটর নিযুক্ত করা দরকার।

(৫) এই নূতন পাঠ্য সূচীতে Intermediate Course-এর বহু বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। পাঠদান সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য বর্তমান স্নাতক শিক্ষক শিক্ষিকার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রচলন করিতে হইবে এবং এখন হইতে বিদ্যালয়ে এম্‌, এ, এবং এম্‌, এস্‌-সি শিক্ষক শিক্ষিকাকে নিয়োগ করিতে হইবে।

(৬) বাৎসরিক লিখিত পরীক্ষার সংগে প্রাকৃটিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার সময় উক্ত দুই পরীক্ষার ফলের হিসাব লইতে হইবে।

(৭) বিজ্ঞান পাঠ্যসূচীতে প্রদত্ত প্রজেক্ট, ভ্রমণ প্রভৃতি কার্যাবলীর ভার বিজ্ঞান সমিতির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৮) যদি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নূতন পাঠ্যসূচী নির্দেশিত প্রতিপাদক বা প্রাকৃটিক্যাল কাজ সংঘটিত না হয় তাহা হইলে পাঠ্যসূচীর মূল নীতিতে কুঠারাঘাত পড়িবে এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান পূর্ববৎ পুঁথিতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। ইহা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে (১) প্রতি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সেমিনার নির্দেশিত যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম, বিভিন্ন উপকরণ ও পরিসর ঘর এবং (২) বিদ্যালয়গুলিকে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

জীববিদ্যা

খসড়া পাঠ্যসূচীর প্রাণীবিদ্যা অংশে Intermediate Course-এর বিষয়গুলি স্থান পাইয়াছে ; কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যার অংশটি সমযোগ্যতা অর্জন করিতে পারে নাই। সেইজন্য সেমিনার নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকেও পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্তির জন্য সুপারিশ করিতেছেন।

(১) উদ্ভিদ জগতের দুইটি বিভাগের প্রত্যেকটি হইতে অন্ততঃ একটি করিয়া প্রতিভূ নির্বাচন।

(২) উদ্ভিদে জায়মান বংশ বিস্তৃতি।

(৩) গুপ্তবীজী (Angiosperm) বিভাগের কয়েকটি সাধারণ অথচ প্রয়োজনীয় পরিবার।

(৪) বংশ গতি ও বিবর্তন।

(৫) উদ্ভিদবিদ্যায় বিশেষজ্ঞের জীবনী।

সেমিনার A. I. C. S. E. প্রণীত খসড়া পাঠ্যসূচীকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়াছেন। নীচে তাহার সারাংশ দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য যে কেবলমাত্র পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তুটি এখানে আলোচিত হইয়াছে। প্রতিপাদক, পরীক্ষা এবং বাহিরের কার্যাবলীর বিবরণ স্থানাভাবে এখানে দেওয়া সম্ভব হইল না। (For Elective Physics, Chemistry and Biology, see proceedings of the First All India Seminar on the Teaching of Science in Secondary Schools, 1956—A. I. C. S. E., Ministry of Education, Government of India, New Delhi).

সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী

(উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম, দশম এবং একাদশ শ্রেণীর জন্য)

১নং একক—আমাদের পরিবেশ

(ক) পৃথিবী, শিলা ও মাটি

(খ) উদ্ভিদ—কৃষিজাত উদ্ভিদ, রবিশস্য, সব্জি, গাছ

(গ) পশু, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি

(ঘ) বিশ্ব—সূর্য, গ্রহ, তারকা, ঋতু, জোয়ার, ভাটা

২নং একক—বস্তুর প্রকৃতি

(ক) বাতাস—আবহাওয়া, বায়ুর চাপ, সিরিঞ্জ ও সাইফন, পাম্প, বায়ুর আর্দ্রতা, বায়ুর উপাদান, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড

(খ) জল—প্রাপ্তিস্থান, প্রাকৃতিক ধর্ম, ঘনত্ব, আপেক্ষিক গুরুত্ব, হাইড্রোমিটার

(গ) প্রাকৃতিক ও যৌগিক পরিবর্তন—মিশ্রিত ও যৌগিক পদার্থ, মিশ্রিত পদার্থের পৃথকীকরণ, অ্যাসিড ও ক্ষার

(ঘ) ব্যবহারোপযোগী সাধারণ ধাতু—ধাতব ও অধাতব পদার্থ

(ঙ) আমাদের ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী—কাগজ, দেশলাই, সাবান, কাঁচ, কালি

৩নং একক ঃ—শক্তি ও কাজ

(ক) তাপ—তাপের উৎস, তাপ ও উষ্ণতা, পদার্থের উপর তাপের প্রভাব, তাপমান যন্ত্র, তাপ সঞ্চালন

(খ) আলো—স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ পদার্থ, আলোর গমন ও গতি, প্রতিফলন, প্রতিসরণ, প্রিজম্

(গ) শব্দ—শব্দ সৃষ্টি, সরল বাদ্য যন্ত্র, কান, টেলিফোন ও ফোনোগ্রাফ

(ঘ) চুম্বকত্ব—চুম্বকের ধর্ম, ব্যবহার, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র

(ঙ) বিদ্যুৎ—সৃষ্টি, শেল, ডাইনামো, বিদ্যুৎ প্রবাহের ফল, বিদ্যুতের ব্যবহার, বিদ্যুৎ-চুম্বক, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিগ্রাফ যন্ত্র, মাইক্রোফোন, রেডিও প্রভৃতি

(চ) আণবিক শক্তি—অণুর গঠন, আণবিক শক্তির সৃষ্টি

(ছ) সরল যন্ত্রপাতি—লিভার, তৌলদণ্ড, গিয়ার, চাকা, কপিকল ইত্যাদি বায়ু ও জলের মিল, স্টীম ইঞ্জিন, internal combustion engine

৪নং এককঃ—জীবন

(ক) জীব ও জড়

(খ) কোষ, প্রোটোপ্লাজম্, তন্তু

(গ) উদ্ভিদ ও জন্তু—জীবাণু, জীবের পুষ্টি, কার্বন এবং নাইট্রোজেন-চক্র

(ঘ) উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়া ও পুষ্টি, প্রজনন

(ঙ) যৌন-স্বাস্থ্য

(চ) জীবের ক্রমবিবর্তন

(ছ) মানব যন্ত্র—প্রয়োজনীয়তা ও যত্ন, গঠন, খাদ্যের হজম ক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, শ্বাসক্রিয়া, চর্ম, শ্বাসযন্ত্র এবং রেচনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ

(জ) স্বাস্থ্য ও রোগ—সাধারণ রোগ, রোগপ্রতিষেধক শক্তি, ঠিকা ও ইনজেক্সন্

(ঝ) খাদ্য—প্রকার, মান, সুসমঞ্জস খাদ্য

(ঞ) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য—দন্ত, চর্ম, চক্ষু এবং কর্ণের যত্ন

(ট) মানসিক স্বাস্থ্যের উপায়

(ঠ) সামাজিক স্বাস্থ্যের জন্য পরিকল্পনা, আলো, বাতাস, পরিচ্ছন্নতা, জল নিকাশের ব্যবস্থা, পানীয় জল পরিষ্কার করার পদ্ধতি।

বিজ্ঞান শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি

বক্তৃতা পদ্ধতি (The Lecture Method)

বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষক নিজের আয়ত্ত বিষয়গুলিকে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে পরিবেশন করেন। কেবল বিদ্যালয়ে কেন, শিশু বাড়িতে ও মাতা-পিতার নিকট হইতে মুখে মুখে বহু আলোচনা শুনে ও নিজে যোগ দেয় এবং তাহার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। আজও আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি অধিক পরিমাণে অনুসৃত হইতেছে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ বড়ই পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। বক্তৃতা পদ্ধতির যাথার্থতা শিক্ষার্থীর জ্ঞানের মাত্রার উপর নির্ভরশীল। প্রাথমিক বা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বক্তৃতা পদ্ধতি মোটেই কার্যকরী নয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কর্তব্য হইবে শ্রেণীতে এমন একটি আবহাওয়া তৈরী করা যাহাতে তাহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। ইহার ফলে শিক্ষক কেবলমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়োপযোগী তথ্য শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন। শিক্ষার্থী তাহার প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষকের সহযোগিতায় সকল তথ্য আহরণ করিবে। সুতরাং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বক্তৃতার স্থান খুবই কম বিদ্যমান। পাঠের উপস্থাপনে কখনও কখনও বক্তৃতার প্রয়োজন অনুভূত হয়। তবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রাথমিক এবং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অপেক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী উক্ত পদ্ধতিতে বেশী উপকৃত হয়। তবে শেষোক্ত ক্ষেত্রে শিক্ষকের উচিত বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার্থীর অবসাদ ও অনিচ্ছা জাগিবার পূর্বে কিছু প্রশ্নের অবতারণা করিয়া পাঠটিকে জীবন্ত করিয়া তোলা।

বক্তৃতা পদ্ধতি শিক্ষককে নিম্নলিখিতভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রথমতঃ শিক্ষক এই পদ্ধতিতে শীঘ্র পাঠ্যবিষয়কে ছাত্রদের নিকট পরিবেশন করিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক শিক্ষার্থীর পরীক্ষামূলক ফলগুলিকে সংগ্রহ, সুসজ্জিত এবং সারাংশ তৈরী করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ পূর্বজ্ঞানের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন পাঠদান কালে, অথবা ভবিষ্যৎ পাঠের পথ প্রদর্শন কালে শিক্ষক এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারেন। চতুর্থতঃ কোন নূতন পাঠদান কালে শিক্ষার্থীর মনে নূতন আগ্রহ সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে শিক্ষকের বক্তৃতা বিশেষ ফলপ্রসূ। পঞ্চমতঃ পাঠ্য বিষয়োপযোগী যন্ত্রপাতি কোন্ কোন্ স্থানে পাওয়া যায়, কোন্ পুস্তকে তাহাদের কার্যপ্রণালী লিখিত আছে ইত্যাদির বিবরণ দেওয়ার সময় বক্তৃতার প্রয়োজন আছে। ষষ্ঠতঃ বিমূর্ত চিন্তার ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী।

বিজ্ঞান শিক্ষায় নিযুক্ত অনেক শিক্ষাবিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ পর্যায়ে বক্তৃতা পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতার কথা স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষালাভের ক্ষেত্র প্রসারিত করিবে। আবার অনেকে মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তনের স্বপক্ষে রায় দেন। কিন্তু বর্তমানে এই পরিবর্তন সাধন সুদূর পরাহত।

বক্তৃতা পদ্ধতির স্বপক্ষে মত দিতে যাইয়া অনেকে বলেন যে ইহা শিক্ষার্থীকে শ্রেণীতে নোট লইতে সাহায্য করে। শ্রবণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা, নিজের মনে সুসজ্জিত করা, নিজ ভাষায় প্রকাশ করা প্রভৃতি জটিল কার্যাবলী এক সঙ্গে সংঘটিত হইয়া শিক্ষার্থীর মানসিক উৎকর্ষতা সাধন করে। বক্তৃতার পরে শিক্ষক সেই নোটের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া পাঠটিকে সম্পূর্ণ করিতে পারেন।

যখন সকল বা অধিকাংশ শিক্ষার্থী আলোচনায় যোগ দেয়, শিক্ষক বিষয়-বস্তুকে চার্ট বা মডেলের সাহায্যে পরিবেশন করেন বা পাঠদানের সংগে সংগে বিষয়বস্তুর সারাংশ বোর্ডে লিখিয়া দেন, তখন বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষাদান বিশেষ কার্যকরী হয়।

'প্রেস্টন্' বক্তৃতা পদ্ধতির সুফল ও কুফল সম্বন্ধে নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। নীচে তাহার কয়েকটি আলোচিত হইল।

বক্তৃতা পদ্ধতির উপকারিতা

(১) এই পদ্ধতিতে বিনা শ্রমে পাঠদান করা যায়। ইহার জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি তৈরী বা ব্যবহার করিতে হয় না। শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত নহে।

(২) খুব তাড়াতাড়ি পাঠ্যবিষয়কে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেও শেষ করা যায়। অন্যান্য পদ্ধতিতে এরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত পাঠদান সম্ভবপর নহে।

(৩) এই পদ্ধতিতে পাঠদানে শিক্ষকের বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। যে কোন অবস্থাতে তিনি খাপ খাওয়াইতে সক্ষম হন।

বক্তৃতা পদ্ধতির অপকারিতা

(১) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নীরব শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করে। তাহারা ঠিকমত মনোযোগ দিতেছে বা বিষয় গ্রহণ করিতেছে কিনা ঠিক বুঝা যায় না। ইহা শিক্ষার মূল নীতিকে আঘাত করে।

(২) শিক্ষার্থী যাহা গ্রহণ করিতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছে কিনা তাহার ঠিকমত যাচাই হয় না।

(৩) শ্রেণীতে বিভিন্ন মেধাবিশিষ্ট শিক্ষার্থী থাকে। সকলে একই হারে পাঠ গ্রহণ করিতে পারে না। তাই বক্তৃতার ঝড়ে সে যোগসূত্র হারাইয়া ফেলে ও অমনোযোগী হইয়া উঠে।

(৪) শিক্ষার্থীর মনোযোগ বেশীক্ষণ স্থির থাকে না। তাই মাঝে মাঝে বিষয়ের মধ্যে নূতনত্ব আনিয়া তাহার মনোযোগ রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে তাহার স্থান নাই।

(৫) শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয়, শিক্ষক এখানে অতি মাত্রায় সক্রিয়।

(৬) ইহা বিষয়বস্তু মনে রাখার উপর জোর দেয়। বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার উৎকর্ষতা সাধনে ইহা অক্ষম।

বক্তৃতা পদ্ধতির উদাহরণ

উদাহরণ ঃ—পাচন ক্রিয়া

পূর্বজ্ঞানের আলোচনা ঃ— (১) খাদ্যের বিভিন্ন অংশ ঃ

(ক) শর্করা, (খ) প্রোটীন, (গ) তৈলজাতীয় পদার্থ, (ঘ) জল, (ঙ) লবণ, (চ) ভিটামিন

(২) খাদ্যের দ্বিবিধ উপযোগিতা ঃ—

(ক) শরীরের ইন্ধন জোগান, এবং (খ) দেহের পুষ্টিসাধন।

(৩) সুসমঞ্জস খাদ্য

(৪) পাচন তন্ত্র ঃ—(ক) মুখবিবর, অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র (খ) বিভিন্ন পাচনরস, (গ) পিত্তরস।

নূতন জ্ঞান ঃ—(১) ক্ষুধার কারণ

(২) পাচন ক্রিয়ার অর্থ

(৩) পাচন তন্ত্রের কাজ ঃ—(ক) দাঁতের কাজ, (খ) জিহ্বার কাজ, (গ) মুখের বিভিন্ন রসের কাজ, (ঘ) ক্ষুদ্রান্ত্রের কাজ—অগ্ন্যাশয় রস, পিত্তরস, আন্ত্রিক রস, (ঙ) বৃহদন্ত্রের কাজ ; (চ) মুত্রাশয়ের কাজ (ছ) বিভিন্ন খাদ্যাংশের পরিণতি ও দেহের অনিষ্টকারক।

সারাংশ

(১) শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিণতি

শর্করা—→ডেক্সট্রীন—→মল্টোজ—→গ্লুকোজ।

(টায়ালিন ও এমাইলেজের সাহায্যে)

(২) প্রোটীন জাতীয় খাদ্যের পরিণতি
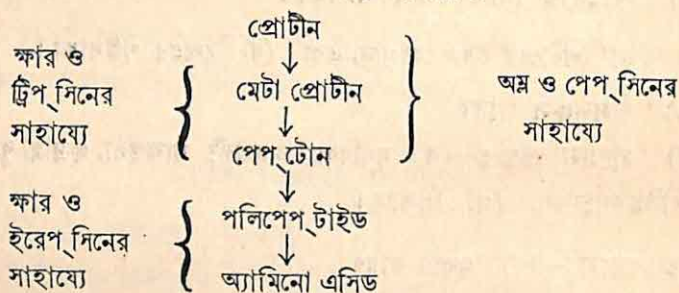
(৩) স্নেহজাতীয় পদার্থের পরিণতি

স্নেহজাতীয় পদার্থ—→স্নেহ অম্ল এবং গ্লিসারল—→সাবানের
(লাইপেজ) (লবণ)

রূপ প্রাপ্তি——→স্বাভাবিক স্নেহজাতীয় পদার্থ
(পিত্তরস)

উদাহরণ ঃ—কার্বন-চক্র

প্রাকৃতিক কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে উদ্ভিদ বা প্রাণী কিরূপে আত্তীকরণ করে বা ত্যাগ করে তাহা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। শিক্ষক যুক্তিযুক্তভাবে বিষয়বস্তুকে সাজাইয়া পাঠদান করিবেন এবং নিম্নলিখিত সারাংশ তৈরী করিবেন।

কার্বন-চক্র
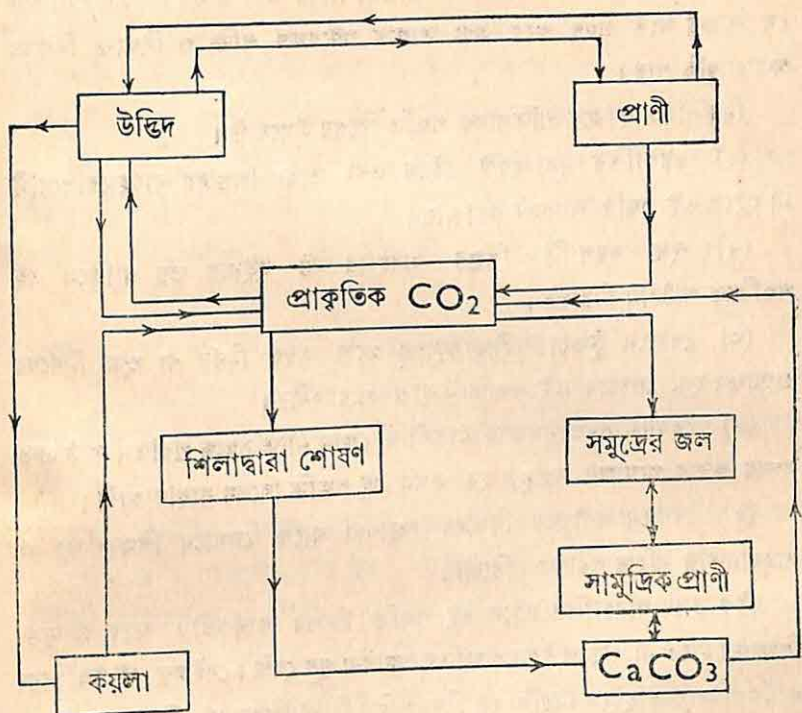
প্রতিপাদক পদ্ধতি (The Demonstration Method)

বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী শিক্ষকের পাঠদান শ্রবণ করে এবং বিষয়বস্তু মনে রাখে। বিজ্ঞান পাঠে যে পরীক্ষা নিরীক্ষার স্থান আছে তাহা ব্যাহত হয়। শিক্ষার্থীর পুঁথিগত জ্ঞান তাহার কাছে বোঝাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। প্রতিপাদক পদ্ধতিতে (Demonstration Method) এই ভার কিছুটা লাঘব করা যায়। বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষক কথা বলেন; কিন্তু প্রতিপাদক পদ্ধতিতে শিক্ষক পড়ান। শিক্ষক পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনমতে প্রশ্ন করেন। শিক্ষার্থী মনোযোগ সহকারে পরীক্ষার খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করে, কেন না পরে তাহাকে হুবহু উত্তর করিতে এবং সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে। শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের পর

প্রশ্নের জবাব দিতে এবং সিদ্ধান্তের যাথার্থতা নির্ণয় করিতে হয়। এই পদ্ধতিতে সে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং তাহার পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

নিম্নলিখিত কারণে প্রতিপাদক পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী।

(১) যন্ত্রপাতির মূল্য বেশী হইলে এবং তাহা শিশুদের ব্যবহারোপযোগী না হইলে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়।

(২) সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি শিশুর ব্যবহারে নষ্ট হইবার ভয় থাকিলে এই পদ্ধতিতে পাঠদান নিরাপদ।

(৩) যেখানে টুকরা পরীক্ষাসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় বা সূত্র নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়, সেখানে এই পদ্ধতি একান্ত প্রয়োজনীয়।

(৪) যেখানে সমস্যামূলক কার্যাবলী বা কোন নীতি সম্বন্ধে পুরাতন পাঠ দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়োজন অনুভূত হয় তখন এই পদ্ধতি বিশেষ সাহায্যকারী।

(৫) যেখানে পরীক্ষায় বিপদের সম্ভাবনা থাকে সেখানে শিক্ষক যত্ন ও সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিবেন।

ঠিক ভাবে পরিচালিত হইলে এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী। তবে উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে না পড়িলে ইহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা খুব বেশী। সেইজন্য এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে—

(ক) লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে শিক্ষক যখন কোন পরীক্ষা করিবেন তখন শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থী যেন তাহা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে পারে। বিজ্ঞান পাঠের জন্য আলাদা একটি ঘর থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্ধবৃত্তাকার লাইনে সজ্জিত ক্রমান্বয়ে উচু আসনগুলি হইতে শিক্ষার্থী ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষণ করিতে পারে। নতুবা বিভিন্ন উপায়ে বিজ্ঞান ঘরের আসন সাজাইতে পারা যায়। এখানে দুই একটি পদ্ধতি আলোচনা করা হইতেছে।

(১) যেখানে শ্রেণী বেশ সুশৃঙ্খল, সেখানে উচু বেঞ্চ-এর উপর বসিয়া বা বসার বেঞ্চ-এর উপর পরীক্ষাগারের টুল রাখিয়া তাহার উপর বসিয়া শিক্ষার্থী পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করিতে পারে।

(২) শিক্ষক কোন বেঞ্চ-এর সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন এবং শিক্ষার্থীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দূরে দাঁড়াইয়া পর্যবেক্ষণ করিতে পারে। অবশ্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম হইলে এই পদ্ধতি কার্যকরী হইতে পারে।

(৩) শিক্ষকের পরীক্ষা-টেবলের উপর ঝুলন্ত অবস্থায় আয়না রাখিলে পরীক্ষার খুঁটিনাটি শিক্ষার্থী ঐ আয়নায় দেখিতে পারে। কিন্তু ইহা ব্যয়-সাধ্য। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে ইহাকে কার্যকরী করা কষ্টসাধ্য।

(খ) পরীক্ষার জন্য যন্ত্রপাতি বেশ বড় হওয়া দরকার। তাপমান, চাপমান প্রভৃতি যন্ত্রের দাগগুলি বেশ সুস্পষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

(গ) পরীক্ষা-টেবলে যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা থাকা দরকার। এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যে শিক্ষক সেখানে প্রয়োজন বোধে অতিরিক্ত আলোর সাহায্য লইতে পারেন।

(ঘ) শিক্ষকের পরীক্ষা-টেবলের পশ্চাতে প্রায় সারা দেওয়াল জুড়িয়া লিখিবার বোর্ড থাকিলে ভাল হয়। কারণ পরীক্ষার পর নীতি বা অন্যান্য বিষয়ের সারাংশ বোর্ডে লিখিবার প্রয়োজন আছে। সাধারণতঃ শিক্ষক প্রথমে বোর্ডের বাম দিকে লিখিবেন, পরে ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। এ ছাড়া চার্ট, ছবি বা অন্যান্য চিত্র প্রদর্শনের জন্য ঐ দেওয়ালের কিছুটা স্থান নির্দিষ্ট থাকা দরকার।

(ঙ) পরীক্ষার সময় শিক্ষককে কিছুটা নাটকীয় ভঙ্গী গ্রহণ করিতে হয়। সময়ে ভাল শব্দসম্ভার ব্যবহার করিয়া, নূতনত্বের আলোকে শিক্ষার্থীকে উৎসাহো-দ্দীপ্ত করিয়া, পরীক্ষার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আগ্রহ ও ঔৎসুক্য টানিয়া লইয়া শিক্ষক দক্ষ শিল্পীর পরিচয় দিবেন।

(চ) পরীক্ষার বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার সহিত সজ্ঞানে সংযুক্ত করিতে হইবে।

(ছ) শিক্ষক এমন পরীক্ষা করিবেন যে শিক্ষার্থী পরে নিজে তাহা করিতে পারে।

(জ) পরীক্ষা করিয়া দেখাইবার সময় শিক্ষক মাঝে মাঝে ছাত্র ছাত্রীর

সাহায্য লইবেন। তাহারা কেহ হয়ত তাপমাত্রা দেখিল—কেহ বা সংযোজনে রং-এর কথা জানাইল বা যন্ত্রপাতি সজ্জিত করিল ইত্যাদি।

(ঝ) যেখানে পরীক্ষার বিষয়বস্তু দীর্ঘ, সেখানে শিক্ষক সব সাজ সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি পূর্ব হইতেই শিক্ষার্থীকে দেখাইবেন না। দেখাইলে পূর্বেই তাহার নূতনত্ব নষ্ট হইবে। আবার এক সংগে দেখিলে শিক্ষার্থী ঘাবড়াইয়া যাইতে পারে।

(ঞ) যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় মনে রাখা দরকার যে পরীক্ষার ফল সব সময়ে নির্ভুল হইবে। 'যন্ত্র খারাপ' বা 'লবন, অম্ল বা ক্ষার বিশুদ্ধ নয়'—এইরূপ কোন দোষারোপ করার চেষ্টা নিন্দার্হ। পরীক্ষা দেখাইবার পূর্বে শিক্ষক নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। পরে অন্যান্য আনুষঙ্গিক দোষ যেন না দেখা দেয় তাহার দিকে শিক্ষক বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।

(ট) কোন পরীক্ষা দেখাইবার সময় শিক্ষক স্থান, কাল, ঋতু প্রভৃতির কথা মনে রাখিবেন। যেমন—শিক্ষক নিশ্চয়ই গ্রীষ্মকালে বরফের পরীক্ষা বা স্থৈতিক বিদ্যুতের পরীক্ষা বর্ষাকালে করিবেন না।

প্রতিপাদক পদ্ধতিতে পাঠদান

আমাদের দেশের বিদ্যালয় ও তাহার যন্ত্রপাতির দিকে নজর রাখিয়া নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শিক্ষক বিজ্ঞানের অধিকাংশ পরীক্ষা প্রতিপাদক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নিকট পরিবেশন করেন। তাই এই পাঠদান পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন।

১। শিক্ষকের প্রস্তুতি

শিক্ষকের শিক্ষণ ক্ষমতা এই পদ্ধতিতে বিশেষরূপে ধরা পড়ে। প্রথমতঃ বিষয়বস্তুতে শিক্ষকের ভাল জ্ঞান থাকা দরকার। পূর্বজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকের উচিত ঐ বিষয়ের দু'একটি বই অধ্যয়ন করা। ভুল মনেরই ক্রিয়া, তাই মিথ্যা অহঙ্কার জলাঞ্জলি দিয়া শিক্ষক এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। ইহাতে

তাঁহার আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ছাড়াও যুগ পরিবর্তনের সংগে সংগে বিষয়গুলি নূতন জ্ঞানভারে সমৃদ্ধ হইতেছে। এই বর্দ্ধিষ্ণু জ্ঞান ভাণ্ডারের সহিত শিক্ষকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা দরকার।

দ্বিতীয়তঃ পাঠটীকা তৈরী করা শিক্ষকের একটি অন্যতম কাজ। শিক্ষক পাঠদানকালে কি নীতি অনুসরণ করিবেন বা কতগুলি পরীক্ষা বা প্রশ্ন কখন এবং কি ভাবে করিবেন—তাহার সম্বন্ধে পূর্ব হইতে সচেতন থাকিবেন। তাহা হইলে পাঠদানে ধারাবাহিকতা বজায় থাকিবে।

তৃতীয়তঃ যন্ত্রপাতি বা তাহার সামগ্রী ঠিক মত কাজ করিতেছে কিনা দেখিবার জন্য শিক্ষক পূর্ব হইতেই পরীক্ষাগুলি একবার করিয়া লইবেন। যেখানে শ্রেণীতে পরীক্ষা বিফল হয় সেখানে শিক্ষকের পাঠদান কেবলমাত্র যে ব্যর্থ তাহা নহে—উহা ক্ষতিকারকও। তাহা ছাড়া পূর্বে পরীক্ষা করিলে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী জোগাড় করিতে পারিবেন।

চতুর্থতঃ শিক্ষক পরীক্ষার সামগ্রী জোগাড় করিবেন। টেবলের উপর সেগুলিকে সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত করিবেন। এই সাজানর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক শৃঙ্খলা তৈরী হইবে।

(২) পাঠদানের প্রথম ধাপ ঃ প্রস্তুতি

পাঠদানের পূর্বে শিক্ষার্থীর পাঠে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জাগান শিক্ষাদানের এক অপরিহার্য অংগ। এই প্রাথমিক অংশটি ঠিকমত সংঘটিত না হইলে পাঠে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। প্রস্তুতি ভাল হইলে পাঠদানের অর্ধেক কাজ শেষ হয়। শিক্ষার্থীর এই আগ্রহ বিভিন্ন রূপে জাগরিত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শিশুর জ্ঞাত বস্তুর সহিত বর্তমান পাঠকে সম্পর্কযুক্ত করিতে হয়। শিশু নিজ পরিবেশে যে সকল ঘটনা দেখে—যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে—শিক্ষককে তাহার উপর নির্ভর করিতে হয়। দৈনন্দিন জীবনের উদাহরণই হইল পাঠের প্রাণ-কেন্দ্র। শিশুর এই জ্ঞাত বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষক নূতন জ্ঞান দিবেন। তাই এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত। জীবনের অভিজ্ঞতার উপর

প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্যামূলক জ্ঞানের সমাধানের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষক শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি এবং পাঠে মনোযোগী করিবেন।

(৩) নূতন জ্ঞান পরিবেশন

নূতন পাঠদানের সময় মনে রাখিতে হইবে শিক্ষক বিষয়বস্তুকে বৃহত্তর জ্ঞানের পটভূমিকায় পরিবেশন করিবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন রকমে পাঠ্যসূচী শেষ করিতে হইবে—এরূপ মনোভাব শিক্ষকের যেন না থাকে। প্রশ্ন উঠিতে পারে—কি করিয়া ভারাক্রান্ত পাঠ্যসূচী শেষ হইবে? সেই প্রশ্নে এই জবাব দেওয়া যাইতে পারে যে শিক্ষকের কর্মোৎদ্দীপনা অনেকাংশে এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে। পাঠ্যসূচীতে বিষয়ের কাঠামো থাকে। তাহাকে রক্ত মাংস দিয়া প্রাণবন্ত করিবার দায়িত্ব থাকে শিক্ষকের উপর। এইখানে তাঁহার মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন হয়। 'আপেক্ষিক গুরুত্বের' পাঠ কেবল মাত্র সূত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যায়। আবার তাহাকে বৃহত্তর জ্ঞানের সীমায় যেমন —তরল পদার্থে ভাসমান বা নিমজ্জমান পদার্থ, দুধে জল বা ধাতুতে খাদ পরীক্ষা, ডুবো জাহাজের কার্য প্রণালী, বেলুন, জাহাজ বা হেলিকাপটারের কার্যাবলী প্রভৃতি ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া যায়। এমন কি এই জ্ঞানকে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এ ছাড়া এই সমস্ত বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যে সকল বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের জয় পতাকা সমাজে উড্ডীন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন সংক্ষিপ্তাকারে তাঁহাদের জীবনী বা প্রাথমিক পরীক্ষার অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীকে জানান দরকার। তাহাতে শিক্ষার্থী যে কেবল সেই বিষয়ে মনোযোগী হইবে তাহা নয় নূতন কর্মে নিযুক্ত হওয়ারও প্রেরণা পাইবে।

শিক্ষাদান সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত প্রশ্নের উপর নির্ভরশীল। প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবে। শ্রেণীতে বেশী বক্তৃতাদান যেমন নিন্দনীয়, তেমনই শিক্ষাদান ব্যতিরেকে সব জ্ঞানই শিক্ষার্থীর নিকট হইতে প্রশ্নের সাহায্যে বাহির হইবে—ইহা আশা করা অনুচিত। কিন্তু এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করার দায়িত্ব শিক্ষকের। তাই কেবল প্রশ্নের মারফৎ

শিক্ষার্থীর জ্ঞানের সীমা সব সময়ে বর্ধিত না হইলেও, নূতন জ্ঞানলাভের স্পৃহা জাগিয়াছে জানিতে পারিলে প্রশ্নের উদ্দেশ্য সফল হইবে। এখানে শিক্ষকের কণ্ঠস্বরও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষকের উচিত ধীরে, স্পষ্টভাবে, আত্ম-প্রত্যয় সহকারে এবং নির্ভুল উচ্চারণে পাঠ পরিবেশন করা। তাঁহার কণ্ঠস্বরে উত্থান পতন থাকিবে। শিক্ষাদানে একঘেয়েমি বর্জনীয়। নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিবেদন করার মত তিনি পাঠ্যবিষয়কে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করিবেন। শিক্ষক ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার দিকে নজর দিবেন এবং অমনোযোগী ছাত্র ছাত্রীকে বুদ্ধিমত্তার সহিত মনোযোগী করিতে সাহায্য করিবেন।

(৪) পরীক্ষা

শিক্ষক প্রদর্শিত পরীক্ষা শিক্ষার্থীর কাছে আদর্শরূপে পরিগণিত হয়। সেই জন্য নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন ও ধারাবাহিক পরীক্ষা যাহাতে সংঘটিত হয় সেদিকে শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করিলে শিক্ষক সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সমাধা করিতে পারিবেন।

পরীক্ষায় অত্যাবশ্যকীয় সাবধানতা

(ক) যন্ত্রপাতি হইতে যথাযথ ফল পাওয়া দরকার। ফল ভুল হইলে তাহা অপকটে স্বীকার করা ভাল; কিন্তু অসাধু উপায়ে ঠিক ফল পাওয়া অত্যন্ত গর্হিত। শিক্ষক যেন কখনও একথা না বলেন, "আজ ঠিক হ'ল না, তবে এই ফলটি এরূপ হওয়া উচিত ছিল।" শিক্ষকের এই উক্তির ফলে শিক্ষার্থী শিক্ষকের উপর আস্থা হারায়। পরীক্ষার ফল সুস্পষ্ট ও আকর্ষণযোগ্য হওয়া উচিত।

(খ) পরীক্ষা সরল ও দ্রুত হওয়া প্রয়োজন। সেই জন্য যতদূর সম্ভব সরল যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করা উচিত।

(গ) সমগ্র পাঠের সংগে সংগে পরীক্ষা ধারাবাহিক ভাবে চলা উচিত। পাঠের পূর্ব বা শেষ পর্যায়ে পরীক্ষাগুলি তাড়াহুড়া করিয়া শেষ করা অনুচিত।

(ঘ) অপ্রয়োজনীয় বহু পরীক্ষা অপেক্ষা একটি প্রাসঙ্গিক পরীক্ষা অনেক

বেশী কার্যকরী। অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা শিক্ষার্থীকে বিভ্রান্ত করে এবং পাঠের উদ্দেশ্য নষ্ট করে।

(ঙ) সম্ভবমত একাধিক অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি গুছাইয়া রাখা উচিত একটি ভাঙ্গিয়া গেলে বা কোন কারণে তাহার কর্মক্ষমতা বিনষ্ট হইলে অন্য আর একটি ব্যবহার করিয়া সময়ের অপচয় রোধ করা যায়।

(চ) যন্ত্রপাতিগুলি ক্রমান্বয়ে সজ্জিত রাখা উচিত। শিক্ষক একটির পর একটি পরীক্ষা করিবেন এবং প্রয়োজন মিটিলে একপাশে সরাইয়া রাখিবেন।

(ছ) একবার ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সযত্নে রক্ষা করা উচিত। ইহাতে নান কাজে ব্যস্ত বিজ্ঞান শিক্ষক সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(৫) বোর্ডের কাজ

প্রতিপাদক পদ্ধতিতে বোর্ডের কাজ বিশেষ প্রয়োজনীয়। সাধারণত পরীক্ষালব্ধ ফল বা নীতির সারাংশ লেখা এবং ছবি বা বিভিন্ন চিত্রাঙ্কনের জন্য বোর্ডে লেখার দরকার হয়। কামারের কাছে হাতুড়ি বা জেলের কাছে জালের মত বোর্ড শিক্ষকের কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। বোর্ডের লেখাগুলি সুস্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন এবং পাঠোপযোগী হইবে। ভুল লিখিয়া আঙ্গুলে মুছিয়া তাহার উপর আবার লেখা অত্যন্ত অন্যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বোর্ডের বাম দিক হইতে লেখা আরম্ভ করিতে হয়। শিক্ষার্থী বোর্ডের লেখা নকল করে সুতরাং শিক্ষকের বিশুদ্ধ লেখার উপর শিক্ষার্থীর জ্ঞান গড়িয়া উঠে—এটা যেন সর্বদাই তাঁর মনে থাকে।

পরীক্ষার বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি বা নীতি অনুধাবন করাইবার জন্য শিক্ষক চিত্রের অবতারণা করেন। সেখানে যে তাঁহাকে দক্ষ আর্টিষ্ট হইতে হইবে তাহা ঠিক নহে। তাই তিনি সরল চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করিবেন। শিক্ষার্থীর উত্তর প্রয়োজনমতে সংশুদ্ধ করিয়া শিক্ষক বোর্ডে লিখিবেন। বোর্ডে লেখার ব্যাপারে শিক্ষক মিতব্যয়ী হইবেন। যেখানে একাধিক বোর্ড পাওয়া সম্ভবপর নয় সেখানে একটি বোর্ডকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া বাম দিকে নীতি বা সিদ্ধান্ত এবং দক্ষিণ-

দিকে চিত্র বা ছবি আঁকা যাইতে পারে। ছবি আঁকিয়া প্রতি অংশের নামকরণ করিতে হয়। নতুবা ছবির আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এই নামকরণের সময় তীর চিহ্ন দিয়া এমনভাবে আড়াআড়িভাবে নামগুলি লিখিতে হয় যাহাতে গোটা ছবিটাকে বেশ সুন্দর দেখায়। যখন পাঠদানকালে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছবি আঁকা সম্ভব হয় না তখন পাঠের পূর্বেই শিক্ষক ছবি আঁকিয়া রাখিতে পারেন। পাঠদানকালে সেই ছবির দুই একটি অসম্পূর্ণ বিশেষ অংশ আঁকিতে পারেন। তবে শ্রেণীতে ধীরে ধীরে ছবিটি গড়িয়া উঠিলে ভাল। কারণ ছাত্র ছাত্রী পরে নিজেরা আঁকিতে পারে।

(৬) বোর্ডের কাজ নকল এবং পরিদর্শন

প্রতি ছাত্র ছাত্রীকে বোর্ডের কাজ নিজ নিজ খাতায় তুলিয়া লইতে হয়। চিত্র বা সারাংশ খাতায় লিখিলে শিক্ষার্থীর মনে সেগুলি দৃঢ়ভাবে রক্ষিত হয়। পরে দরকারমত তাহারা এগুলি দেখিতে পারে। কিন্তু খাতায় লিখিবার কালে তাহারা ভুল তুলিতে পারে। তাই পাঠদানকালে মাঝে মাঝে শ্রেণী কক্ষে ঘোরা এবং প্রয়োজনমতে ভ্রম সংশোধন করা শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য।

পরীক্ষাগার পদ্ধতি (The Laboratory Method)

বিজ্ঞান শিক্ষায় পরীক্ষা যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। কেবল পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে শিক্ষক প্রদর্শিত পরীক্ষা তাহার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়ভারে জর্জরিত পাঠ পরীক্ষার মাধ্যমে জীবন্ত হইয়া উঠে। কিন্তু শিশু যদি নিজে ঐ পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন করিতে পারিত, তাহা হইলে সে আরও ঔৎসুক্যের সংগে বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিতে পারিত। পরীক্ষাগার পদ্ধতি শিশুকে নিজ হাতে কলমে

কাজ করার স্বাধীনতা দিয়াছে। "কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা"—এই নীতির পরিপূর্ণ সুযোগ মিলিয়াছে এই পদ্ধতিতে। শিশুর নিজ হাতে কাজ করিবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। শুধু দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা নয়—নিজ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সে হাতে কলমে 'শিক্ষালাভ করিতে সুযোগ পায় এই পদ্ধতিতে। নীতি এবং কর্মের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়া এই পদ্ধতি বিজ্ঞান শিক্ষা জগতে সর্বোচ্চ আসন দখল করিয়া বসিয়াছে।

বিজ্ঞান পাঠ্যসূচীর সমগ্র অংশকে কয়েকটি যথোপযুক্ত ও সম্পর্কযুক্ত অংশে বিভক্ত করা হয়। সপ্তাহ বা পক্ষকালের মধ্যে উহাদিগকে বণ্টন করা হয়। উক্ত প্রতি অংশে সাধারণতঃ দুইটি বিভাগ থাকে—(১) প্রস্তুতি বিভাগ এবং (২) পরীক্ষাগার বিভাগ।

প্রথম পর্য্যায়ে শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীকে কিছু পাঠ্যপুস্তক পড়িতে হয়। এ ছাড়া তাহাকে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পুস্তক বা পত্রিকা অধ্যয়ন করিতে হয়। শিক্ষক ইহাতে তাহাকে প্রয়োজনমত সাহায্য করেন। বিষয়বস্তু ঠিকমত অধীত হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করেন। ছাত্রগণ বিভিন্ন বই বা পত্রিকা পাঠ করিয়া তাহাদের খাতায় উত্তরগুলি প্রদান করে। হাতে কলমে পরীক্ষা করিবার পূর্বে দেখিয়া লওয়া হয় যে শিক্ষার্থী নীতি ছাড়াও পরীক্ষা করিবার কৌশল নীতিগতভাবে শিক্ষা করিয়াছে কিনা। শিক্ষক উক্ত উত্তরের ভুল ত্রুটী সংশোধন করেন এবং শিক্ষার্থীর প্রথম পর্যায়ের জ্ঞান সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ করিবার অনুমতি প্রদান করেন।

পরীক্ষাগার পদ্ধতিতে শিক্ষকের প্রস্তুতিরও বিশেষ প্রয়োজন। পাঠ্যবিষয়ে যদি পরীক্ষা বেশী থাকে তবে মাসে বারটি পিরিয়ডের চারটি প্রদর্শনী পদ্ধতিতে এবং বাকী আটটি পরীক্ষাগার পদ্ধতিতে পাঠদান করা যাইতে পারে। নতুবা শতকরা পঞ্চাশ হারে পাঠদান হইতে পারে। পূর্ব হইতেই শিক্ষক নিজে কতগুলি পরীক্ষা করিবেন বা শিক্ষার্থী কতগুলি পরীক্ষা করিবে তাহার পরিকল্পনা করিয়া রাখিবেন। পরীক্ষাগার পদ্ধতিকে কার্যকরী করিতে হইলে শিক্ষক প্রথমে ঘটনা ও নীতির উল্লেখ করিবেন। দুই একটি পরীক্ষা করিয়া দিবেন।

পরীক্ষাগার পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজ কর্মক্ষমতা অনুযায়ী পরীক্ষায় অগ্রসর হয়। তাহাদের বিভিন্ন গতির হার ব্যক্তিগত লেখচিত্রে প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া গোটা শ্রেণীর কাজকেও একটি লেখচিত্রে প্রকাশ করা হয়। ব্যক্তিগত লেখচিত্র দেখিয়া শিক্ষক পেছিয়ে-পড়া-শিক্ষার্থীকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিয়া তাহার আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিবেন এবং মেধাবী শিক্ষার্থীকে নূতন জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করিতে ও মৌলিক চিন্তার যথাযথ উৎকর্ষ-সাধন করিতে সাহায্য করিবেন।

পরীক্ষাগার পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

(ক) পরীক্ষা বিজ্ঞান পাঠের এক অপরিহার্য অংগ। কিন্তু একই পরীক্ষা বারবার অভ্যাসে সময়ের কিছু অপচয় ঘটায়। সুতরাং শিক্ষার্থী যাহাতে একই পরীক্ষা বারবার না করিয়া ঐ ধরনের অন্য পরীক্ষাও করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিশ্লেষণের জন্য একই কাণ্ডকে বারবার অণুবীক্ষণের সম্মুখে না আনিয়া, ঐ জাতীয় অন্য কাণ্ডকে আনা যাইতে পারে। একদল-বীজের কাণ্ড ও দ্বি-দল বীজের কাণ্ডের তফাৎও বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। বিভিন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্ন কাণ্ড লইয়া পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্তে আসিতে পারে। ইহাতে এক শিক্ষার্থী বিভিন্ন শিক্ষার্থীর জ্ঞান সহজে কাজে লাগাইতে পারিবে।

(খ) পরীক্ষার পূর্বে শিক্ষার্থীদের নিশ্চিত জানা উচিত তাহারা কি পরীক্ষা বা প্রমাণ করিতে যাইতেছে। পরীক্ষা খুব জটিল হইলে শিক্ষার্থী নিরুৎসাহ এবং সেইজন্য অমনোযোগী হইবে।

(গ) পরীক্ষার উদ্দেশ্য পূর্বে বর্ণিত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীকে অনেক জ্ঞাত ঘটনার পরীক্ষা করিতে হইতে পারে। সেখানে যেন উদ্দেশ্য থাকে যে জ্ঞাত বস্তুকে যাচাই করা হইতেছে। "বাতাসে যে অক্সিজেন আছে তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে"—এইরূপে না বলিয়া, বলা উচিত—"বাতাসে যে অক্সিজেন আছে তাহা যাচাই করিতে হইবে।" কারণ শিক্ষার্থী পূর্ব হইতেই

জানে যে বাতাসে অক্সিজেন আছে। সুতরাং পরীক্ষা করিবার পূর্বে বিশেষ উদ্দেশ্যটি ঠিক করিতে হয়।

(ঘ) পরীক্ষার সময় ছাত্র ছাত্রী যে হিসাব রাখিতেছে বা যে যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সেই হিসাব পাইতেছে তাহা পরীক্ষা করা বা ভুল ত্রুটি প্রদর্শন করা একান্ত প্রয়োজন।

(ঙ) শিক্ষার্থী যখন সর্বপ্রথম কোন যন্ত্র ব্যবহার করিবে শিক্ষক তাহার বিবরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে পূর্বে ভালভাবে বুঝাইয়া দিবেন। শিক্ষার্থী যে সকল সাংখ্যমান খাতায় লিখিবে শিক্ষকের উচিত সেগুলিকে মাঝে মাঝে যাচাই করা।

(চ) শিক্ষক কত মাত্রা হিসাবের ভুল ক্ষমা করিবেন তাহা পূর্বে আলোচনা করা দরকার। যন্ত্রপাতির দোষে বা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত শারীরিক কারণে এই ভুল হইতে পারে। তাহার জন্য পুনঃ পুনঃ একই পরীক্ষা করিয়া শিক্ষার্থী যাহাতে সময়ের অপচয় না করে তাহার জন্য শিক্ষক পূর্ব হইতেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। কোন লেন্সের f বাহির করিতে হইবে। ইহার জন্য দুইটি হিসাব (v এবং u) দরকার। এখন v-এর মাত্রা 18·3 cms. বা 18·35 cms. হইতে পারে। এই ভুলের মাত্রা হয়ত শিক্ষক ছাড়িতে পারেন। কারণ ভুলের পরিমাপ ·05-এর বেশী নয়। কিন্তু কেহ যদি 2·05 ভুল করে তবে শিক্ষক নিশ্চয়ই পরীক্ষাটিকে অগ্রাহ্য করিবেন এবং শিক্ষার্থীকে পুনরায় পরীক্ষাটি করিতে বলিবেন। প্রতি যন্ত্রে ভুলের মাত্রা কতটা আছে শিক্ষক পূর্বে ব্যবহার করিয়া তাহা ঠিক করিয়া রাখিবেন।

পরীক্ষাগার পদ্ধতিতে পাঠদানে উপকারিতা :—

(ক) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী পরীক্ষায় অগ্রসর হয়। বাহিরের চাপে তাহাকে তাড়াহুড়া করিতে হয় না—যদিও নির্দিষ্ট পরীক্ষাগুলি কতদিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে তাহা পূর্বেই জানাইয়া দেওয়া হয়। আবার বুদ্ধিমান শিক্ষার্থীর গতি অন্য শিক্ষার্থী কর্তৃক রুদ্ধ হয় না। এই পদ্ধতিতে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ আছে।

(খ) শিক্ষার্থী পুস্তকে অনেক কিছু পড়ে ; কিন্তু অনেক সময় তাহা মনকে নাড়া দিতে পারে না। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী অধীত জ্ঞানগুলিকে হাতে কলমে যাচাই করিয়া লয়।

(গ) এই পদ্ধতিতে শিক্ষক সহানুভূতিশীল বন্ধু। তিনি নিষ্ক্রিয় নন। পরীক্ষার সময় শিক্ষক শ্রেণী পরিদর্শন করিবেন এবং প্রয়োজনমত সাহায্য করিবেন। এইরূপে শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পায় এবং ক্রমান্বয়ে আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে।

(ঘ) পুস্তকে লিখিত বিষয় ছাড়াও শিক্ষার্থী অন্যান্য পরীক্ষা করিয়া নিজের ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে পারে।

(ঙ) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর উন্নতিমূলক লেখচিত্র (Progress Chart) রক্ষিত হয়। শিক্ষক এই লেখচিত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা জ্ঞাত হইতে পারেন। অল্পধীকে উৎসাহ দিয়া এবং তীক্ষ্ণধীকে নূতন কর্মে নিযুক্ত করিয়া শিক্ষক সমগ্র শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখেন।

(চ) শিক্ষার্থীর জ্ঞান কোন বিশেষ পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাহাকে বিভিন্ন বই, মাসিক পত্রিকা, মূল্যবান ম্যাগাজিন প্রভৃতির তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়। তাহাতে তাহার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়।

(ছ) শিক্ষার্থীকে নিজ হাতে কাজ করিতে হয়। তাহার ফলে সে শ্রমের উপর শ্রদ্ধাবান হয়। শ্রেণীনির্বিশেষে এই পদ্ধতি হুজুর ও মজুরের মধ্যে গুণগত পার্থক্যের অবসান ঘটাইতে সাহায্য করে। শুধু তাহাই নহে শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। শব্দের বিভিন্ন পরীক্ষা, আলোকের পরীক্ষা, তাপের পরীক্ষা প্রভৃতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার দরকার হয়। শিক্ষার্থী সেখানে একে অপরের সহযোগী বন্ধু।

(জ) পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে হইলে হাতের আঙ্গুল বা মাংস-পেশীর কাজ, স্নায়ু ও মাংসপেশীর মধ্যে সহযোগিতা, নির্ভুলতা, বিচারবুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা প্রভৃতি একান্ত দরকার। এই পরীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন

গুণাবলী ধরা পড়ে। সুতরাং পরীক্ষায় নির্ভুলভাবে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন গুণের বিচার করা সম্ভব। ইহা অন্য পদ্ধতিতে সম্ভব নহে।

(ঝ) শিক্ষার্থী ছোট খাট যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে শিখে। ভবিষ্যৎ জীবনে অনেকগুলির সহিত হয়ত তাহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটিবে।

(ঞ) প্রয়োজনই সকল সৃষ্টির উৎস। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষকে নূতন পথ ধরিতে হয়। পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইতে হয় এইরূপ তথ্যগুলিকে সে ভবিষ্যৎ জীবনের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষাগারে এই নূতন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার সম্মুখে প্রায়ই উপস্থিত হয়। শিক্ষার্থী তখন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করে। আমাদের দেশে যেখানে বিদ্যালয়ে এক সেট যন্ত্র ক্রয় করার মত টাকার অসুবিধা, সেখানে এই নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনের প্রয়োজন আছে। জটিল যন্ত্রপাতি অবশ্য ক্রয় করিতে হইবে ; কিন্তু আনুষঙ্গিক ছোট ছোট যন্ত্রপাতি বিদ্যালয়ের জিনিস পত্র দ্বারা তৈরী করিবার প্রেরণা শিক্ষক দিতে পারেন। বিদ্যালয়ে সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পরীক্ষাগার পদ্ধতি সক্ষম। শিক্ষক কোন্ পরীক্ষায় কোন্ কোন্ যন্ত্রপাতি লাগিতে পারে তাহার একটি তালিকা তৈরী করিবেন। তাহাদের মধ্যে যেগুলি শিক্ষার্থী করিবে সেগুলিকে বাদ দিয়া অন্যান্য যন্ত্রপাতি শিক্ষার্থীকে দিবেন। নিজের উদ্ভাবনে সৃষ্ট যন্ত্রপাতি কাজ করিতেছে দেখিলে শিক্ষার্থীর আগ্রহ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে। তৈরী যন্ত্রপাতি যে সব সময় কেনা যন্ত্রের নকল হইবে তাহা নয়। পরিবেশের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া সরল যন্ত্র তৈরী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেইজন্য দেখা যাইতেছে যে পরীক্ষাগার পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়।

পরীক্ষাগার পদ্ধতিতে পাঠদানে অপকারিতা :—

(ক) এমন একটিমাত্র পুস্তক নাই যে শিক্ষার্থী সেই পুস্তকের সাহায্য লইয়া পরীক্ষা করিবে।

(খ) এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের নিকট আশাতিরিক্ত পরিশ্রমের দাবী করা হয়। সে পরিশ্রম করিবার মত সুযোগ বিজ্ঞান শিক্ষকের থাকে না।

(গ) ইহাতে বেশী সময় লাগে। সাধারণ বিজ্ঞানে এত সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। আবার উপরের শ্রেণীতে বিষয়ের চাপে পরীক্ষা করার মত প্রচুর সময় নাও পাওয়া যাইতে পারে।

(ঘ) এই পদ্ধতিতে পরিপক্ক হইতে দীর্ঘ সময় লাগে। অনেক সময় এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অপেক্ষার আগেই বিজ্ঞানের তরুণ শিক্ষকের উৎসাহ নির্বাপিত হয়।

(ঙ) পরীক্ষাগারে প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম, আলাদা ঘর, বই, পত্রিকা প্রভৃতি থাকা দরকার। ইহার অভাবে বর্তমানে আমাদের দেশে এই পদ্ধতি তত কার্যকরী নয়।

(চ) শিক্ষক উত্তমরূপে পরিদর্শন না করিলে স্বল্পধী শিক্ষার্থী অন্যের নিকট হইতে অসাধু উপায়ে ফল সংগ্রহ করিতে পারে।

Assignment Method

বিজ্ঞানের পরীক্ষাবহুল অংশের পাঠদানের সুবিধার জন্য বর্তমানে পরীক্ষাগার পদ্ধতি এবং প্রদর্শনী পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। ইহার নাম Assignment Method. ইহাতে শিক্ষকের প্রদর্শনী এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পরীক্ষাকে একত্রিত করা হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের নীতি শিক্ষা এবং পরীক্ষার কাজ দুইই এক সংগে পাশাপাশি চলে। ইহাতে সমগ্র পাঠ্যসূচীকে কয়েকটি সুবিধামত ও সম্পর্কযুক্ত বিভাগে বিভক্ত করা হয়। এক একটি বিভাগে এক পক্ষ কাল বা এক সপ্তাহ ব্যয় করা হয়। প্রত্যেকটি বিভাগকে Assignment বলে। ইহাতে দুইটি অংশ থাকে—(ক) প্রস্তুতি এবং (খ) পরীক্ষা।

প্রথম অংশে শিক্ষার্থী শিক্ষকের নির্দেশমত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করে। ঠিক মত অধীত হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য শিক্ষক ঐ বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক ছাড়া তৎসংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তকও অধ্যয়ন করিবে। দ্বিতীয় অংশে Assignment-এর জন্য প্রদত্ত নির্দেশ এবং শিক্ষকের সাহায্য অনুসারে তাহারা পরীক্ষাগারে কাজ করে। প্রথম অংশটির কৃতকার্যতার উপর দ্বিতীয়

অংশটি নির্ভর করে। সুতরাং শিক্ষক সতর্কতার সহিত দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ করিবার অনুমতি দিবেন।

শিক্ষকের সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা এই পদ্ধতিতে সফলতা আনয়ন করে। পূর্ণ সময়ের কিছু সময় প্রদর্শনী এবং বাকী বেশী ভাগ সময় ব্যক্তিগত পরীক্ষার জন্য ব্যয় করা উচিত। শিক্ষক প্রদর্শনীর সময় কি কি কাজ করিবেন বা শিক্ষার্থী কি কি করিবে তাহা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা উচিত। সময়ের অসুবিধা থাকিলে শিক্ষক খুব কঠিন কাজ নিজে করিবেন এবং বাকীগুলি শিক্ষার্থীর জন্য রাখিয়া দিতে পারেন।

প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য একটি করিয়া গতি নির্দেশক লেখচিত্র থাকিবে। ঐ লেখচিত্র দেখিয়া শিক্ষক উৎসাহ বা প্রয়োজনমত সাহায্য করিতে পারেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই পদ্ধতির সফলতা সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপর নির্ভর করিতেছে। নীচে পরিকল্পনা সম্বন্ধে কয়েকটি সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে।

(১) সময় এবং পাঠ্যসূচী দেখিয়া Assignment-এর সংখ্যা নির্ধারিত করিতে হইবে।

(২) উত্তম এবং উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের উপর এই পদ্ধতির কার্যকারিতা অনেকখানি নির্ভর করে। পাঠ্যপুস্তক তথ্যপূর্ণ খুব কঠিন বা তথ্যবিহীন খুব সহজ হইলে শিক্ষার্থী লাভবান হইতে পারে না।

(৩) পরীক্ষাসংক্রান্ত তথ্যগুলি সাধারণ পাঠ হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। পরীক্ষার পূর্বে শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও আনুষঙ্গিক অন্যান্য পত্রিকা পড়িবে। কোন্ পরিচ্ছেদে কোথায় সেই অংশ আছে শিক্ষক আগে তাহা ঠিক করিয়া রাখিবেন। নিজে ঐগুলি পড়িয়া শিক্ষক নির্দেশ দিবেন।

(৪) পরীক্ষার পূর্বে শিক্ষক এমন প্রশ্ন করিবেন যেন—

(ক) শিক্ষার্থী অধীত বিষয়ের মধ্যে থাকে।

(খ) না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়া তাহার উত্তর করিতে না পারে।

(গ) উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত হয়।

(ঘ) প্রয়োজনীয় চিত্র আঁকার সুযোগ শিক্ষার্থীর থাকে।

(ঙ) শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতির হিসাব দিতে পারে।

(চ) ভাল প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকে।

এছাড়া পরীক্ষার পর্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় —

(৫) যন্ত্রের বিশদ বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইবে। বারবার শিক্ষার্থীকে স্মরণ করাইতে গিয়া যেন সময়ের অপচয় না ঘটে।

(৬) পরীক্ষায় ভুল ফলের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। কি করিয়া ভুল এড়ান যায়, পরীক্ষার ফল কি করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হয়, কতবার পরীক্ষা করার দরকার তাহা শিক্ষার্থীকে পূর্বেই লিখিত ভাবে জানাইয়া দিতে হইবে।

(৭) কি কি যন্ত্রের প্রয়োজন তাহার উল্লেখ থাকিবে।

(৮) পরীক্ষার পরে শিক্ষার্থী যে চিত্র আঁকিবে তাহার অংশগুলিকে জানাইয়া দিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে শিক্ষক নিজে চিত্র আঁকিবেন।

(৯) পরীক্ষার সময়ে শিক্ষার্থী নিজ নিজ খাতায় নিম্নরূপ ছক পূরণ করিবে ঃ

নং	পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১			
২			
৩			

পরীক্ষাগার পদ্ধতি ও প্রদর্শনী পদ্ধতির প্রায় সকল সুবিধাগুলিই Assignment পদ্ধতিতে বিদ্যমান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই পদ্ধতিতে অনেক অসুবিধা আছে। নীচে তাহা আলোচিত হইতেছে।

(১) কোন একটি পাঠ্যপুস্তক এই পদ্ধতির পক্ষে সুবিধাজনক নয়।

(২) এই পদ্ধতির সফলতা নির্ভর করে পরিকল্পিত Assignment-এর উপর। কাজের চাপে পিষ্ট শিক্ষকের হাতে সময় থাকে না বা উৎসাহ থাকেনা এই পরিকল্পনা করার বা তাহাকে সার্থক রূপ দেওয়ার।

(৩) ইহা সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি।

(৪) বেশ কয়েক বৎসর এই পদ্ধতিতে শিক্ষা না দিলে সুফল পাওয়া যায় না। তরুণ শিক্ষকের উৎসাহ এক বা দুই বৎসরের মধ্যে ঝিমাইয়া পড়ে।

(৫) সুসজ্জিত পাঠাগার ও পরীক্ষাগারের প্রয়োজন। আমাদের মত গরীব দেশে এই পদ্ধতি চালু করার অন্তরায় অনেক।

(৬) ভাল শিক্ষার্থীর খাতা হইতে প্রশ্নের উত্তর টুকিবার সম্ভাবনা বিদ্যমান।

(৭) শিক্ষককে অস্বাভাবিক পরিশ্রম করিতে হয়।

Assignment পদ্ধতিতে অসুবিধা আছে সত্য ; কিন্তু চেষ্টা থাকিলে সেই অসুবিধা কিছু অংশে দূর করা যায়। এই পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে প্রয়োগ করা হইয়াছে। বিভিন্ন দেশ হইতে ইহাকে কার্যকারী করার জন্য যে সুপারিশ আসিয়াছে নীচে তাহা আলোচিত হইতেছে।

(১) কোন শ্রেণীতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করার পূর্বে বৎসরের প্রথমে গোটা এক বৎসরের জন্য পরিকল্পনা করা উচিত।

(২) **ডাঃ হোয়াইটহাউস** রচিত "Assignment in Practical Elementary Science" বইটির সাহায্য লইয়া শিক্ষক Assignment তৈরী করিতে পারেন।

(৩) প্রদর্শনী পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা কঠিন অংশগুলিকে শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া, অল্পসংখ্যক ও সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া এবং সন্দেহ হইলে মাঝে মাঝে মৌখিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নকলের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে।

(৪) পূর্বেই শিক্ষককে দেখিয়া লইতে হইবে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তক, নোটবুক এবং পত্রিকা যেন ঠিক থাকে।

(৫) প্রথমে প্রস্তুতি পর্ব শেষ না হইলে এবং শিক্ষককে প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে কোন শিক্ষার্থীকে দ্বিতীয় পর্বে অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নয়।

(৬) একটি পরীক্ষা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন না হইলে শিক্ষক দ্বিতীয়টি করিতে আদেশ দিবেন না।

(৭) পরীক্ষা চলিতে থাকা কালে শিক্ষক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিবেন এবং প্রয়োজনমত ব্যক্তিগত সাহায্য করিবেন। প্রথম দিকে বেশী সাহায্যের প্রয়োজন হইলেও পরে সাহায্যের পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইবে।

(৮) পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থী নোটবুকে সুস্পষ্টভাবে লিখিবে। পরীক্ষাশেষে ঐখানেই শিক্ষার্থী চিত্র অংকিত করিবে। পরীক্ষাগারের কাজ শেষ হইলে শিক্ষক খাতায় স্বাক্ষর দিবেন।

আবিষ্কার পদ্ধতি (Heuristic Method)

'হিউরিস্‌টিক্' কথাটি গ্রীক শব্দ হইতে আসিয়াছে—ইহার অর্থ "আবিষ্কার"। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে আবিষ্কারকের ভূমিকায় স্থাপন করে। বিজ্ঞানের বিষয়গুলি বক্তৃতার বিষয় নয়—ইহা একটি বাস্তব বিষয়—হাতে কলমে পরীক্ষাগারে কাজ না করিলে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় না। **অধ্যাপক এইচ্, ই, আর্মষ্টং** প্রভৃতি প্রখ্যাত মনীষী এই পদ্ধতির বিশেষ উদ্যোক্তা। তিনি কোন পরীক্ষা দেখা অপেক্ষা করাকে প্রথম স্থান দিতেন। বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য—আবিষ্কার এবং মৌলিক তথ্য অন্বেষণ। সীমিত সর্তের মধ্যে শিক্ষার্থী পরীক্ষা নিরীক্ষা করিবে এবং আরোহী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে পৌছিবে। তাই শিক্ষার্থী নিজের আগ্রহে অনুসন্ধিৎসু মন লইয়া তথ্যানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিবে এবং নিজেই বৈজ্ঞানিক নীতি আবিষ্কার করিবে।

পূর্বে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর সহিত সাধারণ আলোচনা করিবেন। সাধারণ নীতিগুলি শিক্ষার্থীরা মনে রাখিবে বা দরকার হইলে লিখিয়া লইতে পারে। পরে শিক্ষার্থীকে নিজে পরীক্ষায় নিযুক্ত হইতে হয়। সাধারণ নীতিগুলিকে অবলম্বন

করিয়া এবং নিজের মৌলিক অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষার্থী কাজে অগ্রসর হয়। একান্ত অসুবিধা হইলে শিক্ষকের উপদেশ গ্রহণ করে। শিক্ষক স্মিতহাস্যে একটু ইঙ্গিত বা আভাস দিবেন। ঐ একটু ইঙ্গিতে বিস্ময়কর ফল পাওয়া যায়। উপযুক্ত সময়ে সাহায্য সময় ও শক্তির অপচয়ের হাত হইতে শিক্ষার্থীকে রক্ষা করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে বেশী সাহায্য এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে কম সাহায্য করার দরকার হয়।

শিক্ষার্থী পরীক্ষা করিবে এবং পরীক্ষার ফলগুলি খাতায় লিখিবে। আরোহী পদ্ধতিতে তাহারা সিদ্ধান্ত এবং তাহার অন্যান্য অনুসিদ্ধান্তগুলিও খাতায় লিখিয়া রাখিবে। ইহাতে তাহাদের কৌতুহল নিবৃত্ত হইবে—পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, পরীক্ষা করার ক্ষমতা, যুক্তিযুক্ত চিন্তার ক্ষমতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইবে।

আবিষ্কার পদ্ধতিতে সুবিধা :—

(১) শিক্ষার্থী নিজে সমস্যাটিকে সমাধানের জন্য চিন্তা করে। তাহারা নীরব শ্রোতার ভূমিকায় থাকে না।

(২) এই পন্থা অবলম্বন করিয়া শিক্ষার্থী বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে। বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী অনেক সময় ব্যাপারটি মোটেই বুঝিতে পারে না। যাহা দেখান হইল তাহা কেবল দেখিল—বুঝিতে বা গঠনপ্রণালী সম্পর্কে কিছুই জানিল না। কিন্তু আবিষ্কারকের ভূমিকায় কেবলমাত্র ব্যাপারটি সে অধিগত করে তাহাই নহে—নিজে পুনরায় তৈয়ারী করিতে পারে।

(৩) অন্য পদ্ধতি অপেক্ষা এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকতর উৎসাহ, উদ্দীপনা দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার প্রতি প্রীতি জন্মায়।

(৪) শিক্ষক ও প্রতি শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত সংযোগ ঘটে ; শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ঘুচিয়া যায়।

(৫) বাড়ীর কাজ খুব কঠিন, নীরস বা শক্ত বোঝাস্বরূপ ঠেকে না। সাধারণতঃ বাড়ীর জন্য বিশেষ কিছু পড়িয়া থাকে না।

(৬) শিক্ষককে সর্বদা তৎপর থাকিতে হয়। তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সৌহার্দ, প্রীতি, সহানুভূতি শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানের পথে যথেষ্ট সাহায্য করে।

(৭) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তাশক্তির স্ফুরণ ঘটে।

(৮) সমস্যার প্রতিটি অংশ শিক্ষার্থী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। ইহাতে অন্যমনস্কতা অর্ধঅন্যমনস্কতা প্রভৃতি তিরোহিত হয়।

(৯) শিক্ষার্থীকে নিজে চিন্তা করিয়া সমস্যা সমাধান করিতে হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতা দেখা দেয়। ছোট ছোট দলে আলোচনার ফলে শ্রেণীর মধ্যে গণতন্ত্রবোধ জাগরিত হয়।

(১০) এই পদ্ধতি পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যাবলীর সুযোগ দেয়।

আবিষ্কার পদ্ধতিতে অসুবিধা ঃ—

(১) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে আবিষ্কারকের ভূমিকা লইতে হয়; ফলে প্রচুর সময় ব্যয় হয়।

(২) নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যসূচি শেষ করা কঠিন হইয়া পড়ে। আবার অল্প সময়ে শিক্ষার্থী কিছুই শিখিতে পারে না (যদিও শিক্ষার্থীর এই চিন্তাশক্তির স্ফুরণে প্রথমে বেশী সময় লাগে, তবে পরে সে পদ্ধতি তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করিতে পারে)।

(৩) সব সময় শিক্ষার্থীর পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব হয় না। সকলকে নিউটন, আইনষ্টাইন বা জগদীশ ভাবিলে অন্যায় হইবে। আবার অল্প বয়সে তাহাদের মন বা চিন্তা শক্তির ক্ষমতা সুদৃঢ় নহে। ফলে এই পদ্ধতিতে ছোট ছোট শিক্ষার্থীর মানসিক উত্তেজনা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু লাভ হয় না।

(৪) খুব মেধাবী শিক্ষার্থী এই পদ্ধতিতে উপকৃত হয়। অন্যদিকে স্বল্পধী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিক্ষকের বিক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং ছোট ছোট দল করিয়া তাহাদের মধ্যে আলোচনা দ্বারা সকল প্রকার শিক্ষার্থী লাভবান হইতে পারে।

(৫) এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইলে পূর্ব হইতে পাঠ্যক্রমও সেই অনুযায়ী সজ্জিত করা উচিত।

(৬) পূর্বে বিষয়বস্তু ও নীতি জ্ঞান ভাল করিয়া না হইলে শিক্ষর্থীর পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভবপর নয়।

(৭) বেশী পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যাবলী বাঞ্ছনীয় নয়। তাহাতে সাধারণ পাঠ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৮) এই পদ্ধতিতে বিশেষ দক্ষ শিক্ষক ব্যতিরেকে আসল উদ্দেশ্য ব্যহত হইবে। 'নিজের মাথা খাটাও' বা 'নিজে চেষ্টা কর' বলিয়া শিক্ষক দায়িত্ব এড়াইবেন না। সহানুভূতির সহিত তিনি ব্যক্তিগত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সর্বদা উন্মুখ থাকিবেন।

(৯) বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে। নতুবা অনেক সময় উল্টা ফল দেখা যাইতে পারে।

স্বল্প শিক্ষার্থী এবং দক্ষ শিক্ষক এই পদ্ধতিতে সফলতা দানে সক্ষম; কিন্তু আমাদের দেশে এই দুইয়েরই অভাব। চরম পর্যায়ে হিউরিস্‌টিক্ সুফল দান করে না। দক্ষ শিক্ষকের সাহায্য ও পরিচালনায় ইহা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। আবিষ্কার পদ্ধতিতে আবিষ্কার না হউক আবিষ্কারের দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা সম্ভবপর ও প্রশংসনীয়। **এফ্, ডব্লিউ, ওয়েষ্টওয়ে** বলেন যে আবিষ্কার পদ্ধতি কোন বিশেষ পদ্ধতি নয়—ইহা পদ্ধতিকে সংশুদ্ধ করে। জ্ঞান এখানে গৌণ ব্যাপার। ঠিকমত পরিচালিত হইলে এই প্রক্রিয়া কাজ করার শক্তি বৃদ্ধি করে—যথাযথ পর্যবেক্ষণের অভ্যাস প্রদান করে—এবং স্বাধীন ও বুদ্ধিপূর্ণ বিচার ক্ষমতার অধিকারী করে। ইহা পরীক্ষিত ঘটনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। নিজ হস্তে প্রাপ্ত পরীক্ষিত ফল হইতে যে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় তাহা জ্ঞাত হইয়া শিক্ষার্থী পরম সন্তোষ লাভ করে।

কার্য-সমস্যা পদ্ধতি (The Project Method)

কার্য-সমস্যা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী সংঘ, সহযোগিতা এবং কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে। এই পদ্ধতিতে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ঘটনাকে সন্নিবেশিত করা হয়। কেন্দ্রীয় বিষয়টির নির্বাচন শিক্ষার্থীর

আগ্রহ বা কোন বৈজ্ঞানিক নীতির উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ তাহাকে সমস্যা সমাধানের পথে আগাইয়া লইয়া যায়। বাইরের চাপ তাহার মনে বিরক্তি উৎপাদন করে না। দ্বিতীয়তঃ একই কাজের ভিতর শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রবণতা এবং দক্ষতা স্বাভাবিক ভাবে কাজ করিতে সুযোগ পায়। তৃতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক অন্যান্য সকলের মত নিজেদের সমস্যাকে সর্বপ্রথমে স্থান দেয়। কার্য-সমস্যা শিক্ষার্থীর মানসিক বিস্তৃতি ঘটাইতে সাহায্য করে। কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক সমস্যা ছাড়াও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শিক্ষার্থী সামাজিক বহুবিধ সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়। শিক্ষার্থীকে কু-অভ্যাস, কুসংস্কার, মানসিক সংকীর্ণতা প্রভৃতি বর্জন করিতে হয়। উদার মন লইয়া তাহাকে কর্মে নিযুক্ত হইতে হয়। তাই কার্য-সমস্যা পদ্ধতি বিজ্ঞানে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে।

কার্য-সমস্যা পদ্ধতির পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ শিক্ষককে অধিকতর দায়িত্বশীল করিয়া তুলিয়াছে। এর জন্য তাঁহাকে সতর্ক থাকিতে এবং বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী হইতে হয়। আধুনিক পুস্তক, উদাহরণ, প্রবন্ধ, রিপোর্ট, প্রদর্শনী প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষাদানের উপকরণ ও তাহাদের প্রাপ্তি-স্থান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান শিক্ষকের থাকিবে। এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকের সংগে তাঁহার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। তবেই বিষয়গুলির মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হইবে।

বিদ্যালয় ছাড়া বিদ্যালয়ের বাহিরেও এই পদ্ধতিকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং নীতির দিক হইতে তাহা করাও উচিত। কোন সংগঠনমূলক কাজ, তথ্য আহরণ প্রভৃতি কাজে একদল শিক্ষার্থী আত্মনিয়োগ করিতে পারে। বিদ্যালয়ে যাদুঘর তৈরী, বিজ্ঞান প্রদর্শনীর জন্য উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয়ে ফুল বা ফলের বাগান তৈরী—এইগুলি সংগঠনের কাজ। আবার শিক্ষার্থীর নিজস্ব পরিবেশের উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জীবন, জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতি, মাটির প্রকার ভেদ ও জীবের উপর তাহার প্রভাব, স্বাস্থ্য-সংস্থার কার্যাবলী, নভোমণ্ডলে তারকার অবস্থিতি, কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের কর্ম পদ্ধতি

প্রভৃতি তথ্য আহরণের কাজ। শিক্ষার্থী এই সকল কাজ দলবদ্ধভাবে করে—শিক্ষক এখানে নেতা ও উপদেষ্টা।

কার্য-সমস্যা পদ্ধতির সাধারণতঃ চারিটি পর্যায় বিদ্যমান। (১) উদ্দেশ্য নিরূপণ করা, (২) পরিকল্পনা করা, (৩) স্বাভাবিক পরিবেশে কার্য সম্পাদন করা এবং সবশেষে (৪) বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা। সমস্যার মধ্য দিয়া এই পদ্ধতির আরম্ভ। কার্য-সমস্যার শেষ ধাপে দলের প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে। এই অভিজ্ঞতাগুলির সারাংশ তৈরী করিয়া সুসজ্জিত করা হয়। শিক্ষক সেই দলের নেতা। তিনি প্রশ্নের মাধ্যমে 'অনুসন্ধান ও আবিষ্কার' হইতে মৌলিক নীতি নিরূপণে দলকে সাহায্য করেন। দলকে প্রাসঙ্গিক পুস্তকের ঠিকানা তিনিই পরিবেশন করেন।

নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার্থীর পক্ষে এই পদ্ধতি সুবিধাজনক। ছোট দল বা শ্রেণীতে বিশেষ কার্যকরীভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে কোন একটি স্থানের ফুল, ফল বা কীট পতঙ্গের খবর—গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে পরিবেশের সংগে জীবের খাপ খাওয়ানোর ইতিহাস—বিভিন্ন মাটির রং, উপাদান ও জীবের উপর তাহার প্রভাব—শিলাস্তরের খবর প্রভৃতি সংগ্রহের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য আহরণ করা সম্ভব। আহরণের পরে রচনা লেখা, সংবাদপত্র হইতে ছবি লইয়া খাতায় আঁটিয়া দেওয়া, চিত্র তৈরী করা, মডেল তৈরী করা, বিদ্যালয় ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ লেখা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক পরিপূরক কাজ করা যাইতে পারে।

সাধারণ বিজ্ঞানেও এই পদ্ধতির স্থান আছে। 'কাজ'—এই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া যন্ত্র বিজ্ঞান, 'তরঙ্গের গতি'—এই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া শব্দ, আলো, বিদ্যুৎ, চুম্বক এবং বেতারকে সুবিন্যস্ত করা সম্ভব। 'জিনিস পোড়াইলে কি হয়'?—ইহাকে কেন্দ্র করিয়া রসায়নের দহন, পদার্থবিদ্যার তাপ ও তাহার সঞ্চালন, উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যার শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতিকে সজ্জিত করা যায়। সাধারণ বিজ্ঞানের এলাকা বিস্তৃত হওয়ার জন্য কার্য-সমস্যা পদ্ধতির বৃহত্তর সুযোগ মিলিয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য উন্নত ধরনের পরিকল্পনা এবং সংগঠনের প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক পাঠ এবং হাতের কাজের মধ্যে এরূপ

সমন্বয় সাধন করিবেন যে শিক্ষার্থী ঘটনাকে যেন শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং পরীক্ষার ফল যেন শীঘ্র নির্ণয় করিতে পারে। নতুবা আগ্রহ স্তিমিত হয় এবং অবসাদ আসিয়া শিক্ষার্থীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এইরূপ অবস্থার সম্মুখে আসিলে শিক্ষকের উচিত দীর্ঘ কার্য-সমস্যাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া লওয়া।

কার্য-সমস্যা পদ্ধতির উপকারিতা

বিভিন্ন কারণে কার্য-সমস্যা পদ্ধতি শিক্ষাদান কার্যে সমাদৃত হইয়াছে। তাহার কয়েকটি আলোচিত হইতেছে ঃ

(১) এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে সহযোগিতাপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করে। শিক্ষকও শিক্ষার্থীর সংগে এই পদ্ধতিতে যোগ দেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

(২) বিষয়বস্তু যথাযথভাবে নির্ধারিত হইলে শিক্ষার্থী আগ্রহের সহিত তাহাতে যোগদান করে। এই পদ্ধতি সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক উপযোগিতার সমন্বয় সাধন করে।

(৩) এই পদ্ধতি প্রাকৃতিক এবং মানুষের হাতে গড়া জিনিসের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। শিক্ষার্থীর আগ্রহ এখানে স্বতঃস্ফূর্ত। উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে সমগ্র মন লইয়া শিক্ষার্থী কাজে নিযুক্ত হয়।

(৪) শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও দক্ষতা বিভিন্ন হইলেও এই পদ্ধতিতে সকলকে একই কাজের বিভিন্ন অংশে নিয়োগ করা যায়।

(৫) বিদ্যালয় ও বহির্জগতের ব্যবধান ঘুচিয়া যায়। বিদ্যালয় জীবন সামাজিক জীবনের সহিত একত্রীভূত হয়।

(৬) এই পদ্ধতি পর্যবেক্ষণে একাগ্রতা ও নির্ভুলতা এবং আবিষ্কারে আনন্দের অধিকারী করিতে সাহায্য করে।

(৭) শিক্ষার্থী নিজে হাতে কলমে কাজের সুযোগ পায়। তাহাতে শ্রেণী পাঠের একঘেয়েমী বিদূরিত হয়।

(৮) শিক্ষার্থী তাহার জ্ঞানকে সুসংহত করিবার সুযোগ পায়।

(৯) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপিত হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক শৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ ঘটে।

(১০) বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীর মনে 'জিদের' সৃষ্টি করে এবং সংগঠন ও সৃষ্টিমূলক চিন্তার দ্বার উদ্ঘাটিত করে।

কার্য-সমস্যা পদ্ধতির অসুবিধা

উপরোক্ত সুবিধাগুলি সত্ত্বেও কার্য-সমস্যা পদ্ধতির কিছু অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমতঃ সমগ্র পাঠ্যসূচীকে (বিশেষ করিয়া উচ্চ শ্রেণীতে) এই পদ্ধতির আওতায় আনা সম্ভবপর নয়। বিজ্ঞান পাঠদানের এক পরিপূরক প্রক্রিয়া হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার্থী ইহাতে বৃহত্তর ও ব্যাপক ক্ষেত্রের আবছা জ্ঞানের অধিকারী হয়; কিন্তু মৌলিক নীতিগুলি সম্বন্ধে ধারণা জন্মে না।

তৃতীয়তঃ এই পদ্ধতিতে পরিকল্পনা ও রূপায়ণে শিক্ষকের অধিক সময় ব্যয়িত হয়। ফলে তাঁহাকে মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের চাপ সহ্য করিতে হয়।

চতুর্থতঃ কার্য-সমস্যা দীর্ঘ হইলে অবসাদ ও বিরক্তি আনয়ন করে।

পঞ্চমতঃ শিক্ষা এক অবিচ্ছেদ্য ও গতিশীল প্রক্রিয়া, কার্য-সমস্যা পদ্ধতিতে বিষয়গুলিকে সুসজ্জিত করিলেও অভিজ্ঞতাগুলি সাধারণতঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ফলে শিক্ষার সাধারণ বর্ধন ব্যাহত হয়।

নীচে কার্য-সমস্যা পদ্ধতির একটি উদাহরণ দেওয়া হইল: বিষয়টি **বহির্ভ্রমণ**। এখানে বহির্ভ্রমণের উপকারিতা, সংগঠন এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

বহির্ভ্রমণের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ কার্যের সুযোগ খুব বেশী। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এই পদ্ধতিতে যোগদান করিতে পারেন। এখানে শিক্ষার্থী সক্রিয় —শিক্ষক বিজ্ঞ উপদেষ্টা ও দক্ষ পথপ্রদর্শক। শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ

উদ্দীপনা শিক্ষার্থীকে ক্রমে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলে। বহির্ভ্রমণের কয়েকটি উপকারিতা এখানে আলোচিত হইতেছে ঃ

(১) যথাযথ পরিবেশে স্বাভাবিক ঘটনা সংগ্রহ করা যায়।

(২) বহির্জগতের সহিত বিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষিত হয়।

(৩) প্রাকৃতিক এবং মানুষের হাতে গড়া জিনিসের উপর আগ্রহ জন্মে।

(৪) কোন বিষয়ে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিতে, বিচক্ষণতার সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে এবং আবিষ্কারে আনন্দের অধিকারী করিতে সাহায্য করে।

(৫) ইহা সমস্যা সমাধানে প্রেরণা জোগায় এবং সংগঠন ও সৃষ্টিমূলক চিন্তায় সাহায্য করে।

(৬) শিক্ষার্থী তাহার জ্ঞানকে সুসংহত করিতে পারে।

(৭) কাজে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়।

(৮) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়।

(৯) কাজের উপর শিক্ষার্থীর আসক্তি আসে ; তাই সে অবসর সময় সুন্দর ভাবে কাটাইতে অভ্যস্ত হয়।

(১০) ইহা শিক্ষার্থীর মনে উচ্চাকাঙ্খা জাগাইতে সাহায্য করে।

(১১) ইহার মাধ্যমে শিক্ষার সামাজীকরণ ঘটে।

উদ্দেশ্য ঃ বহির্ভ্রমণ দ্বারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে আলোচিত হইতেছে।

(ক) কোন পাঠের পূর্বে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ।

(খ) শিক্ষার্থীকে নিজ পরিবেশে বিভিন্ন জিনিস দেখিতে বা জানিতে উৎসাহ প্রদান।

(গ) মাটি, শিলা, পাখী, গাছ, জন্তু, আকাশ প্রভৃতি সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি।

(ঘ) শ্রেণীকক্ষের পরিপুরক জ্ঞানদানে সহায়তা করা।

(ঙ) পূর্বজ্ঞান, শ্রেণীর আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত সমূহের যাচাই।

সংগঠন পদ্ধতি ঃ বহির্ভ্রমণের সংগঠন সহজ কাজ নয়। ইহার জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। এই কৌশলের অভাবে অনেক সময় হাতের কাছে পাওয়া উপকরণ ও তথ্য শিক্ষক সঠিকভাবে কাজে লাগাইতে পারেন না। বহির্ভ্রমণের সংগঠন ও পরিচালনার কৌশল নীচে আলোচিত হইতেছে ঃ

প্রথম ধাপ ঃ সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক সুবিধার মূল্যায়ন নির্ণয় করা।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ কি বা কি কি উদ্দেশ্যে এই বহির্ভ্রমণ সংঘটিত হইতে যাইতেছে।

তৃতীয় ধাপ ঃ (ক) যে সকল তথ্য নির্ভুল ধারণা সৃষ্টি করিবে তাহাদের বিচার।

(খ) সমর্থনযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গী, দক্ষতা এবং অভ্যাস তৈরীর জন্য শিক্ষার্থীকে কর্মে লিপ্ত করার সুযোগ দান।

চতুর্থ ধাপ ঃ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং গন্তব্যস্থানের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তি ও তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন।

পঞ্চম ধাপ ঃ বহির্ভ্রমণে ঔৎসুক্য জাগরিত করা।

(ক) শ্রেণী বা সমষ্টির সহিত আলোচনার সময় বহির্ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি।

(খ) উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর সঠিক ধারণা সৃষ্টি।

(গ) গন্তব্যস্থান, রাস্তা, স্থানের বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষকের প্রস্তুতি।

(ঘ) নোটবই, পোশাক বা আনুষঙ্গিক বিষয়ে শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি। সমস্যার সম্মুখে অবিচলিত থাকার শক্তি এবং হাসিমুখে তাহা সমাধান করিবার মানসিক দৃঢ়তা শিক্ষার্থীর থাকা উচিত।

ষষ্ঠ ধাপ ঃ পথে নির্দেশদান ও শিক্ষা।

(ক) **চলার পথে**—শিক্ষার্থী সর্বদা সতর্ক থাকিবে, মাঝে মাঝে লিখিবে, দর্শনীয় বস্তুর দিকে মনোযোগ দিবে—শিক্ষক তখন পথপ্রদর্শক।

(খ) **গন্তব্যস্থলে**—নির্দিষ্ট পাঠদান, শিক্ষার্থী উৎসাহের সহিত নিত্য কর্ম করে ও পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণকে সুসংবদ্ধ করেন।

(গ) **প্রত্যাবর্তনে**—শিক্ষার্থীগণের নিজেদের মধ্যে ধারণার আদান প্রদান, নিজ নিজ অভিজ্ঞতার বিবৃতিদান, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা প্রভৃতি।

(ঘ) **ভ্রমণোত্তর কার্যাবলী**—শিক্ষার্থীর নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ, ঐগুলির আলোচনা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রশ্নের আদান প্রদান, সংবাদের মূল্যায়ন এবং সমগ্র কার্যাবলীর সংযুক্তীকরণ।

সপ্তম ধাপ ঃ ভ্রমণের প্রশস্তি

(ক) শিক্ষাগত মূল্য।

(১) জ্ঞানের বিস্তৃতি।

(২) নূতন কর্মে অনুপ্রাণিতকরণ।

(৩) সামাজীকরণ।

(খ) শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গী, অভ্যাস এবং দক্ষতার উপর গঠনমূলক প্রভাবের বিস্তৃতি।

এই ধরনের কার্য-সমস্যা পদ্ধতিতে লক্ষ্য রাখা দরকার যে (১) কোন একটি সমস্যায় যেন বেশী সময় ব্যয়িত না হয়, (২) কাজটি যেন সময়ের অনুপাতে নির্দিষ্ট থাকে, (৩) শিক্ষার্থী যেন সর্বক্ষণ সক্রিয় থাকে এবং (৪) সমস্যাটি যেন অহেতুক জটিল না হয়।

একক পদ্ধতি (The Unit Plan)

বিজ্ঞান শিক্ষাকে কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্য লইতে হয়। কোন পদ্ধতি এককভাবে সব বিষয়ে জ্ঞান দানের ক্ষমতা রাখে না। আধুনিক

কালে বিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত হওয়ায় বিভিন্ন পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া যে পদ্ধতিগুলি বিজ্ঞান শিক্ষাদানে বিশেষ সাহায্যকারী তাহাদের মধ্যে একক পদ্ধতি অন্যতম।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক Morrison একক পদ্ধতি লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাঁহার পদ্ধতিটি লইয়া সমগ্র আমেরিকায় গবেষণা সুরু হয়। এই পদ্ধতি তৎকালীন শিক্ষাবিদ্‌দের মনে আলোড়ন তোলে। এই পদ্ধতি একদিকে যেমন শিক্ষা-প্রদর্শিকার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ব্যবধান দূর করে—অপরদিকে তেমনি ব্যক্তির অনুসন্ধিৎসার স্বাধীনতা প্রদান করিয়া চরম উৎকর্ষতা প্রদানে সাহায্য করে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানকে কয়েকটি সুপরিকল্পিত, সম্পর্কযুক্ত অভিজ্ঞতা বা কার্যাবলীতে সজ্জিত করা যায়। যেমন পৃথিবীর ভূপ্রকৃতি, পৃথিবী বিশ্বের নগণ্য অংশ, শরীরকে সুস্থ রাখার উপায়, বিশুদ্ধ জল পাওয়ার উপায় প্রভৃতি। ছাত্রগণ ঐ শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবনক্ষেত্রকে বশে আনিতে বা নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাইতে শিক্ষা করিবে। মনে রাখিতে হইবে যে ঐ একক-গুলির সমন্বয়ে বিজ্ঞানের এক অখণ্ড জ্ঞান তৈরী হইবে। অভিজ্ঞতার ফলগুলি শিক্ষার্থীর দক্ষতা, ঝোঁক, অভ্যাস, জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া ভবিষ্যতে সুস্থ নাগরিক হওয়ার অধিকারী করিয়া তুলিবে।

এককগুলির প্রয়োগ পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীর জ্ঞানের মাত্রার জন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই পার্থক্যের বিস্তৃতি ও গভীরতা থাকিবে। শিশু বয়সে এই এককগুলির বিস্তার বেশী হইবে ; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এককগুলির গভীরতা বৃদ্ধি পাইবে। যেমন—নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে "জীবন ধারণের জন্য বায়ু অত্যাবশ্যকীয়"—এককটি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে "অক্সিজেন ও তাহার যৌগিক পদার্থ"—এককে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে।

একক-পদ্ধতি শিক্ষানীতির মূল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এককগুলির মধ্যে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় এই পদ্ধতি একদিকে যেমন Gestalt-বাদীগণকে

সমর্থন জানায়—অপরদিকে শিক্ষার্থীর ঔৎসুক্য জাগাইয়া ও নূতন প্রেরণায় উজ্জীবিত করিয়া পাঠে মনোযোগ আকৃষ্ট করে বলিয়া Thorndike-এর "প্রস্তুতির" সূত্রটিকে স্বীকার করে। এই ধাপের পরে আসে পাঠ গ্রহণের পর্যায়। এই সময়ই শিশু শিক্ষা-প্রদর্শিকার সাহায্যে পাঠে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। শ্রেণীর মধ্যে থাকিয়াও শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত প্রবণতা এবং ক্ষমতা অনুসারে কাজ করে। ইহাতে কর্মে অভ্যাস, দক্ষতা এবং আগ্রহের সঞ্চার হয় এবং ইহা দ্বিতীয় শিক্ষানীতিকে অনুমোদন করে। শিক্ষার্থী যতক্ষণ না বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেছে, ততক্ষণ বারবার অভ্যাস করিয়া উক্ত বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিবে। শিক্ষার্থীর আপেক্ষিক ব্যুৎপত্তিতে শিক্ষার তৃতীয় নীতি (effect) ধরা পড়ে। শিক্ষায় বা দক্ষতায় কিছুটা সাফল্য অর্জিত না হইলে শিক্ষার্থী সন্তুষ্ট হয় না। একক নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীর সাফল্যের সীমার দিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন।

একক-পদ্ধতিতে সুবিধা

(ক) এই পদ্ধতি ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

(খ) শিক্ষকের কাজের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ অধিকতর কাজে নিযুক্ত হয়।

(গ) অধিকতর মেধাবী ছাত্রদের কঠিনতর কাজে প্রেরণা জোগায়।

(ঙ) এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর বেশী শক্তি প্রয়োগের দাবী রাখে।

(ঘ) শিক্ষার্থী নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে পারদর্শিতা লাভ করে।

(চ) একই পদ্ধতির ভিতর বিভিন্ন শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার সুযোগ মিলে—যেমন বিস্তৃত অধ্যয়ন, সমস্যা সমাধান, ব্যক্তিগত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ, মৌখিক ও লিখিত বিবরণ প্রদান প্রভৃতি।

(ছ) পুনরাবৃত্তির জন্য পেছিয়ে-পড়া-শিক্ষার্থী নিজেকে তৈরী করিয়া লওয়ার সুযোগ পায়।

এতগুলি সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই পদ্ধতি একেবারে দোষমুক্ত-নয়। নীচে তাহা আলোচিত হইতেছে।

প্রথমতঃ বারবার শিক্ষা-প্রদর্শিকা (Study Guide) ব্যবহার করার ফলে শিক্ষা গতানুগতিক, একঘেয়ে এবং নূতনত্ববর্জিত হয়। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষককে প্রচুর লিখিত উত্তর পত্র পরীক্ষা করিতে হয় এবং ফলে এই খাটুনী তাঁহাকে ক্রমে নিরুৎসাহী করিয়া তোলে।

তবে একথা সত্য যে নীতির দিক দিয়া এই পদ্ধতি অদ্বিতীয়। বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ধারণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা থাকিলেও ঘটনাবহুল জ্ঞানদানে এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী।

একক-পদ্ধতির সংগঠন

বিজ্ঞানে একক পদ্ধতির সংগঠনের প্রথম ধাপ হইল—বিষয় নির্বাচন। বিষয়টি হইবে স্বয়ংসম্পূর্ণ—বিস্তৃত অথচ সংক্ষিপ্ত। বিষয়টি শিক্ষার্থীর বয়সের উপযোগী হওয়া একান্ত দরকার। সাধারণতঃ নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীতে দুই সপ্তাহ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে তিন বা চার সপ্তাহের বেশী সময় কোন এককের জন্য নির্ধারিত করা উচিত নয়। এককটিকে একটি বাক্যে প্রকাশ করা ভাল। যেমন—"মানুষের শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত," "গাছ জন্মায়.", "যন্ত্র মানুষের পক্ষে অপরিহার্য", "পৃথিবী বিশ্বের এক ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ" ইত্যাদি। কখনও কখনও একটির পরিবর্তে দুই বা ততোধিক বাক্যে এককটিকে প্রকাশ করা হয়। যেমন—"মানুষের দেহ যন্ত্র বিশেষ। তাহাকে কর্মক্ষম ও পুষ্ট রাখা একান্ত দরকার। দীর্ঘ দিন বাঁচিয়া থাকার জন্য মানুষকে শক্তি সংরক্ষণ করিতে হয়।"

একক-সংগঠনের দ্বিতীয় ধাপ হইল—প্রতি এককের উদ্দেশ্য নির্ণয় করা। ত্রিবিধ পর্যায়ে এই উদ্দেশ্যকে সজ্জিত করা হয়—(ক) উদ্দেশ্য (Aims), (খ) সাধারণ উদ্দেশ্য (General objectives), এবং (গ) বিশেষ উদ্দেশ্য (Special objectives).

উদ্দেশ্য নির্ণয়ের সময় লক্ষ্য রাখা দরকার যে সে উদ্দেশ্য যেন শিক্ষার্থীর জ্ঞানের সীমার পক্ষে প্রযোজ্য হয় এবং উদ্দেশ্যগুলি যেন উক্ত বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র

করিয়া গঠিত হয়। যেমন—'আকাশ' সম্বন্ধে যে এককটি পূর্বে লওয়া হইয়াছে তাহাতে—(ক) অবসর সময়কে সার্থকভাবে ব্যয় করা, (খ) বৃত্তির জন্য ক্ষমতা অর্জন, (গ) নৈতিক চরিত্র গঠন প্রভৃতি উদ্দেশ্য থাকিবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে উক্ত উদ্দেশ্যগুলিকে সম্পূর্ণ রূপ দিবার জন্য তাহাদিগকে বাক্যে প্রকাশ করা দরকার। সাধারণ উদ্দেশ্যের (General objectives) গণ্ডীর মধ্যে শিক্ষার্থীর সাধারণ জ্ঞান, ঝোঁক, দক্ষতা, অভ্যাস প্রভৃতিকে স্থাপন করা যায়। কারণ প্রত্যক্ষভাবে ঐগুলি বিশেষ বিষয়ের অভিজ্ঞতা হইতে লাভ করা যায় না। যেমন—"আকাশ" সম্বন্ধে এককের মাধ্যমে—(ক) বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, (খ) সঠিক পঠনের অভ্যাস আয়ত্ত ও আবিষ্কার করা যায়, (গ) অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরদানের ক্ষমতা বাড়ে, (ঘ) নক্ষত্র, গ্রহ, জ্যোতিষ্কপুঞ্জ প্রভৃতির সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ে, (ঙ) বিভিন্ন চিত্র অনুশীলনে সাহায্য করে, (চ) পরিবেশ সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটে, (ছ) বৈচিত্র্যপূর্ণ, জটিল অথচ সুসজ্জিত বিশাল বিশ্বের রসোপলব্ধি ঘটে। তেমনই "স্বাস্থ্য" সম্বন্ধে এককে এইরূপ সাধারণ উদ্দেশ্য লাভ করা যায়। যেমন—(ক) পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়াম, খাদ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে মৌলিক অভ্যাস গঠনে সাহায্য করে, (খ) পরিপূর্ণ জীবনে কর্মক্ষম সুদৃঢ় স্বাস্থ্য যে অপরিহার্য তাহা অবহিত হওয়া যায়, (গ) আদিভৌতিক উপায়ে রোগ নিবারণের পথ যে ভ্রান্ত তাহার সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করে; (ঘ) শরীর সম্বন্ধে দক্ষ চিকিৎসকের উপর আস্থা জন্মাইতে সাহায্য করে, (ঙ) ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আন্তরিক আগ্রহের সৃষ্টি করে।

ইহার পরের ধাপ হইতেছে—বিশেষ উদ্দেশ্য নির্ণয়। পূর্বের ন্যায় এই ধাপেও শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গী স্থাপন করা যায়। তবে এই ধাপে উক্ত উদ্দেশ্যগুলিকে অপেক্ষাকৃত বেশী প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে পরিমাপ করা যায়। "আকাশ" সম্বন্ধে এককে—(ক) কিরূপে বিশ্ব সংগঠিত হইয়াছে তাহা জ্ঞান লাভ করা যায়, (খ) গ্রহ তারকার প্রকৃতি জানা যায়, (গ) তারার অবস্থান নির্ণয় করা যায়, (ঘ) পৃথিবী কিরূপে গ্রহ, তারকা প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়,

(ঙ) পৃথিবীর অবস্থান নির্ণয় করা যায়, (চ) কিরূপে প্রমাণ কাল (Standard Time) নির্ণয় করা যায়—প্রভৃতি বিশেষ উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। 'স্বাস্থ্য' সম্বন্ধে এককেরও সেইরূপ কয়েকটি উদ্দেশ্য নীচে দেওয়া হইল। যেমন—(ক) কোন্ কোন্ প্রাণী মানুষের উপকারী বা অপকারী, (খ) বিভিন্ন সংক্রামক রোগ হইতে কি করিয়া আত্মরক্ষা করা যায়, (গ) জীবাণুসঞ্জাত রোগ হইতে সাধারণভাবে রক্ষা পাওয়ার উপায়, (ঘ) খাওয়ার অভ্যাস ও পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ, (ঙ) সাধারণ ও বিশেষ খাদ্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ, (চ) শরীরের বিভিন্ন অংশের কার্যাবলী, (ছ) শরীরের বিশেষ অংশের কার্যাবলী, (জ) প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে সাধারণ ও প্রাথমিক জ্ঞান, (ঝ) শরীররক্ষার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন, (ঞ) আবেগ বা মনস্তত্ব ঘটিত কারণে শরীরের উপর তাহাদের প্রতিক্রিয়া।

একক সংগঠনের পরের ধাপ হইল—সমস্যাবহুল প্রশ্ন তৈরী করা। শিক্ষানীতি এবং শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যগুলিকে প্রশ্নরূপে সাজাইলে অধিকতর লাভবান হওয়া যায়। তাহা হইলে উদ্দেশ্য ও শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষিত হইবে। শিক্ষা যাথার্থ হইবে। 'আকাশ' সম্বন্ধে ধাপে প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ হইতে পারে। যথা—(ক) কেমন করিয়া এই বিশ্ব সজ্জিত? (খ) গ্রহ বা তারকার প্রকৃতি কিরূপ? (গ) তারাকে কি প্রকারে চেনা যায়? (ঘ) পৃথিবী গ্রহ এবং তারকার দ্বারা কি ভাবে প্রভাবান্বিত হয়? (ঙ) প্রমাণ কাল কাহাকে বলে?

এ ছাড়া একক সংগঠনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

(১) শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করিবে এমন সব কার্যাবলীর একটি তালিকা তৈরী করিতে হইবে। তাহার মধ্যে—(ক) শিক্ষা-প্রদর্শিকার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া, (খ) চিত্রাঙ্কন করা, (গ) পরীক্ষা করা এবং মন্তব্য তালিকাবদ্ধ করা, (ঘ) শ্রেণীতে আলোচনায় যোগদান করা, (ঙ) শ্রেণীর বাহিরে নিজের জ্ঞানের সীমা বর্ধিত করা প্রভৃতি কাজের তালিকা থাকিবে।

(২) দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক কোন্ কোন্ কাজের ভার লইবেন তাহার একটি তালিকা প্রণয়ন করা উচিত। তাহাতে—(ক) শিক্ষা-প্রদর্শিকা প্রস্তুত ও পরিচালনা করা, (খ) শ্রেণীর আলোচনা পরিচালনা করা, (গ) পরীক্ষার পরিকল্পনা করা ও শিক্ষার্থীর নিকট সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন, (ঘ) শ্রেণীর কাজ পরিদর্শন, (ঙ) শ্রেণীর বাহিরে পাঠের জন্য শিক্ষার্থীকে উৎসাহ প্রদান, (চ) অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক পাঠের ব্যবস্থা করা, (ছ) পরীক্ষার ফলের মূল্যায়ন করা প্রভৃতি থাকিবে।

(৩) শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় সকল প্রকার বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন বা যন্ত্রপাতি প্রভৃতির জন্য একটি তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে। বিজ্ঞান-ঘরে বা পরীক্ষাগারে যদি ঐ সকল জিনিস না পাওয়া যায় বিদ্যালয়ের অন্য বিভাগ হইতে সাময়িকভাবে আনিয়া কাজ চালাইতে পারা যায়। কোন একক আরম্ভ করার পূর্বেই ঐ সকল দ্রব্য আনিয়া ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে।

শিক্ষা-এককের পরিচালনা

কোন এককের বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও সংগঠনের পরে কি করিয়া তাহাকে শিক্ষার্থীর নিকট পরিবেশন করিতে হয় তাহা চিন্তা করিতে হয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নিকট পাঠ উপস্থাপিত করা হইয়া থাকে। বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে নীতিগত পার্থক্য তাহাদের মধ্যে কিছু থাকিলেও তাহা মৌলিক নহে। Morrison-এর নীতিকে কিছু পরিবর্তন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিক্ষা-চক্রকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করাকে আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ উপযোগী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

(১) আবিষ্কার (Exploration)
(২) পরিকল্পনা বা উপস্থাপন (planning or presentation)
(৩) আয়ত্তীকরণ (Assimilation)
(৪) সংগঠন (Organisation) এবং
(৫) আবৃত্তি (Recitation)

(১) আবিষ্কার (Exploration) :

পাঠ পরিচালনার প্রাথমিক ধাপ হইল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি তৈরী করা। মরিসনের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই প্রস্তুতির জন্য কিছু প্রাক-পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। আলোচনা বা প্রশ্নের মাধ্যমে যে এককটি পরিবেশিত হইবে তাহা যথার্থ উপযোগী কিনা তাহা যাচাই করা দরকার। এই প্রাক-পরীক্ষা মৌখিক বা লিখিত হইতে পারে। উভয় পদ্ধতিতে উক্ত একক সম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। এই ধরণের লিখিত পরীক্ষাতে ব্যক্তিগত এবং মৌখিক পরীক্ষাতে শ্রেণীর গুণাগুণ নির্ণয় করা যায়।

এই ধরণের পরীক্ষার চার প্রকার উদ্দেশ্য বিদ্যমান :—

(ক) পাঠদানের পূর্বে শিক্ষার্থী এককের কতটুকু জানে তাহা অবহিত হওয়া যায়।

(খ) বর্তমান পাঠদানে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ ও ঔৎসুক্য জাগরিত করা যায়।

(গ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি ঘটে।

(ঘ) পূর্বজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া নূতন জ্ঞানদান করা যায়।

(২) পরিকল্পনা বা উপস্থাপন (Planning or Presentation) :

প্রাক-পরীক্ষা গ্রহণ ও তাহার মূল্যায়নের পর শিক্ষক পাঠ উপস্থাপিত করিবেন। গেষ্টল্ট নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শিক্ষক এককের সামগ্রিক রূপ শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করিবেন। তাহাতে শিক্ষার্থীর সম্মুখে সমগ্র এককের রূপ প্রতিভাত হবে এবং উৎসুক মন লইয়া লক্ষ্যে পৌছুবার আশায় নূতন পথে পা বাড়াইবে।

উপস্থাপনে শিক্ষক গল্পচ্ছলে বা বক্তৃতার মাধ্যমে এককটিকে শিক্ষার্থীর কাছে হাজির করিবেন। কিন্তু প্রয়োজন হইলেই বিভিন্ন পরীক্ষা বা উদাহরণের অবতারণা করিয়া শিক্ষার্থীর নিকট পাঠটিকে সরল করিয়া তুলিবেন। সাধারণতঃ

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ চলে বলিয়া শিক্ষককে যথেষ্ট সতর্ক থাকিতে হয়। এককের কোন প্রয়োজনীয় অংশ যেন অসতর্কতার জন্য বাদ না পড়ে। শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর করিবে—অসমর্থ হইলে শিক্ষক সাহায্য করিবেন। শিক্ষার্থী আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীতে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে বক্তৃতা পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত বেশী কার্যকরী। যদিও এইরূপে পাঠদান শিক্ষার্থীর বয়স ও পুষ্টির উপর নির্ভরশীল।

প্রয়োজনমত সিনেমা বা প্রজেক্টরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া পাঠটিকে সরস করিয়া তোলা যায়। নূতনত্বের মাধ্যমে উপস্থাপন পাঠকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলে।

(৩) আয়ত্তীকরণ (Assimilation):

পাঠদান-চক্রের এই পর্যায়ে সত্যকারের শিক্ষা সংঘটিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পর্যায়ে তিন-চতুর্থাংশ সময় নিয়োজিত হয়। এই সময়ে বিজ্ঞান শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তক পঠন, অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুস্তক, পত্রিকা প্রভৃতি পাঠ, পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বিভিন্ন মন্তব্যের তালিকা প্রস্তুত, শ্রেণীতে আলোচনা প্রভৃতি কার্য পরিচালনা করা হইয়া থাকে।

আয়ত্তীকরণ পর্যায়ে শিক্ষা-প্রদর্শিকার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দিকে দৃষ্টি দিবার জন্য শিক্ষা-প্রদর্শিকার সৃষ্টি। ইহার মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ নিজ ক্ষমতা ও গতি অনুযায়ী অগ্রসর হইয়া থাকে। শিক্ষা-প্রদর্শিকার নিম্নলিখিত গুণ থাকা দরকার। যথা—(ক) এককটি শিক্ষা-প্রদর্শিকাতে স্পষ্ট ভাষায় অর্থপূর্ণ বাক্যে প্রকাশ করিতে হইবে। (খ) শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষার্থীর নিজের করণীয় কাজগুলির নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। (গ) প্রশ্নাবলী এমন স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হইবে যে শিক্ষার্থীর জ্ঞাত বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য সেই সকল প্রশ্নে ধরা পড়িবে। (ঘ) শিক্ষার্থী ইচ্ছা করিলে অতিরিক্ত অন্যান্য কার্যাবলীতে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে।

কিন্তু একথা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে শিক্ষা-প্রদর্শিকা যেন সংক্ষিপ্ত ও সারতথ্যসমন্বিত হয়। অযথা বিস্তৃত হইলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সময় এবং শক্তির অপব্যয় হইবে।

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী নিজ নিজ গতিতে অগ্রসর হইবে সত্য ; কিন্তু যেখানে এককে সমস্যামূলক কার্যাবলী বিদ্যমান সেখানে সকলকে একসংগে একটি সমস্যা আরম্ভ করিতে হইবে। যখনই বিভিন্ন শিক্ষার্থী নূতন পর্যায়ে পৌছায় তখন আর একটি নূতন সমস্যা উপস্থাপিত করিতে হয়। নতুবা শ্রেণীতে ৩০।৪০ এমনকি ১৫।২০ জন শিক্ষার্থী থাকিলেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে নূতন সমস্যা দেওয়া সম্ভবপর নয়। এখানে মরিসন-পরিকল্পনা হইতে আমরা একটু দূরে সরিয়া আসিয়াছি। এতগুলি শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করা যে কোন শিক্ষকের পক্ষেই অসম্ভব।

একটি এককের পাঠদান ততক্ষণ চলিবে যতক্ষণ না সেই এককের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় তথ্য শ্রেণীর স্বল্পধী শিক্ষার্থীর কার্যকরীভাবে অধীত হয়। এই ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছিলে এককটি বন্ধ করিয়া অন্য একক আরম্ভ করিতে হয়। এককের শেষ পর্যায় পর্যন্ত আগ্রহ সঞ্জীবিত করিয়া রাখার সকল দায়িত্ব সহৃদয় শিক্ষকের। একক শেষ করিবার তিন বা চার দিন পূর্বে তাহা ঘোষণা করা উচিত। তাহাতে সকল শিক্ষার্থী ভাল করিয়া এককটিকে অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ করিবে এবং অন্যান্য বাকী করণীয় কাজগুলি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করিবে। মরিসন-পরিকল্পনা এই পর্যায়ে প্রতি এককের নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন হইলে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেয়। যদি কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, তবে তাহাকে আবার অধ্যয়ন করিতে এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে হইবে। অনেকে বলেন প্রতি কার্যের পরে এরূপ পরীক্ষা গ্রহণ সহজসাধ্য নয়। তাঁহারা বলেন একটি একক শেষ হইলে তৎসংলগ্ন যাবতীয় প্রশ্ন সকল শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে করিতে হইবে। তাহাতে শিক্ষার্থী এককটির একটি সামগ্রিক জ্ঞান আহরণ করিবে ও পরীক্ষায় তাহা দেখাইতে সক্ষম হইবে। যদি নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা করা হয় তবে শিক্ষার্থীও শিক্ষককে উত্তরপত্র পরিদর্শনে সাহায্য করিতে পারে। তাহাতে শিক্ষকের

সময় অনেকখানি অপচয়ের হাত হইতে রক্ষা পায়।

(৪) সংগঠন (Organisation):

একক পরিচালনায় চতুর্থ ধাপ হইতেছে—সংগঠন। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী যে সকল পুস্তক বা অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছে সেইগুলির সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষার্থীকে তাহা সুসামঞ্জস্যভাবে গ্রথিত করিতে হইবে। শিক্ষার্থীর খুসীমত সে ইহা রচনা করিবে। এক কথায় ইহাই হইবে এককের সারাংশ। এককের বিস্তৃতির উপর সারাংশের বিস্তার নির্ভর করিবে। অন্যান্য পদ্ধতি এই পর্যায়ে পুনরালোচনা করে। কিন্তু মরিসন-পরিকল্পনাতে ইহা পুনরাবৃত্তি নহে। এককের সমগ্র বিষয়টিকে ধারাবাহিকভাবে সুসজ্জিত করাই এই পর্যায়ের লক্ষ্য। শিক্ষক উৎসাহ জাগাইবার জন্য এই সারাংশের মূল্যায়ন করিতে পারেন। অবশ্য না করিলেও ক্ষতি নাই।

এই সংগঠন প্রক্রিয়াকে ব্যক্তি বা কয়েকটি দলের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায়। দলের সকলে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়া সারাংশ তৈরী করিবে। অবশ্য প্রত্যেকেরই দান সেই সারাংশে থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

(৫) আবৃত্তি (Recitation):

একক পরিচালনায় শেষ ধাপ হইতেছে—আবৃত্তি। শিক্ষার্থী এই পর্যায়ে সমগ্র এককের সারাংশ শ্রেণীতে আবৃত্তি করে। পূর্ব পর্যায়ের ন্যায় এই আবৃত্তি দলগত-ভাবেও চলিতে পারে। এই সকল দল অধীত এককের বিভিন্ন অংশ আবৃত্তি করিতে পারে। যদি ব্যক্তিগতভাবে আবৃত্তি করে তবে আবৃত্তির পরে অন্যে সমালোচনা করিয়া সারাংশকে পরিবর্তিত বা পরিবর্দ্ধিত করিতে পারে। শিক্ষককে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে আলোচনা যেন নিকৃষ্ট হইতে ক্রমে উৎকৃষ্টের দিকে যায়; অন্যথায় খুব ভাল ছেলেকে দিয়া প্রথমে আবৃত্তি করাইলে অন্যে সুযোগ নাও পাইতে পারে। এ-ও মনে রাখা দরকার—শ্রেণীতে সকলেই আবৃত্তির সুযোগ একই এককে পাইবে না। সুতরাং পরবর্তী এককে বাকী শিক্ষার্থী যাহাতে আবৃত্তিতে সুযোগ পায় সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে

যে সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের চেষ্টায় একক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সর্বোৎকৃষ্টরূপে পরিগণিত হইবে।

পদ্ধতি নির্ধারণ:

এতক্ষণ বিভিন্ন বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে প্রত্যেক পদ্ধতিতে সুবিধা ও অসুবিধা বিদ্যমান। সেইজন্য বিজ্ঞান পাঠদানের এমন কোন বিশেষ পদ্ধতি নাই যাহা সব পাঠের জন্য উপযুক্ত হইবে। ইহা ছাড়া পাঠদান পদ্ধতি এক ব্যক্তিগত সামগ্রী; ইহার জন্য কোন সাধারণ নিয়ম তৈরী করা সম্ভব নয়। শিক্ষক প্রতি পদ্ধতির সুবিধার দিকগুলি গ্রহণ করিবেন এবং নিজের মৌলিক চিন্তায় রঞ্জিত করিয়া পাঠদানে অগ্রসর হইবেন। কোন বিশেষ বিষয়ে পাঠদানের সময় কোন্ পদ্ধতি গ্রহণীয়তাহা শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরশীল।

ইহা খুবই সত্য যে একটি কৌশল হয়ত এক বিষয় পরিবেশনে সর্বোৎকৃষ্ট— আবার অন্য বিষয়ে তাহা একেবারেই অচল হইতে পারে। সংগ্রহ, প্রজেক্ট প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য; আবার চিন্তা ও যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি উচ্চ শ্রেণীর জন্য কার্যকরী। বিচক্ষণ শিক্ষক পাঠদানে বিভিন্ন পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করিবেন। শিক্ষার্থীর বয়স এবং বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ও গভীরতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষক পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

যে পদ্ধতি কোন পাঠের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে আগ্রহের সহিত কাজের মধ্যে নিযুক্ত রাখে সেই পদ্ধতি সেই পাঠের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী। আগ্রহ বজায় রাখার জন্য শিক্ষককে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর জ্ঞাত বিষয়ের উপ রভিত্তি করিয়া পাঠদান করিতে হইবে। পাঠকে সমস্যাকারে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ উপস্থাপিত বিষয়টি যেন উৎসাহোদ্দীপক হয়। ইহা যেন পরীক্ষা, মডেল, ছবি, চিত্র, অংকন, বোর্ডের কাজ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক উপকরণে সমৃদ্ধ হয়।

তৃতীয়তঃ পাঠদানে প্রশ্ন এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে মনোযোগী হইতে, চিন্তা করিতে, শ্রেণীতে সক্রিয় থাকিতে সাহায্য করে।

চতুর্থতঃ শিক্ষাদান একটি সহযোগিতাপূর্ণ প্রক্রিয়া। দেওয়া ও নেওয়ার মাধ্যমে শ্রেণীর কাজ অগ্রসর হয়। শিক্ষার্থী যেন মনে করে যে সে শ্রেণীর এক সক্রিয় অংশীদার।

পঞ্চমতঃ পাঠদান এইরূপ হইবে যে তাহা যেন শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুষঙ্গ সৃষ্টি করে।

ষষ্ঠতঃ যতদূর সম্ভব সরল ভাষা ব্যবহার করিয়া বিজ্ঞান পাঠদান করা উচিত। অন্যথায় উপলব্ধির পরিবর্তে স্মৃতির ক্রিয়া বৃদ্ধি পাইবে।

সপ্তমতঃ যোগ্য স্থানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের জীবনী এবং আবিষ্কারের কাহিনী পরিবেশন করিয়া শিক্ষার্থীকে আগ্রহশীল করিয়া তুলিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক বা তাহার তথ্য দেশ, কাল বা জাতির গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না—এই মানসিক বিস্তৃতি যেন শিক্ষার্থীর থাকে।

উক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও শিক্ষককে অন্যান্য বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এখানে তাঁহার ব্যক্তিত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী কার্যকরী। অতিশয় নীরস বিষয়ও শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব এবং অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে প্রাণবন্ত হইয়া উঠে।

বিজ্ঞান শিক্ষাদানের বিভিন্ন পর্যায়

"কি পড়াইতে হইবে এবং কেন ?"—এটি নির্ধারণ করার পর শিক্ষকের কাজ শেষ হইল না। আসলে শিক্ষার্থীকে পাঠদান করিতে হইবে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য যাহাতে পুরাপুরি লাভ করা যায় তাহার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট সচেষ্ট হইতে হইবে। বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্য লইয়া শিক্ষক বিষয়বস্তু পরিবেশন করিবেন। তিনি বক্তৃতা দিবেন, পরীক্ষা করিবেন, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে পরীক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থীকে সুযোগ দিবেন, বিভিন্ন সমিতি ও সংঘ সৃষ্টির জন্য উৎসাহ প্রদর্শন করিবেন ; চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ভ্রমণে পরিচালনা, প্রদর্শনী পরিচালনায় নেতার ভূমিকা গ্রহণ করিবেন বা অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন প্রভৃতি পড়ার জন্য উপদেশ দিবেন। এক কথায় শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন। 'বিজ্ঞান কি ?'—এইটি যতদিন না শিক্ষা লাভ করিতেছে ততদিন শিক্ষার্থীর জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানে দৃষ্টিভঙ্গি এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি ধারা আলোচিত হইতেছে।

পুনরাবৃত্তি ঃ—একবার কোন বিষয়ে পাঠ দিলেই যে শিক্ষার্থী তাহা ভাল ভাবে আয়ত্ত করিতে পারে তাহা ঠিক নয়। আরও কিছুদিন পরে সে তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে। মনে করা যাউক বিষয়টি 'ঘনত্ব'। বিভিন্ন পদ্ধতিতে 'ঘনত্ব' বাহির করিবার জন্য প্রচুর সময় লাগে। কিন্তু প্রতিবারই একই ধারণাকে পুনরাবৃত্তি করিতে হইতেছে—ওজন এবং আয়তনের অনুপাত। যতক্ষণ না এই ধারণাটি শিক্ষার্থীর নিকট পরিষ্কার হইতেছে ততক্ষণ শিক্ষক বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে মাঝে মাঝে যাচাই করিবেন। কতক্ষণ ধরিয়া একটি বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নির্ভর করে—শ্রেণীর মানসিক পুষ্টির মাত্রা, শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পটভূমিকা এবং শিক্ষকের হাতে সময়ের উপর। যেহেতু উক্ত বিষয়গুলি পরিবর্তনশীল, সুতরাং বিজ্ঞানের বিষয়গুলির পঠন পুনরাবৃত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতি-

বারেই কিছু কিছু নূতন তথ্য আসিবে এবং বিস্তৃত সাধারণীকরণের সুযোগে শিক্ষার্থীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইবে। প্রাণীর শ্বাসতন্ত্র পাঠের পরেই যে শিক্ষার্থী ব্যাঙ-এর অন্তঃকরণে কাঁচি চালাইতে পারিবে বা লেন্স্-এর জ্ঞানের পরেই সে সূত্র সাহায্যে focal length বাহির করিতে পারিবে—ইহা চিন্তা করা অযৌক্তিক। মানসিক বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে এই সকল বিষয় পুনরালোচনা করা দরকার।

সমস্যা সমাধানঃ—বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যেমন দরকার, তেমনই সেই জ্ঞানকে বাস্তব ও দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানের জন্য নিত্য প্রয়োগ করা অপরিহার্য কর্তব্য। এইরূপ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে তাহার জ্ঞানের পরিপক্কতা জন্মে। ইহারই মাধ্যমে আরও ঘটনা তাহার জ্ঞাত হইবে—বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হইবে—দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত হইবে এবং ফলে আগ্রহ প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত হইবে। শ্রেণীকে কোন সমস্যা সমাধান করিতে দেওয়ার পূর্বে দেখা দরকার সমস্যা সঠিকভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে কি না। প্রশ্নের ভাষা এমন হইবে যে শ্রেণী সহজে অনুধাবন করিতে পারে এবং ইহার উত্তরের গণ্ডী যেন সীমাবদ্ধ হয়। জটিল প্রশ্নকে ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট সরল প্রশ্নে খণ্ডিত করা অনেক ভাল। যেমন 'দিকদর্শন যন্ত্র' কেমন করিয়া চলে?'—এইরূপ প্রশ্নের ঠিক উত্তর কি হইবে শিক্ষার্থী ঠিক করিতে পারে না। ইহার ব্যবহার বা কি ভাবে তৈরী বা কোন্ দিকে স্থির থাকে বা চৌম্বকের গুণাগুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—তাহা প্রশ্নে পরিষ্কার না থাকায় শিক্ষার্থী অসুবিধায় পড়িয়া যায়। বিভিন্ন অর্থবোধক এইরূপ জটিল প্রশ্নকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহজতর বাক্যে বিভক্ত করিয়া শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থাপিত করা বিধেয়। যেমন—

(ক) সূতা দিয়া চুম্বক ঝুলাইয়া দিলে কি ঘটে?
(খ) সব চুম্বকেরই কি একই অবস্থা ঘটে? সিদ্ধান্ত কি?
(গ) কম্পাসের কাঁটাকে ঝুলাইয়া রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পথ কি?
(ঘ) কাঁটা কতটা ঘুরিয়াছে দেখিবার জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়?

(ঙ) কাৎ হইয়া গেলে কাঁটাকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করিবে ?

(চ) কাঁটাকে সমুদ্র পৃষ্ঠের সমান্তরাল (Horizontal) রাখিতে কি করিতে হইবে ?

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নে হয়ত শিক্ষার্থীকে বেশী পরীক্ষার সাহায্য লইতে হইবে ; কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে চুম্বকের ধর্ম সম্বন্ধে নিখুঁত ধারণা জন্মিবে।

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকট সমস্যা উপস্থাপিত করিবেন। প্রয়োজনমতে সমস্যাটিকে উপরোক্ত প্রণালীতে কয়েকটি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিবেন। টুকরা অংশের সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা থাকিবে। শিক্ষক তাহাদের সাহায্যকারী বন্ধু হিসাবে সহযোগিতা করিবেন। পাঠ্যপুস্তক, অন্যান্য বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন প্রভৃতি বা এই বিষয়ে দক্ষ লোকের সংস্পর্শে আসিয়া এই সকল প্রশ্নের সমাধান বাহির করিবে। এই সকল খবরের মধ্যে কোন্‌গুলি প্রাসঙ্গিক এবং নির্ভরযোগ্য তাহা বাছিয়া ফেলিবে ও উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরী হইবে। কিন্তু এইখানেই বিজ্ঞানের কাজ শেষ হইল না। তাহার ধারণা নিত্য প্রয়োগের মাধ্যমে সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে সেই ধারণার নূতন এবং খাঁটি রূপ দেখা দিবে। বিজ্ঞান পাঠের সেইখানেই সার্থকতা।

নীচে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। শিক্ষক উৎসাহী হইলে এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করিতে পারেন।

উদাহরণ ঃ—মরিচা পড়া—লোহার পাতে মরিচা পড়ে কেন এবং তাহা পাল্টাইবারই বা কারণ কি ?

(ক) **সমস্যার উপস্থাপন** ঃ—উক্ত প্রশ্নটি বাস্তব। অনেকেই বাড়ীর ছাদের জন্য টিন ব্যবহার করেন। বাড়ী তৈরী করা কত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সমগ্র পৃথিবীর লোকই এই বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন। বারবার ছাদ পরিবর্তনে যে টাকা ব্যয় হয় তাহাতে অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করা যাইত। লোহার ছাদে মরিচা পড়িলে কখনও কখনও তাহা ফাটিয়া যায়। তাহাতে জল বসে এবং ভিজা ছাদ আরও ফাটলের সম্মুখীন হয়। এই ভয়াবহ ছাদ দেখিতে যেমন খারাপ

তেমনই ভয়ঙ্কর এর পরিণতি। এইভাবে বাস্তব দিক বা সৌন্দর্যের দিক হইতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ জাগরিত করিতে হয়।

(খ) **সমস্যা বিশ্লেষণ** ঃ—পরের ধাপ হইতেছে—কোন্ ঘটনার সহিত মরিচা পড়া কার্যটি নির্ভরশীল তাহা বাহির করা। তাহার জন্য আসল প্রশ্নটিকে কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রশ্নে বিভক্ত করিতে হইবে এবং বিভাগ-গুলির সমাধানের ফলই হইবে সমগ্র প্রশ্নটির উত্তর। নিম্নে কয়েকটি বিভাগ দেখান হইল।

(১) ভিজা আবহাওয়া বা শুষ্ক আবহাওয়া মরিচা পড়িতে সাহায্য করে কি না।

(২) গরম ও ঠাণ্ডা দেশের মধ্যে লোহার পাতে কোথায় বেশী মরিচা পড়ে?

(৩) ছাদে লোহা ছাড়া অন্য ধাতুর পাতও দেখিতে পাওয়া যায়। সে-গুলিতে কি মরিচা পড়ে বা পাল্টাইতে হয়?

(৪) লোহা বা মরিচা-পড়া-লোহায় তফাৎ কি?

(৫) লোহার পাতে অনেক সময় রং লাগান থাকে। সেটা কি সুন্দর দেখানর জন্য—না তাহাতে মরিচা কম পড়ে?

(৬) লোহার পাতের কোথায় আগে মরিচা পড়ে?

(গ) **তথ্য সংগ্রহ** ঃ—যে প্রশ্নগুলি পূর্বে করা হইয়াছে ধারাবাহিকভাবে তাহাদের সমাধান করিতে হইবে। পরীক্ষাগার, বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগ, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, বাড়ী, গ্রাম বা দূরদেশ এই সকল প্রশ্নের সমাধানের সূত্র ধরাইয়া দিতে সক্ষম। যে শিক্ষার্থীর বিস্তৃত জ্ঞান আছে, বা যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ করিয়াছে তাহার কাছে এই সকল প্রশ্নের ঠিক মত জবাব পাওয়া কিছু মাত্র কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। পরীক্ষাগারে সীমিত গণ্ডী ও সর্তের মধ্যে ক্ষুদ্রাকারে পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ চলিতে পারে। তাই একটি বড় টিনের পরিবর্তে এক ফালি লোহা বা একটুকরা লোহা লইয়া পরীক্ষা করা হয়।

এক টুক্‌রা নূতন লোহা লইলে দেখা যাইবে যে সেটি উজ্জ্বল এবং স্ফটীকের মত মসৃণ। কোন ধারাল ছুরী দিয়া আঁচড় দিলে ভিতরে অন্য কিছু জিনিস আছে

বলিয়া অনুভূত হয়। এই আঁচড় দেওয়া লোহার টুক্‌রাটি শিক্ষার্থীদের হাতে দেওয়া উচিত। তাহাতে তাহারা সমগ্র সমস্যাটির সমাধানে একটি প্রয়োজনীয় সূত্রের সন্ধান পাইবে।

বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে লক্ষ্যে পৌছিতে সাহায্য করিতে হইবে। নীচে অগ্রসর হওয়ার পথ দেখান হইয়াছে। তবে উপস্থাপনের নিম্নরূপ ধারাবাহিকতা যে সর্বত্র বজায় রাখিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই।

একটি ছাত্রকে উক্ত কাজে দক্ষ গ্রামের কোন মিস্ত্রী বা ইঞ্জিনীয়ারের সহিত দেখা করিতে বলা হইল। তাঁহার নিকট হইতে সে জানিবে—রং করিলে লোহায় মরিচা পড়ে কি না (৫)। এই কাজটিকে বিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে না রাখিয়া উক্ত উপায়ে সামাজিক পরিবেশে সমাধান করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ কোন ছাত্র বাড়ীর জানালার লোহার গরাদেতে রং না লাগানর কি ফল তাহা শ্রেণীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারে।

(১) নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য কোন ছাত্র বিভিন্ন আবহাওয়ায় লোহায় মরিচা পড়ার তথ্য জানে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যদি না জানে তবে অনবরত জল পড়িতেছে এমন কোন লোহার জিনিসের খবর তাহারা জানে কি না—ক্ষেতে কাজ করিবার কোন যন্ত্র জলে পড়িয়া থাকিলে কোন পরিবর্তন হয় কি না—জল থাকার জন্য মরিচা দ্রুত হইতেছে কি না—অন্য কোথাও এরূপ দেখিয়াছে কি না প্রভৃতি প্রশ্ন করা যাইতে পারে। যদি তাহাতে ভাল ফল না পাওয়া যায় তবে নমুনা হিসাবে কিছু ভিজা ও কিছু শুষ্ক লোহার গুঁড়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখান যাইতে পারে যে কি অবস্থায় লোহায় দ্রুত মরিচা পড়ে।

ইহার পরেই নিম্নরূপ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। তিনটি জলপূর্ণ পরীক্ষানলে তিন রকমের লোহা, যথা—(১) সাধারণ লোহা, (২) ছুরী দ্বারা গর্ত করা লোহা এবং (৩) রং মাখান লোহা লওয়া হইবে। শিক্ষার্থী পূর্বেই জানে যে ফুটন্ত জলে দ্রবীভূত বায়ু থাকে না। সুতরাং বায়ুশূন্য জল বা ফুটন্ত জল এবং বায়ু দ্রবীভূত সাধারণ জলে উক্ত তিন ধরণের নমুনা লোহার অবস্থার কি পরিবর্তন

হইবে? উক্ত নিয়মে ছয় প্রকার নমুনায় লেবেল আঁটিয়া রাখা হয় ও পরীক্ষার জন্য সময় দিতে হয়।

লোহা ছাড়া অন্য কোন ধাতু দ্বারা কি ঘরের ছাদ নির্মাণ করা হয়? প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব হইতে এইজন্য সিসা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বর্তমানে এলুমিনিয়ামের প্রচলনও খুব বেশী হইয়াছে। ইহাদের কি লোহার মত দ্রুত মরিচা ধরে? ধীরে ধীরে? কিম্বা একেবারেই ধরে না? দুই প্রকারের নমুনা লইয়া সাধারণ ও ফুটান জলে রাখা হইল। চারটি পরীক্ষানলে চার রকমের নমুনা রাখিয়া পরীক্ষা করা হইল (৩)। এ ছাড়া অন্যান্য কি ধাতু ছাদে ব্যবহৃত হয়? প্রতিবারই একই রকম পরীক্ষা করা হইল। এইরূপে ৬নং প্রশ্নের জবাবও মিলিবে।

শীতল দেশ অপেক্ষা উষ্ণ দেশে দ্রুত মরিচা পড়ে কিনা শিক্ষার্থী শীঘ্র বুঝিতে পারে না। শ্রেণীতে ইহা পরীক্ষা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তবে শিক্ষার্থী যদি জানে যে মরিচা পড়া একটি যৌগিক প্রক্রিয়া এবং যৌগিক প্রক্রিয়া ঠাণ্ডা অপেক্ষা গরমে দ্রুত সংগঠিত হয় তবে এই দুই অবস্থায় মরিচা কোথায় দ্রুততর ধরিবে তাহা শিক্ষার্থী সহজেই স্থির করিতে পারিবে (২)।

৪নং প্রশ্নের জবাবের জন্য শিক্ষার্থীকে অপেক্ষা করিতে হয়। উক্ত ফলগুলি পাইবার পরে সে অনায়াসে বলিতে পারে যে মরিচা পড়িতে বাতাসের অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। পরীক্ষার জন্য একমুখ খোলা কাঁচের নলে জল দিয়া ঢালিয়া ফেলা হইল। অতঃপর লোহার কুচি ভিতরে দিলে নলের গায়ে লাগিয়া রহিল। এখন উহাকে একটি জলপূর্ণ পাত্রে উল্টাইয়া ধরা হইল ও পর্যবেক্ষণ করা গেল।

(ঘ) **ঘটনার বিশ্লেষণ**:—মিস্ত্রী বা ইঞ্জিনীয়ারের কাছ হইতে খবর পাওয়া যাইবে যে রং করিলে জিনিস বেশীদিন টেকে—সহজে মরিচা ধরে না। এটাও মনে রাখা দরকার যে ছাদ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ফাটা বা দাগী কোন লোহা ব্যবহার করা উচিত নয়। তাহা ছাড়া হুক বা পেরেক বসানর জন্য যত কম ছিদ্র থাকে ততই মঙ্গল (৫)।

পরীক্ষানলের নমুনাগুলির ফল নীচে প্রদত্ত হইল।

নমুনা	সাধারণ জলের উপর ক্রিয়া	ফুটান জলের উপর ক্রিয়া
দাগী লোহার পাত	মরিচা পড়ে	মরিচা পড়ে না
লোহার পাত	কিনারায় মরিচা পড়ে	ঐ
রং করা লোহার পাত	মরিচা পড়ে না	ঐ
এলুমিনিয়ামের পাত	ঐ	ঐ
সিসার পাত	ঐ	ঐ
দস্তার পাত	ঐ	ঐ
টিনের পাত	ঐ	ঐ
খাদ্য সংরক্ষিত টিনের পাত	কিনারায় মরিচা পড়ে	ঐ

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে লোহার কিনারায় মরিচা পড়ে (৬)।

লোহার গুঁড়াতে মরিচা ধরিয়াছে। নলে কিছুদূর পর্যন্ত জল উঠিয়াছে (৪)। কিন্তু কিছুটা উঠিয়াই জল উঠা বন্ধ হইয়াছে।

(ঙ) **সিদ্ধান্ত** ঃ—১নং এবং ৩নং পরীক্ষায় জানা যায় যে ফুটন্ত জলে মরিচা পড়ে নাই। সুতরাং মরিচা পড়িতে বাতাসের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। ৪নং পরীক্ষায় জানা যায় যে বাতাসের একটি বিশেষ উপাদান মরিচায় সাহায্য করে। সেই জন্য এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে লোহার উপর মরিচা ধরে না এমন কোন ধাতু, যেমন—দস্তা, টিন, সিসা প্রভৃতি দ্বারা আবৃত করিলে লোহায় মরিচা পড়িবে না। লোহায় ক্ষত থাকিলে বা কিনারা নগ্ন থাকিলে লোহা অরক্ষিত হয়। সেখানে রং বিশেষ কার্যকরী। সিদ্ধান্তগুলির সারাংশ উপরে প্রদত্ত হইল।

এরূপ সাধারণ পরীক্ষা ছাড়াও যদি কোন শিক্ষার্থী প্রশ্ন করে, "কোন্ দ্রব্য

দ্বারা লোহাকে আবৃত করিলে মরিচার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়?" তখন (যদিও এ প্রশ্নটি সাধারণ বিজ্ঞানের সীমার মধ্যে পড়ে না) শিক্ষক সহজ উপায়ে শিক্ষার্থীকে কিছু ধারণা দিবেন। দস্তা, টিন, সিসা বা মরিচা ধরে না এমন ধাতু দ্বারা লোহাকে আবৃত করা যায়। সাধারণতঃ টিনই এই কাজে ব্যবহৃত হয়। তাই ছাদ প্রভৃতির জন্য এই সকল লোহার নাম গ্যাল্‌ভানাইজড্‌ লোহা। লোহাকে উত্তপ্ত তরল টিনে ডুবাইয়া উহা তৈরী করা হয়। খাদ্য সংরক্ষিত কৌটাগুলি অধিকাংশই এইরূপে প্রস্তুত হয়।

(চ) **দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ** ঃ—উক্ত সিদ্ধান্তগুলি বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইবে। উক্ত ঘটনাসমূহ জানায় যে বিশেষ চেষ্টা ও যত্নসহকারে ঘরের ছাদের জন্য পাত ব্যবহার করিতে হয়। দস্তার আবরণের পরেও রং করিলে লোহার পাত দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। লোহার পরিবর্তে অন্যান্য ধাতুর ছাদ তৈরী করিলে বেশী দিন চলিবে। হয়ত কিছুদিনের মধ্যে এলুমিনিয়াম এই সকল ক্ষেত্রে লোহার আসন দখল করিবে। কারণ তাহাতে মরিচা পড়ে না, রং বা আবরণের দরকার হয় না ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(ছ) **বিস্তৃত পাঠের বিষয়** ঃ—ঘরের ছাদের সমস্যা পার হইয় শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধরণের অন্যান্য সমস্যারও সম্মুখীন হইতে পারে। "মরিচা ও পূর্বের লোহায় পার্থক্য কি?" (৪)—এই প্রশ্নের সমান্তরাল প্রশ্ন আসিতে পারে—"জিনিস পোড়াইলে কি হয়?"—ইহাতে অক্সিজেন সম্পর্কে আরও তথ্য জানার প্রয়োজন হয়। কি করিয়া বিভিন্ন অক্সাইড তৈরী হয় বা তাহাদের গঠন কিরূপ, ক্ষার ও অম্লজান ঘটিত অক্সাইড প্রভৃতি বিস্তৃত বিষয়-সমুদ্রে প্রবেশ করা যায়।

উপরে যে ধরণে সমস্যা সমাধানের পথ দেখান হইয়াছে তাহা শ্রেণীতে নিত্যকার কর্ম হইয়া উচিত। শিক্ষার্থী তবেই ইহাকে সহজ ও সাবলীলভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ইহাতে সে অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে।

বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ঘটনা পরিবেশন বা যথাযথভাবে পরীক্ষা পরিচালনা নয়। শিক্ষার্থীকে অন্তর্নিহিত কয়েকটি মূল্যবান গুণের অধিকারী করিতেও শিক্ষক সাহায্য করিবেন। বিজ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমে এই

গুণগুলি ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর মনে অনুপ্রবেশ করে ও সে তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। পাঠদানকালেশিক্ষক নিম্নলিখিত গুণগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

(ক) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিবার ক্ষমতা লাভ :—

সূক্ষ্ম এবং সুসংহত চিন্তা বিজ্ঞান পাঠের এক অপরিহার্য অংশ। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সেই চিন্তার উপাদান বিদ্যমান। নীচে এইরূপ কয়েকটি বিষয় আলোচিত হইতেছে।

(১) **সংজ্ঞার নির্ভুলতা ও সংক্ষিপ্ততা :**—অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর কাছে সংজ্ঞা সাধারণীকৃত না হইয়া বিবরণবহুল হইবে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে তাহা যেন স্পষ্ট ও নির্ভুল হয়। সাধারণতঃ সেই বিবরণের ভিতর গুণাবলী এবং উদাহরণ বর্তমান থাকিবে। যেমন, 'একটি পারদভর্তি বোতল, জলভর্তি ঐরূপ আর একটি বোতলের চেয়ে অনেক বেশী ভারী : জল হইতে পারদের ঘনত্ব বেশী বলিয়া ইহা হইয়া থাকে।' আবার—'দুই মুখ খোলা একটি সরু কাঁচের নল কোন জলভর্তি বাটিতে ডুবাইলে নলের মধ্যে জলের উচ্চতা বাটির জলের উচ্চতা অপেক্ষা বেশী থাকে ; কৈশিকতার জন্য ইহা হইয়া থাকে'।

উক্ত সংজ্ঞা দুইটি সত্য এবং প্রাথমিক জ্ঞান হিসাবে যথেষ্ট উপযোগী। কিন্তু যদি বলা যায়, 'এসিড নীল লিটমাস্‌কে লাল করে'—তাহা হইলে ভুল হইবে ; কারণ সব সময় এ নিয়ম নাও খাটিতে পারে। এমনও দেখা যায় যে 'সোডিয়াম কার্বোনেট' (এসিড) লাল লিটমাস্‌কে নীল এবং 'ফেরিক ক্লোরাইড' নীল লিট্‌মাসকে লাল করিতেছে। সুতরাং সংজ্ঞা প্রদানের সময় মনে রাখা উচিত যে শিক্ষার্থী যেন কোন ভুল না শিখে। উপরের সংজ্ঞাটি নীচু স্তরে 'এসিড কোন ক্ষারের সহিত মিশিয়া লবণ ও জল উৎপন্ন করে'—এইরূপভাবে পরিবেশন করিলে চলিতে পারে। আবার ক্ষারের সংজ্ঞাও অনুরূপ ভাবে দেওয়া চলে। উপরের স্তরে সজ্ঞাটিকে সংক্ষিপ্ত ও নীরেট করা দরকার। যেমন, কোন একক আয়তনের ওজনই হইতেছে ঘনত্ব। গ্রাম/সেন্টি ৩, অথবা, অন্য ওজন এবং অনুরূপ আয়তনের এককে ইহাকে প্রকাশ করা হয়। ভাষার সংক্ষিপ্তকরণ একটি বিশেষ দক্ষতা। বয়সের সংগে সংগে শিক্ষার্থী যাহাতে এই

দক্ষতা অর্জন করিতে পারে শিক্ষক সে দিকে দৃষ্টি দিবেন। অনেক সময় সংজ্ঞাকে বিভিন্ন গণিতের সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করিতে হয়। শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও মানসিক পুষ্টির উপর তাহা নির্ভর করে।

(২) পরীক্ষা-লব্ধ ভ্রান্তির সংকোচন সাধন ঃ—

শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন পরীক্ষালব্ধ ভুলের প্রতি শিক্ষার্থীর যেন সতর্ক দৃষ্টি থাকে। এই ভুল যতটা সম্ভব এড়ান যায় তাহার জন্য তাহারা যেন নূতন উপায় উদ্ভাবন করার চেষ্টা করে তাহার জন্য শিক্ষক উৎসাহ দিবেন। পরীক্ষার মাপ যতদূর সম্ভব সঠিক হয় তাহার জন্য শিক্ষার্থী তাহাদের বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইবে সত্য, কিন্তু যন্ত্রের জন্য ফল ভুল হইলে সে ভুল স্বীকার করিতে হয়। শিক্ষক সেখানে কেবল ভুল এড়ানর কৌশলই শিখাইবেন না—কেন এবং কোন্ সূত্রে তাহা ভুল তাহারও নির্দেশ দিবেন। ইহা ছাড়া শিক্ষার্থী যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগত ভ্রান্তি দূর করিতে সচেষ্ট থাকিবে।

(৩) ঘটনার শ্রেণী বিন্যাস ঃ—বিভিন্ন ঘটনা হইতে সাধারণ সূত্র গঠন ও তাহাদের সম্বন্ধে নূতন সম্পর্ক নির্ণয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ইহাতে বিভিন্ন ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয়। নীচে একটি শ্রেণীবদ্ধ ঘটনার তালিকা প্রদত্ত হইল। জলের উপর বিভিন্ন ধাতুর (A, B, C প্রভৃতি) ক্রিয়া মান অনুসারে ক্রমাণয়ে উপরে লেখা হইল। এইরূপে তাপ পরিবহনের ক্ষমতা, বৈদ্যুতিক বাধা, কাঠিন্য এবং ঘনত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ক্রমানুসারে (1, 2, 3 ইত্যাদি) নীচে লেখা হইল (তালিকায় দ্রষ্টব্য)। এই শ্রেণী বিন্যাসে অন্ততঃ চার প্রকার সুবিধা পরিলক্ষিত হয়।

(ক) পরীক্ষালব্ধ বিভিন্ন গুণের মধ্যে একটা সম্পর্কের সূত্র পাওয়া যাইতে পারে।

(খ) উক্ত তালিকায় সকল ধর্মের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান নাই।

(গ) উক্ত তালিকা হইতে সাধারণীকৃত সূত্রের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যেমন—দেখা যায় যে, (অ) যে ধাতুর ঘনত্ব যত বেশী তাহার তাপ ও বিদ্যুৎ পরি-

বহনের শক্তি তত বেশী, (আ) যাহার ঘনত্ব কম, সে সেই অনুপাতে জলের সহিত ক্রিয়াশীল।

(ঘ) এই সাধারণীকৃত ঘটনাকে অল্পায়াসে এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে মনে রাখা যায়।

গুণ	ধাতু						
	A	B	C	D	E	F	G
জলের উপর ক্রিয়া (দ্রুত হইতে ধীর)	1	2	3	4	5	6	7
তাপ পরিবহন (ক্রমান্বয়ে বেশী)	2	1	3	4	6	5	7
বৈদ্যুতিক বাধা (ক্রমান্বয়ে কম)	3	2	1	6	4	5	7
কাঠিন্য (নরম হইতে কঠিন)	1	2	3	6	7	4	5
ঘনত্ব (কম হইতে বেশী)	3	1	2	6	5	4	7

(8) বিভিন্ন বিভাগে শ্রেণী বিন্যাস ঃ—অনেক সময় এমন এক একটি সমস্যা দেখা যায় যাহাতে দুই বা ততোধিক বিরুদ্ধ মতের সম্মুখে পড়িতে হয়। তখন বিশদভাবে ব্যাখ্যার দ্বারা একটিকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। যেমন প্রশ্ন আসিল, "স্পঞ্জ কোন্ শ্রেণীভুক্ত—উদ্ভিদ না প্রাণী ?" এখানে শিক্ষক মুখে মুখে শিখাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু ইহা বিজ্ঞান নহে। শিক্ষার্থী যাহা জানে তাহার উপর নির্ভর করিয়া ঘটনাটিকে আনিলে সুবিধা হয়। শিক্ষার্থী প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলি পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যাখ্যা করিলে শিক্ষার্থী নিজেই স্পঞ্জ কোন্ বিভাগে পড়িবে তাহা বলিতে সক্ষম হইবে।

(৫) ফলের নির্ভরযোগ্যতা :—অনেক সময় লেখচিত্রের মাধ্যমে ফলের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়। দোলকের দৈর্ঘ্যের নীতি পরীক্ষার সময় বিভিন্ন মাপ ও সময়কাল পাওয়া গেল। $L - T^2$ লেখচিত্রে স্থাপন করিয়া দেখা গেল যে একটির স্থানাঙ্ক লেখচিত্রের (সরল রেখার) উপরে স্থাপিত হইতেছে না। এখন কি করা যাইবে? তীক্ষ্ণধী নিশ্চয়ই ঐ দৈর্ঘ্যের পরীক্ষাটিকে আবার পরীক্ষা করিতে বলিবে। যদি তাহাতেও না হয়, তখন হয়ত এই ব্যতিক্রমের কারণ অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিবে এবং প্রয়োজন হইলে ধারণার মধ্যে ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হইবে।

(খ) সমর্থনযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গী এবং কল্পনা শক্তির উন্মেষ সাধন :—

(১) নীতিবোধ :—কোন একটি বিশেষ সূত্রকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন উদাহরণ যদি তাহাতে যুক্ত করা যায় তবে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটে। ইহাতে যে সূত্রই কেবল দৃঢ় হয় তাহা নহে, সূত্রের বিস্তৃতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে সেই সূত্র সম্বন্ধে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটায়। নীচে একটি উদাহরণে সূত্রের ব্যাপক প্রয়োগ দেখান হইয়াছে।

অনুরণন (Resonance):—প্রতি কঠিন পদার্থের নিজস্ব কম্পনের সময়কাল আছে। যদি ঐ কাল অনুসারে ইহাকে ধীরে ধীরে নিয়ত আঘাত করা যায় তবে দেখা যাইবে যে তাহার কম্পনবেগ বাড়িয়া গিয়াছে। যেমন—

(১) দুই প্রান্ত আট্‌কানো একটি তক্তার মাঝখানে কেহ অনবরত লাফ্‌ দিতে থাকিলে তক্তার কম্পন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

(২) বাড়ির পাশ দিয়া গাড়ী যাওয়ার সময় জানালা বা দরজা কাঁপিতে থাকে।

(৩) দেওয়ালের উপর ঘুসি দিতে থাকিলে দেওয়ালের কম্পন শ্রুত হয়।

(৪) সেতুর উপর দিয়া চলিবার সময় অধিনায়ক সেনাদলকে মার্চ করিতে না দিয়া যথেচ্ছভাবে চলিতে নির্দেশ দেন।

(৫) ভূকম্পনের সময় প্রায়ই দেখা যায় যে মজবুত দৃঢ় গাঁথুনীর বাড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—অথচ কম মজবুত বাড়ি অক্ষত রহিয়াছে।

(৬) করোগেট টিনের পাশ দিয়া নির্দিষ্ট বেগে গাড়ী যাওয়ার সময় এক অত্যদ্ভুত শব্দ হয়। মনে হয় চার পাশে আরও গাড়ী এক সংগে চলিতেছে।

(৭) গায়িকার গানে সরবতের গেলাস ভাঙ্গিয়াছে এ নিদর্শনও মিলে।

(৮) কাগজে পাওয়া যায় resonance-এর জন্য এক ধনীর অতি সাধের বাগানবাড়ির দেওয়াল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

(৯) কোন পাহাড়ে বেড়াইতে যাওয়ার সময় পথপ্রদর্শক বলিয়াছিল যে কোন সুগায়ক তাহার গানের সুরে হিমানীসম্প্রপাত ঘটাইতে পারিত।

(১০) সেলাইকলে কাজ করিবার সময় একটি নির্দিষ্ট গতিতে কলের টেবলটি সজোরে কম্পিত হইতে থাকে।

এইরূপে কোন নীতির সহিত তাহার প্রয়োগ মিশাইতে পারিলে তাহা শিক্ষার্থীর মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(গ) **নির্ভরশীলতা ও অভিজ্ঞতা** :—শিক্ষার্থী দরদ দিয়া কোন পরীক্ষা করিল—তাহাকে অংকে প্রকাশ করিল বা সাধারণ সূত্রে পৌঁছাইল। পরে তাহার পার্শ্ববর্তী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ফল পেয়েছ ?" বা নিজেকে বিশ্বাস করিতে অসমর্থ হইয়া শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, এ পরীক্ষার ঠিক উত্তর কত ?" শিক্ষকের উত্তর হবে, "তুমি কত পেয়েছ ? তুমি কি ঠিক ঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছ ? অংক কি নিয়ম মত ক'ষেছ ? যন্ত্রঘটিত ভুলের হিসাব কি নিয়েছ ?" প্রয়োজনমতে শিক্ষক আর একবার হয়ত পরীক্ষাটি পর্যবেক্ষণ করিতে বলিবেন ; কিন্তু তাহার পরে শিক্ষার্থী যদি একই ফল পায় তবে সে যেন দৃঢ়তার সংগে সিদ্ধান্তে আসে যে এ তাহারই ফল—অপরের নহে।

শিক্ষার্থী তখনও ঠিক উত্তরের জন্য প্রশ্ন করিলে শিক্ষক কোন বই দেখিয়া উত্তরটি বলিবেন। কিন্তু সংগে সংগে এও জানাইয়া দিবেন যে তাহা বিভিন্ন অবস্থার গড় উত্তর স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী সা ধারণ পরীক্ষায় তাহা হইতে কিছু ভিন্ন ফল পাইলে হতাশার কোন কারণ নাই। যে সকল পরীক্ষা বিশেষ বিজ্ঞান

বিশেষজ্ঞ দ্বারা সীমিত পরিবেশে পরীক্ষাগারে সম্পন্ন হইয়া ঐ গড় ফল প্রদান করিয়াছে, সাধারণ পরীক্ষাগারে নূতন শিক্ষার্থীর কাছে সে ফল আশা করা অনুচিত। শিক্ষার্থীকে মনে করাইতে হইবে যে এ পরীক্ষা তাহার নিজের এবং এ ফল তাহারই। তবেই সে অভিজ্ঞ হইবে এবং আত্মনির্ভরশীল হইয়া উৎসাহের সহিত নির্ভয়ে নূতন পরীক্ষা হাতে লইবে।

(ঘ) **সততা :**—শিক্ষক নিজে যখন পরীক্ষা করিবেন তখন তিনি নিজের ফলের উপর আস্থাবান হইবেন। শ্রেণীতে পরীক্ষা দেখাইবার কালে যদি ফল আশানুরূপ না হয় তখন বাজে ওজর দেখাইয়া বা গোঁজামিল দিয়া ফল মিলাইবেন না। স্পষ্ট স্বীকার করিবেন তাঁহার কোথায় ত্রুটি হইয়াছে। ইহাতে শ্রেণীর কাছে হয়ত একটু বিব্রত বোধ করিতে পারেন; কিন্তু পরিণামে ফল শুভ হইবে। তাঁহার সততার জন্য শিক্ষার্থীর মনে অধিকতর শ্রদ্ধা জন্মিবে!

পরীক্ষাতে সব সময় নিখুঁত ফল বা প্রমাণ নাও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যাহাই হউক না কেন তাহা নিঃসংকোচে স্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক—'শব্দ বায়ুর মাধ্যমে পরিবাহিত হয়'—পরীক্ষাটি। বেল্‌জারের ভিতর বৈদ্যুতিক ঘণ্টা রাখিয়া বায়ুনিষ্কাসন যন্ত্রের সাহায্যে বেল্‌জারকে বায়ুশূন্য করা যাইতে থাকিল। শব্দ ক্রমে কমিতে লাগিল। কিন্তু একেবারে শব্দবিহীন করা সহজে সম্ভব নয়; কারণ বেল্‌জারকে একেবারে বায়ুশূন্য করা সহজে সম্ভব হয় না। এই পরিস্থিতিতে দ্বিধাহীন চিত্তে শিক্ষক ঘোষণা করিতে পারেন যে বায়ু কম করাতে শব্দ কমিয়াছে—আরও কম করিলে শব্দও কমিল; তবে যেহেতু কোন স্থান বায়ুশূন্য করা সহজে সম্ভবে না, তাই ঐ ঘণ্টাকে সম্পূর্ণ শব্দহীন করা গেল না। কিন্তু একথা আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করিব যে শব্দের বাহন বায়ু।

নিজের অজ্ঞতা বা অকৃতকার্যতা স্বীকার করিলে তাহাতে অসম্মান নাই। অস্বীকার করিলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে।

(ঙ) **দায়িত্ববোধ** :—যখন শ্রেণীতে কোন পরীক্ষা চলে তখন শিক্ষকের মনে করা উচিত নয় যে পরীক্ষা তিনিই করিতেছেন। এই পরীক্ষা তাঁহার নিকট যেমন শিক্ষার্থীর নিকটও তেমনই। তিনি পাঠদানকালে পরীক্ষা আবিষ্কার করিতেছেন তাহা নহে—ইহা পুনরাবিষ্কার মাত্র। সেখানে যে সকল বৈজ্ঞানিক জীবনব্যাপী সাধনার ফলে ঐ সত্যে পৌছিয়াছেন তাঁহাদের কথা উল্লেখ করার দায়িত্ব শিক্ষকেরই। প্রদর্শনীতে ছাত্র ছাত্রী প্রদত্ত ছবি, চার্ট, মডেল তাঁহার কৃতিত্বের ফলে হইয়াছে এ ভাব যেন মোটেই প্রকাশ না পায়। এর জন্য কৃতিত্ব শিক্ষার্থীর—তিনি উপলক্ষ্য মাত্র।

(চ) **সুসংবদ্ধতা** :—শিক্ষার্থীকে তাহার পার্শ্ববর্তী বন্ধুদের পরীক্ষালব্ধ বিভিন্ন ফলের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং তাহা হইতে সে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছায়। বিপরীত পক্ষে তাহার বন্ধুরাও অনুরূপ সাহায্য প্রত্যাশা করে। ফলে সকলেই শ্রেণীকে কিছু দিবার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করে। এইভাবে সমগ্র শ্রেণীটিতে এক সুসংবদ্ধ বন্ধুভাব গড়িয়া উঠে। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে এমনভাবে গঠিত করিবেন যাহাতে বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে একান্ত প্রয়োজনীয় গুণ—সুসংবদ্ধতা ও দায়িত্ববোধের উন্মেষ সাধিত হইবে ; ইহা শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র শ্রেণীতে নয়—সমাজে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিক্ষণে—সুনাগরিক হিসাবে জীবনের মূল্যবান দিনগুলি কাটাইতে সাহায্য করিবে।

(ছ) **বিজ্ঞান প্রীতি ও আগ্রহ সৃষ্টি** :—বৈজ্ঞানিক নূতন কিছু আবিষ্কারে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রকৃতির রহস্যোৎঘাটনের অহঃরহ প্রচেষ্টার জন্য জনসমাজে সমাদৃত। কোথা হইতে এই শক্তি আসিয়া তাঁহাকে সর্বক্ষণ কর্মে আবিষ্ট করিয়া রাখে? এই পৃথিবীতে যে সকল লোক নিজেদের চেষ্টায় জগতের জ্ঞানভাণ্ডার সাধারণ মানুষের কাছে পৌছাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করেন যে তাঁহাদের এই অদম্য উৎসাহ তাঁহাদের শিক্ষকের নিকট হইতে পাইয়াছেন। জ্ঞান অপেক্ষা শিক্ষকের উদ্দীপনা নিঃসন্দেহে শিক্ষার্থীর মধ্যে অধিকতর সঞ্চালিত হয়। যে শিক্ষকের

নিজের কল্পনাশক্তি বা উৎসাহ নাই শিক্ষার্থীর মধ্যে তিনি বিজ্ঞানের রসসঞ্চার করিবেন কিরূপে? আবেগসঞ্জাত প্রবণতা না থাকিলে বিজ্ঞানের উপলব্ধি পুরাপুরিভাবে হইতে পারে না। আবেগপূর্ণ এবং বুদ্ধিসঞ্জাত দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষার্থীর আছে। তাহারা বিজ্ঞান পড়িতে উৎসুক; কিন্তু শিক্ষকের উপর অশ্রদ্ধা বা উদাসীনতা তাহাকে ব্যক্তি হইতে বিষয়ের উপর অশ্রদ্ধা জন্মাইতে সাহায্য করে। সেইজন্য শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। তিনি উদার ও সহযোগিতার মনোভাব লইয়া প্রকৃতির অতুলনীয় আশ্চর্যের রহস্যোৎঘাটন করার আনন্দের ভাগ শিক্ষার্থীকে দিবেন এবং শিক্ষার্থীও প্রকৃতির অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রে স্নান করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ দান ভক্তি ও বিস্ময় সহকারে অঞ্জলিপুটে গ্রহণ করিবে। প্রতি শিক্ষককে ইহার জন্য পরিকল্পনা ও কাজ করিতে হইবে—আশা এবং তপস্যা করিতে হইবে। ইহার বেশী কিছু তিনি করিতে পারেন না—আবার কম করাও উচিত নয়।

বিজ্ঞানের জ্ঞানালোকে শিক্ষার্থীর মন উদ্ভাসিত করিবার জন্য বিষয়ের উপর শিক্ষকের বিশেষ দখল থাকা দরকার। যেমন কেহ যদি প্রশ্ন করে, "জীববিদ্যা অধ্যয়ন করিব কেন?"—এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর হইতে পারে। যেমন—(ক) কৃষি এবং পশুপালনের পদ্ধতি উন্নত করার জন্য, (খ) ব্যক্তি এবং সমাজের সকলের স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং দুর্বলতা ও রোগ নিবারণের জন্য, (গ) শিক্ষার্থীর পরিবেশ পরিচিতি এবং তাহাকে আয়ত্তে আনয়ন করার কৌশল শিক্ষা লাভের জন্য, (ঘ) বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হৃদয়ঙ্গম করিতে, বশে আনিতে এবং তাহাদিগকে কাজে লাগানর জন্য, (ঙ) শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ শক্তিকে বর্ধিত করার জন্য, (চ) বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে সুশৃঙ্খলরূপে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য, (ছ) প্রাকৃতিক সম্পদের সৌন্দর্য আহরণের জন্য; এ ছাড়া অসংখ্য কারণ বিদ্যমান। পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা হইতে জীববিদ্যার মূলগত পার্থক্য এই যে সে জীবন লইয়া কারবার করে—সেখানে জীব জন্মায়—বাড়ে এবং মৃত্যুমুখে পরিণত হয়। রহস্যের মধ্যে তাহার সৃষ্টি এবং রহস্যেই তাহার জীবনের অবসান।

'পথের পাচালী' ছায়াচিত্রের বিভিন্ন অংশকে যদি যথেচ্ছভাবে সজ্জিত করিয়া

থামিয়া থামিয়া দর্শককুলকে দেখান হয়, তাহা হইলে সেকালের গ্রাম্য পরিবেশে বর্ধিত সরল অনাড়ম্বর অকৃত্রিম শিশু 'অপু'র ছবিকে কি দর্শককুলের মনে প্রতিফলিত করা সম্ভব হইবে? জীবনের একটি ধারা আছে। ধারাবাহিকতার ভিতর দিয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি জীবনের সহিত—সমগ্রের সহিত গ্রথিত হইয়া যায়। এই পারস্পরিক সম্পর্কের বিচ্যুতি ঘটিলে অসংলগ্ন ঘটনাসমূহ নিরর্থক হইয়া পড়ে। সেইরূপ জীববিদ্যার বিষয়গুলিকে এক সামগ্রিক সূত্রে সম্পর্কযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রক্তের উপাদানগুলিকে পড়াইলে হইবে না—দেহের বিভিন্ন কাজের সংগে রক্ত কিরূপভাবে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে তাহাও গোচরীভূত করাইতে হইবে। নিত্য নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতা-প্রসূত ঘটনা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া বিষয়বস্তুকে সমৃদ্ধ ও আগ্রহসৃষ্টিকারী করিতে তুলিতে হইবে। অনুসন্ধানী মন লইয়া পরিবেশ পরিচিতি সেখানে বিশেষ সাহায্যকারী। ফুলকে শিক্ষার্থী পৃথকরূপে পর্যবেক্ষণ করিবে না। কিছুদিন পূর্বে সে গাছে একটি বৃন্তের উপর কুঁড়ি ছিল—বৃতি দ্বারা সর্বাংগ ঢাকা। জীবনের শক্তি অন্তর হইতে তাহাকে প্রেরণা জোগাইয়াছে। বৃতিকে নির্মমভাবে ভেদ করিয়া সে তাহার সুন্দর পাপড়িগুলি সূর্যের আলোতে মেলিয়া ধরিয়াছে। সম্মোহনী শক্তি লইয়া সে আকর্ষণ করিয়াছে প্রতিবেশীকে বা নিজেই নিজের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষায়—জীবন প্রীতিতে সেই ফুল ফলে পরিণত হইয়াছে। নূতন জন্ম লাভ করার সে এক বিস্ময়কর প্রস্তুতি। ফুল তাহার কর্তব্য শেষ করিয়া যে মাটি তাহাকে পুষ্টির বিভিন্ন সামগ্রী দিয়া পালন করিয়াছে—সেই মাটির উপরেই সে ঝরিয়া পড়িল। এই ফুলকে যখন শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ করিবে তখন ফুলকে খণ্ডিতভাবে দেখিবে না। দেখিবে এক প্রবহমান জীবনস্রোতে বর্ধন ও পরিবর্তনের এক অখণ্ড মুহূর্তে। তাই জীববিদ্যা জীবনপ্রবাহের ইতিহাস বহন করিয়া চলিয়াছে।

(জ) **সমাজ সেবা**:—শিক্ষার এক উদ্দেশ্য হইতেছে—ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ এবং সমাজের কারণে ব্যক্তির আত্মনিয়োগ। বিজ্ঞান শিক্ষার ভিতর দিয়া শিক্ষক শিক্ষার্থীর সমাজসেবার মনোভাব সৃষ্টি করিবেন। বিজ্ঞান শ্রেণীতে

টুক্‌রা টুক্‌রা কাজের মাধ্যমে এই মনোভাব কিরূপে সহজেই সৃষ্টি করা যায় নীচে তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

আবহাওয়ার তালিকা রক্ষণ :—দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে যদি সুপরিকল্পিত করিতে হয় তবে ঐ দেশের আবহাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কোন এলাকার গড় বৃষ্টিপাত, বৎসরের বিভিন্ন মাসে বৃষ্টির পরিমাণ, বিভিন্ন ঋতুতে গড় উষ্ণতা, বাতাসের আর্দ্রতা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। কৃষি-বিভাগ শস্য উৎপাদনের নিমিত্ত, বন-বিভাগ নূতন বৃক্ষ রোপণের জন্য, প্রণালিকা-সিঞ্চন-বিভাগ জল রক্ষণ ও বণ্টনের জন্য, চিকিৎসা-বিভাগ আবহাওয়ার তালিকা তুলনা করা ও ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ নিবারণের জন্য এই সকল বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেন।

বিদ্যালয়ে এই সকল বিষয়ের তালিকা সংরক্ষণ করা উচিত। শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করিতে, পরিমাপ লইতে শিক্ষা করিতে হইবে। পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীকে এই কাজে ভার দিলে কোন দিন কাজ অবহেলিত হইবে না। ইহাতে তাহাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পাইবে এবং পুরস্কার ব্যতিরেকে যে সামাজিক কাজ করিতে হয় সে শিক্ষাও লাভ করিবে।

উর্ধ্বতম ও নিম্নতম এবং শুষ্ক ও আর্দ্র তাপমান যন্ত্র বাহিরে বাক্সের (যাহার মধ্যে বায়ু চলাচল করে) মধ্যে রাখিতে হইবে। প্রত্যহ একই সময়ে যন্ত্রগুলির পরিমাপ লইতে হইবে ও দরকারমত নূতন করিয়া সজ্জিত করিতে হইবে। খোলা স্থানে মাটি হইতে এক ফুট উচ্চে বৃষ্টি-মাপক যন্ত্র বসাইতে হইবে এবং দৈনিক পরিমাপ লইতে হইবে। এইরূপে চাপমান যন্ত্রে বায়ুর চাপ, শুষ্ক ও আর্দ্র তাপমান যন্ত্রে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতার হিসাব প্রত্যহ রাখিতে হইবে। বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের ব্যবহার বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শিখাইতে হইবে।

এইরূপে বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার তালিকাবদ্ধ করিয়া একটি তালিকা নোটিশ বোর্ডে এবং আর একটি আবহাওয়া-অফিসে জমা দিতে হইবে। এইভাবে বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও সমাজসেবার আগ্রহ জাগরিত করা যায়।

বিজ্ঞান শিক্ষাদানে উপকরণের উপযোগিতা

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মানসিক যে কোন কার্যের ভিত্তি হইল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা। সর্বপ্রকার মানসিক কার্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে সংঘটিত হয়। মানুষ সাধারণতঃ তিন প্রকারে অভিজ্ঞতা অর্জন করে—(১) প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, (২) ছবি বা কোন বস্তুর অবস্থা, সম্পর্ক প্রভৃতি নির্দেশক কোন প্রদর্শনী দ্বারা, এবং (৩) লিখিত বা মৌখিক শব্দ বা প্রতীক দ্বারা। বলা বাহুল্য যে তৃতীয় পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা অর্জনের পূর্বে প্রথম পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা অর্জন অপরিহার্য। বিজ্ঞানে আমরা বিশেষতঃ ঘটনা ও ধারণা লইয়া ব্যস্ত থাকি। ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে আমরা ঘটনা—ঘটনা হইতে ধারণা এবং পরে তথ্য ও আইনে পৌছাই। সুতরাং বিজ্ঞানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণের উপযোগিতা সর্বাপেক্ষা বেশী অনুভূত হয়। চীনে এক প্রবাদ আছে, "একটি ছবি দশ সহস্র শব্দের মান বহন করে।"

কোন জ্ঞানী লোক সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে না—সেইরূপ কোন বিজ্ঞ শিক্ষক উপকরণকে অবহেলা করেন না। উপকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি নীতি অনুসরণ করা উচিত। এখানে তাহা আলোচিত হইতেছে।

(১) শ্রেণীতে উপকরণ শিক্ষার্থীর নিকট খেল্না নয় যে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীকে চমক লাগাইবে। ইহাদের মধ্যে কাজ ও চিন্তার খোরাক অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। শিক্ষার্থীকে অধিকতর কর্মে উদ্দীপনা জোগাইতে উপকরণের দান অনস্বীকার্য।

(২) বয়স এবং বুদ্ধির মাত্রার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপকরণ ব্যবহার করিতে হয় যাহাতে শিক্ষার্থী সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। কারণ উপকরণ দেখাইলেই যে শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা লব্ধ হইবে ইহা ঠিক নহে। শিক্ষার্থীর মানসিক পুষ্টি এবং অধীত অভিজ্ঞতার উপর তাহা নির্ভর করে। তাই বিজ্ঞান শিক্ষককে এই সব ব্যবহারের যাথার্থতা নির্ণয় করিয়া উপকরণ ব্যবহার করিতে হয়।

(৩) উপকরণ মৌখিক বা লিখিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিকল্প নয়—অন্যান্য শিক্ষা পদ্ধতির পরিপূরক হিসাবে কাজ করে।

(৪) বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকারিতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপকরণ ব্যবহার করা উচিত। মূল বা কাণ্ডের cross section, মডেলে না দেখাইয়া মূল বা কাণ্ডকে আড়াআড়িভাবে কাটিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সম্মুখে রাখিয়া দেখান অনেক বেশী কার্যকরী। সুতরাং কোন্ ধরণের উপকরণ কখন দেখান উচিত তাহা শিক্ষক পূর্ব হইতে নির্ধারণ করিবেন।

বিচক্ষণতার সহিত উপকরণের ব্যবহার করা এবং তাহাদিগকে ঠিক মত সজ্জিত রাখা উচিত। শিক্ষাদানকালে কখন এবং কি কি উপকরণের প্রয়োজন হইবে তাহা পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে। বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী কয়েকটি উপকরণের আলোচনা এখন করা হইতেছে।

(১) **যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জাম** :—পাঠদানে অন্য শিক্ষক অপেক্ষা বিজ্ঞান শিক্ষকের বেশী সুযোগ রহিয়াছে। কারণ তিনি পাঠদানকালে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বা সাজ সরঞ্জামের সাহায্য লইতে পারেন। কোন বস্তুর মডেল বা যন্ত্রপাতি তিনি এমনভাবে সাজাইয়া পাঠদান করিবেন যে শিক্ষার্থী যেন সমুদয় অংশ স্পষ্টভাবে দেখিতে পায়। খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলি কাঁচের আলমারি বা তাকে সাজাইয়া রাখিয়া নীচে তাহাদর নাম লিখিয়া রাখিতে হয়। 'রি-এজেণ্টের' বোতল প্রভৃতি অন্যান্য সামগ্রী খোলা 'র‍্যাকে' সাজাইয়া রাখাই ভাল।

(২) **ব্লাকবোর্ড** :—ব্লাকবোর্ড শ্রেণীর একটি অতি সাধারণ অথচ অপরিহার্য সামগ্রী। বিজ্ঞান শিক্ষককে তাহা কার্যকরীভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। শ্রেণীতে তাঁহার কাছে সকল সময় রঙ্গীন খড়ি থাকিবে। বিশেষ বিশেষ চিত্রে রঙ্গীন খড়ি বিশেষ অংশকে শিক্ষার্থীর নিকট খুব স্পষ্ট করিয়া তোলে। মানুষের পেটের বা বুকের বিভিন্ন অংশ রঙ্গীন খড়ি দিয়া আঁকিলে তাহা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। গাছ এবং তাহার বিভিন্ন অংশ আঁকিবার সময় বিভিন্ন রংয়ের খড়ি ব্যবহার করা যাইতে পারে। শিক্ষকের বোর্ডের কাজ পরিচ্ছন্ন, নির্ভুল এবং ধারাবাহিক হইলে তাহা শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চালিত হইতে পারে। কোন বিষয়

আলোচনার সময় শিক্ষক এক একটি পর্যায় বা নীতি বোর্ডে ধারাবাহিকভাবে লিখিবেন, পরীক্ষার বিভিন্ন ফল বোর্ডে তালিকাবদ্ধ করিবেন, কতটা ভ্রান্তি হইল তাহা নির্ধারণ করিবেন এবং সিদ্ধান্তগুলি শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় বোর্ডে লিপিবদ্ধ করিবেন। প্রয়োজনমতে শিক্ষক লেখচিত্রের সাহায্য লইবেন।

(৩) **চার্ট, মডেল ও ছবি** :—জীববিদ্যার চার্ট ও মডেল ভাল প্রতিষ্ঠান হইতে ক্রয় করা উচিত। কিন্তু বেশীর ভাগ চার্ট বিজ্ঞান শিক্ষক তৈরী করিলে ভাল হয়। অবশ্য তিনি এ বিষয়ে শিক্ষার্থীর সাহায্য গ্রহণ করিবেন। চার্টের কালি খুব স্পষ্ট হওয়া দরকার। লেখাগুলি বড় অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। প্রয়োজনীয় সকল তথ্যই সেখানে থাকিবে। নিজে চার্ট তৈরী করিলে কোন বিশেষ পাঠের উপযোগী করিয়া তৈরী করা যায়; ফলে অপ্রয়োজনীয় অংশ চোখের পীড়া সৃষ্টি করে না। বিশেষ বিশেষ পাঠে বিশেষ বিশেষ চার্ট তৈরী করিলে পাঠ একঘেয়ে ঠেকে না। ভিতরের যন্ত্রপাতি যেমন—টেলিগ্রাফ, স্ফেরো-মিটার, মানব দেহেব বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি দেখাইবার জন্য বিশেষ ধরণের উচ্চাঙ্গের চার্ট দরকার।

মডেলের মান চার্ট হইতে কিছু কম নয়। অনেক সময় চার্টে সব জিনিস পরিষ্কারভাবে বুঝান যায় না। তখন মডেলের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মডেলের দাম অত্যন্ত বেশী। তাই যতদূর সম্ভব বিদ্যালয়ে মডেল তৈরী করা দরকার। ইহাতে শিক্ষার্থী হাতের কাজ করিবার সুযোগ পায়—দীর্ঘ দিন বিষয়টিকে মনে রাখিতে পারে এবং তাহাদের সৃজনী শক্তি বৃদ্ধি পায়।

বৈজ্ঞানিক ঘটনার বা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের ছবি শ্রেণীতে একটি অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ। এগুলি শ্রেণীতে একটি বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে। ছবির সাহায্যে পাঠদান করিলে পাঠ জীবন্ত হইয়া উঠে। শিক্ষার্থী যেন সত্য সত্যই সেই বৈজ্ঞানিক পরিবেশে উপস্থিত হয় এবং নিজে সেই বৈজ্ঞানিকের ভূমিকা গ্রহণ করে। ছবি যেন খুব স্পষ্ট, বাস্তব এবং কৌতুহলদ্দীপক হয়। একটি ছবি একটি তথ্য পরিবেশন করিবে, নতুবা বিবিধের মাঝে আসল উদ্দেশ্য

হারাইয়া যাইবে। শিক্ষার্থীকে বৃত্তাকারে ছবি দেখান উচিত—যেন প্রতি শিক্ষার্থী প্রতি ছবি নিখুঁতভাবে দেখিতে পায়।

(৪) **দ্রষ্টব্য উপকরণ—ফিল্ম্, ফিল্ম্ ষ্ট্রিপ এবং স্লাইড প্রভৃতি:—** বিভিন্ন ধরণের ফিল্ম্ এবং ফিল্ম্‌ষ্ট্রিপ দেখানর জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রজেক্টর, ম্যাজিক লণ্ঠন এবং একটি এপিডায়াস্কোপ থাকিলে ভাল হয়।

ফিল্ম্ : সাধারণতঃ দুইটি কারণে ফিল্ম্ ব্যবহৃত হইতে পারে। (ক) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বৈজ্ঞানিক নীতির প্রয়োগ বা তাহার ব্যবহারিক উপযোগিতা কিরূপ চলিতেছে তাহা দেখাইবার জন্য ফিলি্ম্ ব্যবহার করা যাইতে পারে। (খ) শ্রেণীতে পাঠদানকালে অন্যান্য সামগ্রীর পরিপূরকভাবে ফিল্ম্ দেখান যাইতে পারে।

প্রথমোক্ত ব্যবহারটি সকল বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য। ম্যালেরিয়া কেমন ভাবে বিস্তার লাভ করে বা তাহাকে কিরূপে নিবারণ করা যায়—স্পুটনিক কিরূপে আকাশপথে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহার অসুবিধায় বা কি কি—সামাজিক পরিবেশ স্বাস্থ্যপ্রদ রাখিতে হইলে কি কি অবশ্য করণীয় বা কি সামাজিক জ্ঞান দরকার প্রভৃতি বিষয়ে সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে একত্রে ফিল্ম্ দেখান যাইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহারে বিশেষ পাঠে বিশেষ ফিল্মের ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে। পূর্বে ফিল্ম্‌টি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিয়া পরে ফিল্ম্‌টি দেখাইলে তাহা কার্যকরী হয়। সাবান তৈরী বা কঠিন জলকে নরম করার পদ্ধতি, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার প্রভৃতি ফিল্মের সাহায্যে দেখান যাইতে পারে। এ ছাড়া উদ্ভিদ্‌বিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতিতে বিভিন্ন ধরণের ফিল্ম্ ব্যবহার করা যাইতে পারে। "শান্তির জন্য অণু"—ফিল্ম্‌টি শিক্ষার্থীর পক্ষে দুরূহ হইলেও শিক্ষার্থী ঐ বিষয়ে একটি সাধারণ জ্ঞান পাইতে পারে।

ফিল্ম্ ব্যবহারের পূর্বে শিক্ষককে পূর্বে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইতে হয় এবং ধারাবাহিক পর্যায়গুলি মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিতে হয়। ফিল্ম্ ব্যবহারের পূর্বে অল্প বিবরণ দান এবং পরে সারাংশ তৈরী করিতে হয়।

ফিল্‌ম্ ষ্ট্রিপ :—ইহার সাহায্যে কোন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় আলাদা আলাদা করিয়া দেখান যায়। সুতরাং ফিল্‌মে গোটা ছবিটি দেখানর পর যদি কোন বিশেষ অংশ বেশীক্ষণ ধরিয়া দেখানর প্রয়োজন হয় তবে ফিল্‌ম্‌ষ্ট্রিপের সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের প্রতিটি পর্যায়, মশকের রূপান্তর, বিভিন্ন ধরণের কপিকলের (pully) কার্যপ্রণালী ইহার সাহায্যে দেখান যাইতে পারে।

ল্যাণ্টার্ণ স্লাইড :—নিজের ইচ্ছামত ছবি দেখাইতে ল্যাণ্টার্ণ স্লাইড বিশেষ উপযোগী। ফিল্‌ম্‌ষ্ট্রিপের ন্যায় ইহা নির্দিষ্টভাবে স্থায়ী সজ্জিত নয়। রক্তের ফোঁটা, শিকড়, কাণ্ডের খণ্ডিত অংশ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ দুই কাঁচের মধ্যে রাখিয়াই স্লাইড করা যায়। ইহা খুব সস্তা এবং সহজে তৈরী করা যায়।

এপিডায়াস্কোপ :—ইহার সাহায্যে অস্বচ্ছ পদার্থ, যেমন—বই-এর পৃষ্ঠা বা ছবি, চিত্র, জীববিদ্যার কোন নমুনা চিত্র প্রভৃতি দেখান যাইতে পারে। তীব্র আলো থাকার জন্য ইহাতে ছবি এত উজ্জ্বল হয় যে ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার করার দরকার হয় না।

মাইক্রো-প্রজেক্টর :—ইহার সাহায্যে কোন অণুবীক্ষণ স্লাইডকে দেওয়ালে দেখান যায় (তাহাতে শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থী উপভোগ করিতে পারে); আবার কোন বেঞ্চের উপর দেখান যায় (সেখানে সাদা কাগজ রাখিয়া অনায়াসে চিত্র নকল করা যাইতে পারে)। ইহা ব্যবহার করার সময় ঘর অন্ধকার করিতে হয়।

ছোট ছোট বিদ্যালয়ে উক্ত সকল প্রকার উপকরণ রাখা সম্ভবপর নয়। এই বিষয়ে সরকারের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে আমাদের দেশে এজন্য এক ভ্রাম্যমাণ শিক্ষা সংস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ছবি, চিত্র বা স্লাইড ঠিক মত পরিবেশিত হইলে এই প্রচেষ্টা অনেকখানি কার্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয়। গণ-শিক্ষার বিষয়বস্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকেও যথেষ্ট খবর প্রদান করিবে।

(৫) আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষক সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া শিক্ষার্থীর জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন, শ্রেণীর বিভিন্ন কাজের মধ্যে সম্ভাব্য অনুবন্ধ সৃষ্টি করেন, এবং শিক্ষার সম্পূর্ণতা ঘটাইয়া শিক্ষার্থীকে সামাজিক করিয়া তোলেন। বিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য লাভ করিতে যতটুকু সংযোগ রক্ষা দরকার শিক্ষক কেবল ততটুকুর সাহায্য গ্রহণ করিবেন। কি সহর, কি নগর, কি গ্রাম সর্বত্রই সেই সুযোগ আছে। আগ্রহী শিক্ষককে তাহার পূর্ণ সুযোগ লইতে হইবে। বিজ্ঞান পাঠদানের সংগে যে প্রতিষ্ঠানগুলি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাহাদের কয়েকটির নাম নীচে প্রদত্ত হইল।

(ক) মিউজিয়াম, যাদুঘর প্রভৃতি।
(খ) উড়োজাহাজের অফিস।
(গ) রাসায়নিক এবং অন্যান্য সংস্থা।
(ঘ) বেতার, টেলিফোন এবং বৈদ্যুতিক অফিস।
(ঙ) ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা।
(চ) আবহাওয়া অফিস।
(ছ) পাখীর বাসস্থান।
(জ) বড় উদ্যান, খালি মাঠ, বন বা কারখানা।
(ঝ) খনি।
(ঞ) হ্রদ বা সামুদ্রিক তটভূমি।
(ট) গুহা এবং অভিনব প্রাকৃতিক দৃশ্যের স্থান।
(ঠ) বড় পুষ্করিণী, নদী বা সাগর।
(ড) পর্যবেক্ষণ অফিস।
(ঢ) বড় বাজার বা গুদাম।
(ণ) প্রমোদ উদ্যান এবং ফুলের চাষ।
(ত) স্বাস্থ্য এবং ঐ সংক্রান্ত বিভাগ।
(থ) জল সরবরাহ কেন্দ্র।
(দ) দুগ্ধ কেন্দ্র।

(ধ) দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বা খালি চোখে দৃশ্যমান তারকারাজি।

(ন) প্রদর্শনী।

(প) শিক্ষা সংক্রান্ত সভা সমিতি।

বিজ্ঞান শিক্ষায় ভ্রমণ একটি বিশেষ শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা। বিজ্ঞান শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি—এই অধ্যায়ে (৮৮ পৃঃ) সে বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত স্থানসমূহ প্রচুর বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রদান করে। অনেক সময় ঐ সকল স্থানে মূল্যবান গ্রন্থও পাওয়া যায়। পূর্বে শিক্ষক ঐ সকল স্থানে নিজে গিয়া দেখিয়া আসিবেন। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি শিক্ষার্থীকে সেই স্থানের একটি ভূমিকা দিবেন এবং নিম্ন বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা বা ব্যবস্থাবলম্বন করিবেন।

(ক) গমনের উদ্দেশ্য।

(খ) যেখানে যাওয়া হইতেছে সেখানকার কর্তৃপক্ষের অনুমোদন।

(গ) কি কি জিনিস দর্শন করিতে যাইতেছে।

(ঘ) সেখান হইতে কি কি সংগ্রহ করা যায়।

(ঙ) সেই স্থানের বিবরণ।

(চ) সাহায্যকারীকে কি কি প্রশ্ন করিতে হইবে।

(ছ) ফিরিবার পর শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ মতের আদান প্রদান।

(জ) লিখিত বিবরণ পাঠ ও সমালোচনা।

(ঝ) গমনের মূল্যায়ন।

বৎসরে অন্ততঃ একটি করিয়া এইরূপ ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া উচিত। অবশ্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকার এই বিষয়ে অগ্রণী হইবেন এবং আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন।

(৬) **বিদ্যালয়ে যাদুঘর**ঃ—পশুপক্ষী কীট পতঙ্গকে প্রকৃতির মাঝে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলে কত না আনন্দ হয়। রহস্যময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে সঞ্চরণশীল প্রাণী একটি অপূর্ব আবহাওয়া সৃষ্টি করে। গণ-শিক্ষায় সে সুযোগ

কোথায়? ধনী ছাড়া সে আনন্দ উপভোগ সাধারণের ভাগ্যে জোটে না। তাই প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাণী বা জিনিসকে যদি বিদ্যালয়ে আনা যায় তবে ক্ষুধা কিছুটা মিটিতে পারে। তাই বিদ্যালয়ে জাদুর উপযোগিতা বহুল পরিমাণে উপলব্ধ হইয়াছে। এই জাদু কেবল যে পাঠের পরিপূরক হিসাবে কাজে লাগিবে তাহা নয়, বিদ্যালয়ে যাদু এক প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিবে। বিজ্ঞানে এই পরিবেশ সৃষ্টির মূল্য অনস্বীকার্য।

বিভিন্ন আলমারি বা পাত্রে নমুনাগুলি ধারাবাহিক ভাবেসজ্জিত থাকিবে। বৎসরের পর বৎসর শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক সংগৃহীত নমুনায় জাদু ভরিয়া উঠিবে এবং নূতন শিক্ষার্থীর মনে উৎসাহ ও আগ্রহ সঞ্চার করিবে। প্রয়োজনমত পুরাতন, ভগ্ন বা নষ্ট নমুনাগুলি অপসারিত করিয়া নূতন নমুনাকে স্থান দিতে হইবে। দুইটি বিষয় জাদু প্রস্তুতিতে মনে রাখিতে হইবে—(১) ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত করা, এবং (২) প্রতি নমুনায় স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে নামাঙ্কিত করা। জারে সংরক্ষিত সাপের পাশে ঝিনুক বা স্থানীয় খনিজের পাশে বেতারের বাল্‌ব্‌ রাখা অযৌক্তিক। প্রতি নমুনার সঙ্গে একটি করিয়া পরিচয়-পত্র (৫"/৪") সংযুক্ত থাকিবে। তাহাতে নিম্নলিখিত পরিচয় দেওয়া হইবে।

(ক) বৈজ্ঞানিক এবং সাধারণ নাম।

(খ) নমুনার পরিবার পরিচিতি।

(গ) প্রাপ্তিস্থান ও সংগ্রহের সময়।

(ঘ) সংগ্রহকারীর নাম।

(ঙ) প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা।

বিজ্ঞানে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলেও যেন সাধারণে বুঝিতে পারে এইরূপ ভাষায় পরিচয়-পত্র লেখা থাকিবে। মনে রাখা দরকার বাজে জিনিসে যেন জাদুঘর ভর্তি না হয়। কেবল অভিনবত্বের আশ্রয় লইলেই চলিবে না—সংগ্রহ যেন শিক্ষার্থীর মনে রেখাপাত করিতে পারে। ভাল জিনিস সংগ্রহ, তাদের ধারাবাহিক সজ্জা, ঠিকমত ব্যবহার শিক্ষাদানের অতুলনীয় পরিপূরক এবং জীবন্ত দৃষ্টান্ত। মাছ, ব্যাং, সাপ, কুমীর, বিভিন্ন কীট, পতঙ্গ, পাখী, পাখীর বাসা

ও ডিম, মূল, কাণ্ড, লতা, পাতা, ফুল, বীজ, বিভিন্ন ঘাস, মুদ্রা, খনিজ দ্রব্য, ইঞ্জিন, গাড়ি, হাতে-গড়া যন্ত্রপাতি, চার্ট, ছবি, মানবদেহ বা অন্যান্য মডেল, বিভিন্ন সংরক্ষিত নমুনা প্রভৃতি সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিতে হয়। এ ছাড়া মাছ রাখার একটি বড় অ্যাকুয়ারিয়াম থাকিলে ভাল হয়।

(৭) **বিদ্যালয়ে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি** ঃ—নিজ হাতে যন্ত্র তৈরী করার মধ্যে অস্বাভাবিক আনন্দ ও সন্তুষ্টি রহিয়াছে। আমাদের দেশে যেখানে বিজ্ঞান গৃহের সমস্যার এখনও সন্তোষজনক সমাধান মিলে নাই সেখানে প্রতি বিদ্যালয়ে সকল রকম যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সুদূরপরাহত। বেশী জটিল যন্ত্রগুলি ক্রয় করিয়া সহজ যন্ত্রগুলিকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের সমবেত চেষ্টায় খুব অল্প খরচায় তৈরী করা যাইতে পারে। শিক্ষকের উৎসাহ এখানে বিশেষ কার্যকরী হইবে। ভাঙ্গা, অব্যবহার্য, মূল্যহীন বিভিন্ন জিনিসের সাহায্যে শিক্ষার্থী যখন নিজ হাতে কোন যন্ত্র তৈরী করিবে এবং তাহা কাজ করিতেছে দেখিবে তখন সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে। নূতন উন্মাদনা তাহাকে আবার নূতন কিছু তৈরী করিতে প্রেরণা জোগাইবে। সে নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে। বিদ্যালয়ে তৈরী বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতিতে নিম্নলিখিত সুবিধা পরিলক্ষিত হয়।

(ক) ঐ সকল যন্ত্রে অধিকতর মানসিক শৃঙ্খলার সুযোগ ঘটে।

(খ) হাতের কাছে পাওয়া বাস্তব জিনিসের সাহায্যে ঐ সকল যন্ত্র তৈরী করিতে হয় বলিয়া জীবন ও পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রে অধীত বৈজ্ঞানিক নীতিগুলির সার্থক প্রয়োগ ঘটে।

(গ) শখ (hobby) হিসাবে শিক্ষার্থীকে এই কাজে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

(ঘ) জীবনের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয় গুণ, যেমন—অনুসন্ধিৎসা, কর্মপ্রয়াস, দৃষ্টিভঙ্গী, দক্ষতা প্রভৃতির উন্মেষ ঘটে।

(ঘ) বিভিন্ন বিজ্ঞানী কি প্রকার অসুবিধার মধ্যে কাজ করিয়া বিভিন্ন মূল্যবান তথ্যে উপনীত হইয়াছেন তাহার খানিকটা অনুধাবন করিতে পারে এবং নিজেকে "ক্ষুদে বিজ্ঞানীর" পর্যায়ে লইয়া আত্মতুষ্টি লাভ করে।

(৮) **বেতারের মাধ্যমে শিক্ষা**:—বর্তমান সময়ে বিশেষ করিয়া যুদ্ধের পর হইতে বেতারের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে শিক্ষামূলক আলোচনা, নাটক, গান, আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ, ইতিহাস প্রভৃতি বেতার কেন্দ্রে স্থান পাইতেছে। আজ বেতার কেবল চিত্ত বিনোদনের কাজে লাগে না—শিক্ষাদানের বিশেষ প্রয়োজনীয় বন্ধু হিসাবে অভিভাবক এবং শিক্ষকের কাছে আসিয়াছে। আমাদের দেশে "আকাশবাণীর" বিভিন্ন কেন্দ্র এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষা দানে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। মাঝে মাঝে বি. বি. সি. শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন আলোচনা পরিবেশন করে। তবে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের বেতারকেন্দ্রগুলি অনেকাংশে পিছাইয়া আছে। আশা করা যায় শিক্ষা বিস্তারের সংগে সংগে অনেক বেশী বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান শিক্ষক ইহাতে অংশ গ্রহণ করিবেন এবং বিদ্যার্থীমহল তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইবে। বেতার মারফৎ শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

(ক) প্রতি বিদ্যালয়ে একটি করিয়া 'রেডিও সেট' থাকিবে।

(খ) বেতার কেন্দ্রগুলির সহিত যোগাযোগ ও সামাঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ের সময়তালিকা তৈরী হইবে।

(গ) কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া প্রয়োজনীয় তথ্যের 'টেপ রেকডিং' করা যাইতে পারে।

(ঘ) পাঠদানকালে শিক্ষক এই সকল আলোচনার কথা শিক্ষার্থীকে মনে করাইয়া দিতে পারেন। বেতার শুনিবার পর শিক্ষক ঐ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন করিতে বা রচনা লিখিতে বলিবেন। একথা পূর্বে জানাইয়া দিলে শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিবে।

(৯) **প্রকৃতি বিজ্ঞানের উদ্যান**:—বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি এতই কৃত্রিম হইয়াছে যে শিক্ষার্থী বই ছাড়া অন্য কোথাও শিক্ষণীয় কিছু আছে বলিয়া জানে না। এই সর্বনাশা ধারা শিক্ষার্থীকে প্রকৃতি হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে। মাটি, গাছ, শিলা, সার সম্বন্ধে সে দশ পৃষ্ঠা উত্তম রচনা লিখিতে

পারে ; কিন্তু বাড়ীতে একটি ফুল বা ফলের গাছ কি করিয়া করিতে হয় সে তাহা জানে না। পুঁথিগত বিদ্যার চাপে এবং অপরিকল্পিত শিক্ষার নির্মম পেষণে সে বাস্তব জ্ঞান বর্জিত হইয়া পড়িয়াছে। বুনিয়াদী বিদালয়ে নানা বাস্তব কাজের মধ্যে উদ্যান রচনা সেখানে পাঠ্যক্রমের এক বিশেষ অংশ অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। যদি বিদ্যালয়ে পৃথক উদ্যান এবং সাজসরঞ্জাম না থাকে তবে প্রকৃতি বিজ্ঞান পাঠ হাস্যকর হইবে। সেখানে একটি পুষ্করিণী এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা চিহ্নিত জমি থাকা দরকার। বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রতি শিক্ষার্থীর জমির উৎপাদনের মূল্যায়ন করিতে হইবে। সহরে বা যেখানে স্থানাভাব সেখানে শিক্ষার্থী মাটির পাত্রে কিছু কিছু গাছ জন্মাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে।

(১০) **গ্রামোফোন বক্তৃতা** ঃ—বেতারের মত শিক্ষাদানের পরিপূরক হিসাবে গ্রামোফোন ব্যবহার করা যাইতে পারে। কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোং লিমিটেড প্রভৃতি সংস্থা শিক্ষাদানের উপযোগী রেকর্ড তৈরী করে। শিক্ষক প্রয়োজনমতে সেগুলির সাহায্য লইতে পারেন।

(১১) **নিকটবর্তী স্থানে ভ্রমণ** ঃ—শ্রেণীকে ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত করিয়া নিকটবর্তী স্থানে বেড়াইতে লওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এই ভ্রমণ সুপরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইবে। এই সকল ভ্রমণের শেষে শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে রচনা লিখিবে, ঐ ধরণের চিত্র সংবাদপত্র হইতে কাটিয়া একটি খাতায় আটা দিয়া আঁটিয়া রাখিবে, বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ লিখিবেও মডেল তৈরী করিবে।

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে একই স্থানে ভ্রমণ করিলে সেখানকার জীবজন্তু, পাখী বা উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য আহরণ করা যাইতে পারে। বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে প্রাণী সেখানে কি ভাবে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে, বিভিন্ন গাছে ফুল ও ফল ধরিয়াছে, পাখীর বাচ্চা হইতেছে, বিভিন্ন পতঙ্গ বিশেষ করিয়া ফড়িং এবং প্রজাপতির আবির্ভাব হইয়াছে—প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থী জ্ঞানলাভ করিতে

সুযোগ পাইবে। তাহা ছাড়া প্রাকৃতিক ইতিহাস সংস্থা প্রযোজিত বিভিন্ন দ্রষ্টব্য বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান সমৃদ্ধ হইতে পারে। এই সকল সংস্থায় যাওয়ার সময় সুপরিকল্পনার দরকার। ঐ সকল স্থানে একজন নেতার অধীনে তিন বা চার জনের বেশী শিক্ষার্থী যাইবে না। বন্য প্রাণী স্বাভাবিক চলাফেরায় যেন কোন বাধা না পায় তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভ্রমণের পর প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিবরণ দাখিল করিবে। কি ভাবে শিক্ষার্থী অগ্রসর হইবে, নীচে তাহার একটি নমুনা দেওয়া হইল।

বিষয় ঃ—ফুল

(ক) প্রাপ্তিস্থান ও তারিখ।

(খ) গাছের আয়তন।

(গ) মাটির প্রকৃতি

(ঘ) ফুল ঃ

প্রকৃতি
আয়তন
বর্ণ
আকৃতি
পাপড়ির সংখ্যা
বৃতির সংখ্যা, প্রভৃতি

(ঙ) পাতা ঃ

প্রকৃতি
আকৃতি, পাতার কিনারা
ফলক, ইত্যাদি

(চ) ফল ঃ

প্রকৃতি
আকৃতি
বর্ণ

(ছ) শিকড়, ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত বিবরণের প্রসারতা শিক্ষার্থীর বয়স, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের উপর নির্ভর করিবে।

(১২) **বিজ্ঞান সমিতি** ঃ—বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম যতই সুপরিকল্পিত বা সুব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হউক না কেন ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং কৌতূহল নিবৃত্তির খোরাক তাহাতে না থাকিলে সবই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ইহা কেবল শিক্ষার্থী নহে শিক্ষকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেইজন্য প্রতি বিদ্যালয়ে একটি করিয়া বিজ্ঞান সমিতি গঠনের উপযোগিতা বর্তমানে অনুভূত হইয়াছে। বিজ্ঞান সমিতির বিশেষ উদ্দেশ্যগুলি নীচে আলোচিত হইল।

(ক) বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যের প্রয়োগের কাজে শিক্ষার্থীকে আগ্রহশীল করিয়া তোলা যায়।

(খ) বিজ্ঞান সমিতি বিজ্ঞানের অন্যান্য উন্নত ক্ষেত্রে জ্ঞান প্রদান করিতে সক্ষম।

(গ) শিক্ষা বা বৃত্তিতে পরিচালনার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

(ঘ) বিজ্ঞান সমিতি শিক্ষার্থীর হাতের কাজের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ এবং আত্মনির্ভরশীলতার সুযোগ দেয়। ইহার মধ্য দিয়া নায়কত্ব বোধ জাগরিত হয়।

(ঙ) শিক্ষকের সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষিত হওয়ার ফলে, অধুনা পরিলক্ষিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যবধান দূরীভূত হয় এবং বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক শৃঙ্খলা লক্ষিত হয়।

(চ) বিজ্ঞান সমিতির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে সহযোগিতার ও সেবার মনোভাব গড়িয়া উঠে। সকলেরই চেষ্টা থাকে কি ভাবে বিদ্যালয়কে সব দিক দিয়া সম্পূর্ণাংগ ও সুন্দর করা যায়।

(ছ) শিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগের কাজে সাহায্য করে।

সমিতির সংগঠন ঃ—সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা হইবেন বিজ্ঞান শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইবেন তাহার সভাপতি। প্রধান উদ্যোক্তা

প্রধান শিক্ষকের নিকট অর্থ প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য লইবেন এবং বাহিরের সহিত সংযোগ রক্ষা করিবেন। সকল শ্রেণীর এবং বিষয়ের আগ্রহী শিক্ষার্থী সমিতির সদস্য হইতে পারিবে। শিক্ষার্থী নিজেদের মধ্য হইতে কার্যকরী সমিতি এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিবে। প্রধান উদ্যোক্তা বিজ্ঞান শিক্ষক হইলেও তিনি সমিতির কার্যে নিজস্ব প্রভাব বিশেষভাবে আরোপ করিবেন না। সদস্যগণই পরিকল্পনা করিবে, প্রদর্শনী এবং আলোচনার ব্যবস্থা করিবে, মডেল প্রভৃতির কাজ করিবে। বেশী খরচসমূহ বিদ্যালয় কোষ হইতে টাকা লইয়া চালান হইবে ; তবে সদস্যদের নিকট হইতে অল্প কিছু চাঁদা লইলে ভাল হয়।

সমিতির কার্যাবলী ঃ—(ক) স্বাস্থ্য পরীক্ষাগার, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সংরক্ষণী কেন্দ্র, বরফ তৈরীর কারখানা, রসায়ন কেন্দ্র প্রভৃতি স্থানে সদস্যদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) বিভিন্ন সভার মাধ্যমে সদস্যদিগকে মৌলিক চিন্তা এবং কর্মের সুযোগ দিতে হইবে।

(গ) যে সকল শিক্ষার্থী পাঠদানকালে বিভিন্ন পরীক্ষা করার সুযোগ পায় না তাহাদিগকে এই সমিতিতে ঐ সকল কার্য করার সুযোগ দিতে হইবে।

(ঘ) কোন স্থানে ভ্রমণের পূর্বে ঐ স্থান সম্বন্ধে বা বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার।

(ঙ) বর্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক খবর বা তথ্য যাহাতে সদস্যগণের নিকট নিয়মিত পরিবেশিত হইতে পারে তাহার জন্য সমিতিতে পুস্তক, পত্রিকা প্রভৃতি রাখিতে হইবে। বিদ্যালয় পাঠাগারের মধ্যে পৃথকভাবে একটি "বিজ্ঞান চক্র" সৃষ্টি করা যাইতে পারে।

(চ) বিজ্ঞানে আগ্রহী ও দক্ষ বক্তা বাহির হইতে আনিয়া মাঝে মাঝে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য বক্তৃতায় সদস্যগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে। নতুবা সমিতির উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে। মনে রাখা দরকার যে ঐ বক্তৃতাগুলি যেন সাধারণের উপযোগী হয়।

(ছ) সদস্যগণ বিভিন্ন নমুনা, মডেল, চার্ট এবং প্রদর্শনী ও জাদুর জন্য সামগ্রী তৈরী করিবে।

(জ) বৎসরে অন্ততঃ একবার প্রদর্শনী বা মেলার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া বিশেষ করিয়া ছুটিতে এই সমিতি গ্রামে বা সহরে সেবামূলক অনেক কাজ করিতে পারে। সাধারণের সংগে মিশিয়া তাহাদের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে সদস্যগণ আত্মনিয়োগ করিতে পারে।

এটা খুবই সুখের কথা যে 'All-India Council of Secondary Education' এই চল্‌তি বৎসরের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। উদ্দেশ্য ১৫০টি বিজ্ঞান সমিতি গঠিত করা। প্রতি রাজ্যে অবস্থিত বিজ্ঞান সমিতির সংগে যোগাযোগ রক্ষার জন্য দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান সমিতি গঠনের পরিকল্পনাও রহিয়াছে। বিজ্ঞান সমিতির কাজ আরও ব্যাপক হইলে আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলি বিশেষ উপকৃত হইবে। ইহার জন্য শিক্ষক, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ এবং সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

(১৩) **বিজ্ঞান পাঠাগার**ঃ—যদি বিদ্যালয়ে পাঠাগার ও পঠনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘরের ব্যবস্থা থাকে এবং যোগ্য পরিচালকের হস্তে অর্পিত হয়, তবে বিজ্ঞান পাঠাগারকে সাধারণ পাঠাগারের মধ্যে একটি অংশ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অন্যথায় বিজ্ঞান ঘরে বিজ্ঞান পুস্তক, পত্রিকা প্রভৃতি রাখিয়া তাহা বিজ্ঞান শিক্ষকের উপর অর্পণ করা উচিত। পাঠাগারে রক্ষিত বিজ্ঞানের সকল পুস্তক সম্বন্ধে শিক্ষকের জ্ঞান থাকা উচিত। পাঠদানের সময় তিনি ঐ সকল পুস্তক বা পত্রিকার উল্লেখ করিয়া শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন। বই কেমন-ভাবে ব্যবহার করিতে হয় শিক্ষক সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক জ্ঞান দিবেন।

শিক্ষক উল্লিখিত সকল রকম পুস্তক পাঠাগারে থাকিবে। প্রয়োজনের সংগে সংগে সেগুলি যাহাতে শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছায় সেদিকে শিক্ষক বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। নতুবা শিক্ষার্থীর আগ্রহ নষ্ট হইবে। বিজ্ঞান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান

পাঠাগার থাকিলে অনেক সুবিধা হয়; কারণ অতিরিক্ত কি কি বিষয় কোন্ শিক্ষার্থী পড়িতেছে বা তাহাদের বিশেষ ঝোঁক কোন্ দিকে তাহা নির্ণয়ে তিনি সক্ষম হন।

পঠনে যাহাতে শিক্ষার্থী বিশেষ মনোযোগ দেয় তাহার জন্য শিক্ষক যথেষ্ট যত্নবান হইবেন। পঠনের পর শিক্ষার্থীকে সারাংশ নির্ণয় করিতে বলিতে হইবে এবং উপযুক্ত সারাংশকে বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে স্থান দিতে হইবে।

পাঠাগারের উপযুক্ত বিষয়সূচী থাকা দরকার। প্রয়োজনকালে শিক্ষকও ঐ সকল পুস্তকের সাহায্য লইবেন। শিক্ষার্থীর সম্মুখে ঐ সকল পুস্তক পড়িলে শিক্ষার্থী পাঠের নিয়ম সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারিবে। পাঠাগারে বিজ্ঞান পুস্তককে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(ক) **উৎসাহদ্দীপক পুস্তক** :—

পুষ্করিণীতে জীবন রহস্য।

বিদ্যুতের আশ্চর্য ক্ষমতা।

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর জয়বার্তা।

বস্তুর উপর মানুষের ক্ষমতা।

সমুদ্র-রহস্য।

পাস্তুর, ফেবার, আইনষ্টাইন, জগদীশ বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা, রমন প্রভৃতির জীবন ইতিহাস।

(খ) **প্রাসঙ্গিক পুস্তক** :—

বিশ্বকোষ।

বিজ্ঞানের অভিধান।

বিজ্ঞানের ইতিহাস।

মথ, প্রজাপতি, পতংগের জীবন ইতিহাস।

সাধারণ পাখী।

নভমণ্ডলের মানচিত্র।

বিভিন্ন তালিকা, প্রভৃতি।

(গ) **ভিত্তি** (Back ground) **পুস্তক** ঃ—

পৃথিবীর ইতিহাস।

মানবের প্রয়োজনে বিদ্যুৎ।

মোটরের জীবন কথা।

পক্ষীবন্ধু।

রাডার।

কয়লার উৎপত্তি।

কুইনাইনের জীবনকথা, ইত্যাদি।

পরীক্ষাগার ও তাহার সাজসরঞ্জাম

যে ঘরে কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা হয় সেই ঘরকে সাধারণতঃ পরীক্ষাগার বলে। বিজ্ঞান পাঠের জন্য এক বিশেষ ধরণের পরীক্ষাগার দরকার। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান যখন অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে তখন বিজ্ঞান পরীক্ষাগার যে বিদ্যালয় গৃহেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহায্যকারী হিসাবে বিজ্ঞান পরীক্ষাগার ছাড়াও অন্য ঘর বিজ্ঞান পাঠদানের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। যেমন প্রস্তুতি ঘর, ভাঁড়ার ঘর, বক্তৃতাঘর, অন্ধকার ঘর ইত্যাদি।

(ক) **প্রস্তুতি ঘর** ঃ—বক্তৃতা কক্ষে বা পরীক্ষাগারে দ্রষ্টব্য পরীক্ষাগুলিকে পূর্ব ধারাবাহিকভাবে সাজাইয়া লইতে হয়। তাহার জন্য একটি প্রস্তুতি ঘরের প্রয়োজন আছে। পরীক্ষাগার বা অন্য কোন ঘরে পাঠদান চলিতে থাকা কালীন কাহাকেও বিরক্ত না করিয়া এই ঘরে সমস্ত সাজসরঞ্জাম ঠিক করিয়া লওয়া হয়। এখানে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, কাঁচের নল, পেরেক, স্ক্রু, তার, রবারের নল, মোম, ঝালাই-এর যন্ত্রপাতি, পায়ে চালান ব্লো-পাইপ এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস রাখা হয়।

(খ) **ভাঁড়ার ঘর** ঃ—বিশেষ দরকারী, মূল্যবান, বিষাক্ত প্রভৃতি জিনিস পরীক্ষাগারে রাখা একান্ত অনুচিত। যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটিয়া যাইতে পারে। তাই সেগুলিকে ভাঁড়ার ঘরে রাখিয়া তালা চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। অনেকে আবার এই সকল ভয়াবহ জিনিস রাখিবার জন্য বিদ্যালয় গৃহ হইতে দূরে অবস্থিত কোন ঘরে রাখার পক্ষপাতী।

(গ) **বক্তৃতা ঘর** ঃ—বক্তৃতা ঘরে একটি প্রকাণ্ড বড় ব্লাকবোর্ডের সম্মুখে একটি প্রদর্শনী টেবিল থাকিবে। শিক্ষার্থীর আসন এইরূপে সজ্জিত থাকিবে যে ঐ টেবিলের উপর শিক্ষক প্রদর্শিত পরীক্ষা বেশ সহজে পর্যবেক্ষণ করিতে পারে।

জানালা ঢাকিয়া প্রয়োজনমতে ঘরকে অন্ধকার করারও ব্যবস্থা থাকিবে। এখানে বিভিন্ন ছায়াচিত্রের যন্ত্রপাতি, বিশেষ করিয়া একটি বড় পরদা রাখা দরকার।

(ঘ) এ ছাড়া একটি স্থায়ী অন্ধকার ঘরেরও প্রয়োজন আছে। বাতাস আগম ও নির্গমনের ব্যবস্থা, তাক্, জলের ব্যবস্থা, বিশেষ আলো প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিবে।

(১) বিজ্ঞান ঘরের পরিকল্পনা

একথা ঠিক যে পরিকল্পনাবিদ্ এবং ইঞ্জিনীয়ারের সংগে শিক্ষকও বিজ্ঞান ঘরের পরিকল্পনা এবং সজ্জা সম্বন্ধে অবহিত থাকিবেন। কারণ ঘরের বিভিন্ন অংশের কার্যকরী চাহিদার উপর বিজ্ঞান ঘরের রূপায়ণ নির্ভরশীল। সুতরাং কতকগুলি সাধারণ নীতি তাহাকে মানিয়া চলিতে হয়। নীচে কয়েকটি নীতি প্রদত্ত হইল।

(ক) বিজ্ঞান ঘরে শিক্ষার্থী শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই অভিজ্ঞতা তাহাদিগকে জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণীকৃত নীতির সম্যক উপলব্ধি প্রদানে সাহায্য করে।

(খ) শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযোগী শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা, পাঠ্যবিষয় এবং এমনকি বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমের চাহিদার এক বৃহৎ অংশ বিজ্ঞান ঘরে লাভ করা উচিত।

(গ) বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত পরিবেশ বিজ্ঞান ঘরে থাকিবে।

(ঘ) বিজ্ঞান ঘরের সাজসজ্জা যেমন টেবিল, বেঞ্চ প্রভৃতিকে প্রয়োজনমত ভিন্ন রূপে সাজাইবার ব্যবস্থা থাকিবে।

(ঙ) বিজ্ঞান ঘরে বা পরীক্ষাগারে শিক্ষকের পরীক্ষা প্রদর্শনের যথেষ্ট সুযোগ থাকিবে।

(চ) প্রতি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পরীক্ষা করার সুবিধা বিজ্ঞান ঘরে থাকিবে।

(ছ) বিজ্ঞান ঘরের এবং তাহার সাজ সরঞ্জামের পরিকল্পনা ইঞ্জিনীয়ার, শিক্ষাপরিদর্শক এবং শিক্ষকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্থিরীকৃত হইবে।

(২) (ক) আয়তন

বিজ্ঞান ঘরের নির্দিষ্ট কোন আয়তন নাই। শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং পাঠ্য

বিষয়গুলির উপর তাহার আয়তন নির্ভর করে। তবে সাধারণতঃ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য বিজ্ঞান ঘরে এক সংগে পঁচিশ জনের বেশী কাজ করিতে দেওয়া সঙ্গত নয়। আর তাহা ছাড়া বেঞ্চ, টেবিল, তাক্ প্রভৃতির স্থান বাদ দিয়া প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য গড়ে পঁচিশ হইতে ত্রিশ বর্গফুট পরিমিত স্থান মেঝেতে দিলে সুবিধা হয়। যদি অন্যান্য ঘর, বিশেষ করিয়া প্রস্তুতি ঘর, পৃথক না থাকে তবে সেই অনুপাতে বিজ্ঞান ঘরের পরিমাপও বাড়াইতে হইবে। প্রস্তুতি ঘর, ভাঁড়ার ঘর এবং বক্তৃতা ঘরগুলির আয়তন যথাক্রমে ২০০ বর্গ ফুট, ১৬ ফুট× ১২ ফুট এবং ৪০০ বর্গ ফুট হইবে। অন্ধকার ঘরটির বিস্তার ৮ ফুটের কম না হয়।

(খ) সজ্জা

যখন বিজ্ঞানের জন্য দুইটি ঘর পাওয়া যায় তখন একটিতে পদার্থ ও জীব-বিদ্যা এবং অন্যটিতে রসায়নবিদ্যার পাঠদানের ব্যবস্থা করা উচিত। বাতাসে অসুবিধা করিতে না পারে এমনভাবে রসায়নবিদ্যার ঘরটি অবস্থিত থাকা উচিত। যদি দোতলা বাড়ী হয় তাহা হইলে জল, গ্যাস এবং পয়ঃপ্রণালীর সুবিধার জন্য নীচের তলাতে রসায়নবিদ্যার ঘরটিকে সাব্যস্ত করা উচিত।

ঐ দুই ঘরের মধ্যস্থলে প্রস্তুতি ঘরটি থাকা উচিত। একটি ঘরে যখন কাজ চলিতে থাকিবে তখন তাহাকে বিরক্ত না করিয়া যাহাতে অন্য দরজা দ্বারা প্রস্তুতি ঘরে যাতায়াত করা যায় তাহার ব্যবস্থা থাকিবে। অন্যান্য ঘর হইতে বক্তৃতা ঘরে টেবিল, বেঞ্চ, সাজসরঞ্জাম আনার দরকার হইবে। সুতরাং বক্তৃতাঘর, পরীক্ষাগার ও প্রস্তুতি ঘরের নিকটবর্তী হওয়া প্রয়োজন। পরীক্ষাগারের দরজা লাগোয়া বারাণ্ডায় কয়েকটি বড় বড় তাক্ থাকিবে। পরীক্ষা চলিতে থাকা-কালীন অনাবশ্যক বা পরীক্ষাসমাপ্ত সাজসজ্জা ঐ তাকে সাজাইয়া রাখিলে প্রদর্শনী টেবিলে ভিড় হইবে না।

(গ) জানালা

পরীক্ষাগারে দুই পাশের দেওয়ালে জানালা থাকিবে। বাতাসের দিকে মুখ করা জানালার একটি সারি থাকা উচিত। পরীক্ষাগারে একদিকে তাক্,

বড় বেঞ্চ, কাপ বোর্ড, বড় বোর্ড এবং বিভিন্ন ছবি টাঙ্গানোর জন্য দেওয়ালে উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং অপর দিকের দেওয়ালে জানালার সারি বসাইয়া ঘরটিতে প্রচুর আলো বাতাস আসার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এই বিপরীতধর্মী ব্যবস্থার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন সম্ভবপর। এক দিকের দেওয়ালের জানালা আয়তনে ছোট এবং পরিমাণে বেশী হইবে। সেগুলিকে সাধারণতঃ সাড়ে পাঁচ ফুটের উপর বসান হইবে। দেওয়ালের এই নীচের অংশটি কাজে লাগান মোটেই কষ্টকর নয়। অপর দিকের বড় জানালাগুলি টেবিলের সমান উ চুতে বসান হইবে। বড় বোর্ড যে দিকে থাকে সে দিকে জানালা না রাখাই ভাল। সাধারণতঃ উত্তর গোলার্ধে উত্তর দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ দিকে বড় জানালার সারি রাখিলে পরীক্ষাগারে আলোর অসুবিধা থাকে না।

(ঘ) বায়ু চলাচল

পরীক্ষাগারে বিভিন্ন কাজে তাপের দরকার হয়। তাহা ছাড়া এক সংগে কাজ করার সময় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের নিঃশ্বাসে বাতাস শীঘ্র সম্পৃক্ত হয় এবং কিছু-ক্ষণের মধ্যে ঘরে গুমোটের সৃষ্টি হয়। ঘরের বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়া যায় ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রাধিক্য ঘটে। নিঃশ্বাসের বায়ু অপেক্ষা বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষাকৃত ভারী। তাই দরজা দিয়া বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা বায়ু ঘরে ঢুকিয়া গরম বায়ুকে উপরে ঠেলিয়া দেয়। সুতরাং এই নিম্নচাপ পরিবেশে ঘরের দেওয়ালে যদি বায়ু নিষ্কাসনের রাস্তা না থাকে তবে ঘর অস্বাস্থ্যকর হইবে। তাই বাড়ী তৈয়ারির সময় এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(ঙ) জল সরবরাহ

বিজ্ঞান ঘরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা সর্বত্র এক নয়। বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন এলাকায় জল সরবরাহ করা হইয়া থাকে। তবে নলকূপ, কুয়া, পুকুর বা নলের জল —যেটিই হউক না কেন এক হাজার গ্যালনের একটি চৌবাচ্চা করিয়া তাহাকে বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত করিতে হইবে। মাঝে মাঝে পরিষ্কার করার জন্য চৌবাচ্চার তলায় একটি স্ক্রু লাগান থাকিবে। প্রতি ঘরের জন্য ঐ চৌবাচ্চার সহিত একটি

করিয়া পাইপ লাগান থাকিবে। মনে রাখা দরকার পাইপটি যেন লোহার না হয় (বিশেষ করিয়া পদার্থবিছার পরীক্ষাগারে)।

(চ) তাপ সরবরাহ

পরীক্ষাগারে তাপের জন্য গ্যাসের ব্যবস্থা—সুবিধা এবং ব্যয়—এই দুই কারণে বিশেষ প্রযোজ্য। আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর চাপ এত বেশী হইতেছে যে কেবলমাত্র স্পিরিট ল্যাম্পে পরীক্ষা করা কখনও সম্ভবে না। কোন কোন দেশে আবার পেট্রোল গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ইহার জন্য আলাদা ব্যবস্থাবলম্বন করিতে হয় এবং ইহার জ্বলনের মুখগুলিও ভিন্ন প্রকৃতির। কোন কোন কাজে আবার বৈদ্যুতিক উত্তাপ বিশেষ প্রয়োজনীয়। যেখানে এক শত ভোল্টের চেয়ে বেশী শক্তি বিদ্যমান সেখানে জলের বাথ, উনান, মৎস্য পাত্র, জীব সংরক্ষণের পাত্র প্রভৃতির জন্য বিশেষ কার্যকরীরূপে বিদ্যুতের ব্যবহার চলিতে পারে।

(ছ) জল নিষ্কাসন

বেসিনের প্রথম পর্যায় ছাড়া ড্রেন কখনও লোহার হওয়া উচিত নয়। বেসিনের জল যেখানে ড্রেনে পড়িতেছে তাহার মুখটি অপেক্ষাকৃত স্ফীত হইবে। ড্রেনটির ঢাকনি কাঠের তৈরী হইবে এবং ঐ ঢাকনি যেন মেঝের তল বরাবর হয়। ড্রেনটি সিমেণ্ট বা চীনামাটির দ্বারা তৈরী এবং ক্রমশঃ ঢালুভাবে সজ্জিত করা হইবে। ড্রেনের জল সেপ্‌টিক্‌ ট্যাঙ্কে বা কোন পুষ্করিণীতে লইয়া যাওয়া অন্যায়। প্রবহমান জলে তাহাকে কোমল করিয়া যে কোন স্থানে লইয়া যাওয়া চলে।

(জ) মেঝের অবস্থা

আদর্শগতভাবে সিমেণ্টের ভূমির উপর জল বা উঁই-প্রমাণিত ছোট কাঠের ঘন সাজাইয়া মেঝে তৈরী করিলে খুব ভাল হয়। কিন্তু ইহা ব্যয়সাধ্য ও ভালভাবে বেশী দিন রক্ষা করা যায় না। তাই সিমেণ্টের মেঝেই পরীক্ষাগারের জন্য প্রশস্ত। কারণ উক্ত ত্রুটিগুলি ইহার মধ্যে নাই।

(ঝ) কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা

পরীক্ষাগারের সব অংশেই এক সংগে কাজ করিবার দরকার নাও হইতে

পারে। আবার দিনের কোন সময়ে কেবলমাত্র একটি দেওয়ালের দিকেই কৃত্রিম আলোর দরকার। সুতরাং আলাদা আলাদা সুইচ্ থাকা বাঞ্ছনীয়। একশত ওয়াটের ছয়টি বাল্ব অপেক্ষা ষাট ওয়াটের দশটি বাল্বে সুবিধা বেশী এবং খরচও অনেক কম। কারণ বেঞ্চে কার্যরত শিক্ষার্থী অপেক্ষাকৃত কম ছায়া পায়। বলা বাহুল্য বোর্ডের জন্য আলাদা সুইচ ও বাল্ব থাকিবে। বাল্ব দোদুল্যমান অবস্থায় রাখা অপেক্ষা কোথাও স্থির রাখিতে পারিলে ভাল হয়।

(ঞ) নির্গম পথ

অন্ধকার ঘর ছাড়া সকল ঘরের দুই প্রান্তে একটি করিয়া মোট দুইটি দরজা থাকা উচিত। দরজাগুলি বাহিরদিকে উন্মুক্ত করা যাইবে। কারণ তাহাতে বিপদের সময় তাড়াতাড়ি বাহিরে যাওয়ার সুবিধা আছে। বিপদের জন্য সর্ব-প্রকারে তৈরী থাকা ভাল।

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য পরীক্ষাগার

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ বিজ্ঞান এবং তাহার পরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পদার্থ, রসায়ন প্রভৃতি বিদ্যা পড়িতে হয়। সেইজন্য সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইবে যদি সাধারণ বিজ্ঞানের জন্য একটি, ঐচ্ছিক বিজ্ঞানের জন্য তিনটি এবং অন্ততঃ দুইটি বক্তৃতা ঘর থাকে। পূর্বে এই সকল ঘর সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

সাজসরঞ্জাম :—

(ক) **পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগার** সংলগ্ন একটি অন্ধকার ঘর থাকিবে। বিশেষ করিয়া নিম্নোক্ত সাজ সরঞ্জাম ঐ পরীক্ষাগারে থাকিবে। ৩৫′ × ২২′ পরিমিত ঘরে ২৪ জন শিক্ষার্থীর ব্যবস্থা দেখান হইতেছে।

(১) প্রস্থের একদিকে একটি বড় দেওয়ালবোর্ড থাকিবে (১২′ × ৪′)।

(২) ঐ বোর্ডের সম্মুখে ড্রয়ার যুক্ত একটি বড় প্রদর্শনী টেবিল (৮′ × ২$\frac{১}{২}$′ × ৩′) থাকিবে। তাহাতে জল ও গ্যাসের নল সংযুক্ত থাকিবে।

(৩) শিক্ষার্থীদের কাজ করার জন্য তিন সারি ও দুই স্তম্ভে মোট ছয়খানি টেবিল (৬′ × ৩$\frac{১}{২}$′ × ৩′) থাকিবে। সারির মধ্যে ৪$\frac{১}{২}$′ এবং স্তম্ভের মধ্যে ২$\frac{১}{২}$′ ব্যবধান থাকিবে। প্রতি টেবিলে চার জন শিক্ষার্থী কাজ করিতে পারিবে।

(৪) প্রদর্শনী টেবিলের বাম দিকের দেওয়ালের কোণে নোট বই রাখার আলমারি থাকিবে।

(৫) বোর্ডের বিপরীত দিকের দেওয়ালের দুই কোণে দুইটি আলমারি থাকিবে।

(৬) দুই আলমারির মাঝখানে জলের বেসিন থাকিবে।

(৭) দৈর্ঘ্যের একদিকের দেওয়াল বরাবর সুদৃঢ় তলের উপর (৩′ উপরে) কতকগুলি নিক্তি রাখার ব্যবস্থা থাকিবে।

(৮) তাপের পরীক্ষার জন্য তাহার বিপরীত দিকের দেওয়ালের কাছে গ্যাস নল সংযুক্ত অন্ততঃ একটি বড় টেবিল থাকিবে।

(৯) ইহা ছাড়া ছোট বড় দুই ধরণের কিছু টুল থাকিবে।

(খ) **রসায়ন পরীক্ষাগারে** অন্ততঃ নিম্নোক্ত সাজ সরঞ্জামগুলি থাকিবে— (৩৮′ × ২২′) পরিমিত ঘরে ২৪ জন পরীক্ষার্থীর ব্যবস্থা দেখান হইয়াছে।

(১) প্রস্থের একদিকে একটি বড় দেওয়ালবোর্ড থাকিবে (১২′ × ৪′)।

(২) ঐ বোর্ডের সম্মুখে এসিড প্রমাণিত ও ড্রয়ারযুক্ত এক টেবিল (৮′ × ২$\frac{১}{২}$′ × ৩′) থাকিবে। তাহাতে জল ও গ্যাসের নল সংযুক্ত থাকিবে।

(৩) শিক্ষার্থীদের কাজ করার জন্য একই স্তম্ভে গ্যাস ও জল সংযুক্ত এবং এসিড প্রমাণিত তিনটি টেবিল (১২′ × ৪$\frac{১}{২}$′ × ৩′)। প্রতি টেবিলের মাঝখানে ৪$\frac{১}{২}$′ করিয়া ব্যবধান থাকিবে। প্রতি টেবিলে আটজন করিয়া কাজ করিতে পারে।

(৪) প্রদর্শনী টেবিলের বামদিকের দেওয়ালের কোণে নোট বই রাখার আলমারি এবং চাবি রাখার আঙ্গুটি থাকিবে।

(৫) বোর্ডের বিপরীত দিকের দেওয়াল বরাবর দুইটি আলমারি থাকিবে।

(৬) দুই আলমারির দুই পাশে কোণে দুইটি বেসিন থাকিবে।

(৭) পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগারের মত নিক্তি রাখার ব্যবস্থা থাকিবে।

(৮) এসিড প্রমাণিত ড্রেনের ব্যবস্থা থাকিবে।

(৯) বিভিন্ন রি-এজেণ্ট রাখার তাক্ এক দিকের দেওয়ালে থাকিবে।

(১০) বালিভর্তি একটি কাঠের বড় বাক্স ঘরের এক কোণে রাখিতে হইবে।

(১১) একটি fume cupboard থাকিবে।

(গ) **জীববিদ্যার পরীক্ষাগারে** নিম্নোক্ত সাজ সরঞ্জামগুলি থাকিবে। ৩৪½′ × ২২′ পরিমিত ঘরে ২৪ জন পরীক্ষার্থীর ব্যবস্থা দেখান হইয়াছে।

(১) প্রস্থের একদিকে একটি বড় দেওয়ালবোর্ড।

(২) দুই ধরণের টুল।

(৩) প্রদর্শনী টেবিল (৮′ × ২½′ × ৩′)।

(৪) জলের নল ও ড্রয়ার সংযুক্ত তিন সারি ও দুই স্তম্ভে মোট ছয় খানি টেবিল (৬′ × ৩½′ × ৩′)। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাজের সময় জানালার দিকের স্তম্ভে পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

(৫) প্রদর্শনী টেবিল (৮′ × ২½′ × ৩′)।

(৬) দুই কোণে দুইটি আলমারি।

(৭) এসিড ও অন্যান্য লবণ রাখার জন্য দেওয়াল তাক্।

(৮) কয়েকটি ষ্টেনিং র‍্যাক্।

(৯) দেওয়ালের অন্যদিকে চারাগাছ তৈরীর স্থান, মাটির স্থান, কাজ করিবার টেবিল, মৎস্য প্রভৃতি রাখার জন্য অ্যাকুয়ারিয়াম প্রভৃতি রাখার ব্যবস্থা থাকিবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য পরীক্ষাগার

আমাদের দেশে যেখানে বিদ্যালয় বাড়ির সমস্যা শিক্ষাদানের একটি প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যেখানে গ্রামে বিজ্ঞানের ছাত্র সংখ্যা অনধিক সেখানে পূর্ববর্ণিত প্রতি অংশের জন্য পরীক্ষাগার এবং বক্তৃতা ঘর তৈরী না

করিয়া সর্বার্থসাধক পরীক্ষাগার বা সম্মিলিত বক্তৃতা ও পরীক্ষাঘর তৈরী করাই বিধেয়।

(ক) **সর্বার্থসাধক পরীক্ষাগারঃ**—এইরূপ পরীক্ষাগারের আয়তন শিক্ষার্থী সংখ্যার উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ ২৪ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৪১½′ × ২২′ পরিমাপের ঘর হইলে চলিতে পারে। সর্বার্থসাধক বিজ্ঞান ঘরের সাজ সরঞ্জাম ও ব্যবস্থা এইরূপ থাকিবে যে তাহাকে কি পদার্থবিদ্যা, কি রসায়নবিদ্যা, কি জীববিদ্যা বা সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতিতে বক্তৃতা, প্রদর্শনী বা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পরীক্ষা প্রভৃতি পদ্ধতিতে কার্যকরীভাবে শিক্ষাদান করা যাইবে।

এই ঘরের প্রস্থের একদিকে দেওয়ালবোর্ড থাকিবে। তাহার সম্মুখে অন্ততঃ তিন ফুট ব্যবধানে জল ও গ্যাসের নল সংযুক্ত এবং এসিড প্রমাণিত প্রদর্শনী টেবিল (৮′ × ২½′ × ৩′) থাকিবে। তাহার সম্মুখে ও ঘরের মাঝখানে ছয় সারি ও দুই স্তম্ভে ২½′ ব্যবধানে মোট বারটি পরীক্ষা টেবিল (৬′ × ২½′ × ৩′) থাকিবে। ঐ টেবিলগুলির ইচ্ছামত স্থান পরিবর্তন করান চলিবে। ইহার উপর লেখা বা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। ঘরের দুই পাশে জল ও গ্যাসের নল সংযুক্ত স্থায়ী বেঞ্চ জানালার উচ্চতায় সাজাইয়া রাখা হয়। মৎস্য সংরক্ষণ, বীজ অংকুরণ প্রভৃতি তাহার উপর চলিতে পারে। ইহাদের মাঝখানে প্রয়োজনীয় টেবিল, মাটির ছোট চৌকা স্থান প্রভৃতি থাকিবে। ঐ সকল টেবিলের তলাগুলিতে তাক্ করিয়া বিভিন্ন জিনিস রাখা হইবে। প্রস্থের অন্য-দিকে যন্ত্রপাতি রাখার দুইটি আলমারি ; অন্য আলমারিতে প্রদর্শন ও সংরক্ষণের দুই একটি সামগ্রী, 'ফিউম্ হুড্' থাকিবে, প্রদর্শনী টেবিলের বাম দিকেনোট বই ও চাবি রাখার স্থান থাকিবে। কাপ বোর্ড ও তাক্‌গুলি দেওয়ালে এমন ভাবে থাকিবে যে উহাতে ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন বা দৃষ্টিকটু হইবে না।

সর্বার্থসাধক পরীক্ষাগার সংলগ্ন একটি প্রস্তুতি ও ভাঁড়ার ঘর থাকিবে। সেখানে একটি বড় টেবিল, মাটির স্থান, আলমারি ও যন্ত্রপাতি রাখার বিভিন্ন তাক্ থাকিবে।

(খ) **সম্মিলিত বক্তৃতা ও পরীক্ষা ঘর** ঃ—খরচের কথা চিন্তা করিলে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য সম্মিলিত বক্তৃতা ও পরীক্ষাঘর বিশেষ সুবিধাজনক। বিশেষ করিয়া এই কারণে আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা উচ্চতর বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহাতে একই ঘরের মধ্যে বক্তৃতা এবং পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে। প্রথমে **ডাঃ আর, এইচ, হোয়াইট হাউস্** এই ধরণের পরীক্ষাগারের কথা চিন্তা করেন। তাঁহার পরিকল্পনানুসারে ৪৫'×২৫' পরিমিত ঘরে ৪০ জন শিক্ষার্থী প্রদর্শনী এবং ২০ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষার কাজ করিতে পারিবে। পর পৃষ্ঠায় তাঁহার পরিকল্পিত ঘরের ব্যবস্থা দেওয়া হইল।

সম্মিলিত বক্তৃতা ও পরীক্ষাঘরের সুবিধা

(১) অন্যান্য ব্যবস্থার তুলনায় এই ঘরের প্রস্তুতিতে কম ব্যয় হয়।

(২) একই ঘরে পঠন ও পরীক্ষা হওয়াতে শিক্ষার্থীর মনে ঐ দুই বিষয়ের অখণ্ডতা সম্বন্ধে ধারণা জন্মে।

(৩) খুব সহজে ও অল্প ব্যয়ে ঘরটিকে সাজান যায়।

(৪) একই ঘরে বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম সাজাইয়া রাখা হয় বলিয়া কাজের খুব সুবিধা হয়।

(৫) বসিবার ও কাজ করিবার একটা ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করে।

(৬) ঘরের শৃঙ্খলা স্বাভাবিকভাবেই বজায় থাকে।
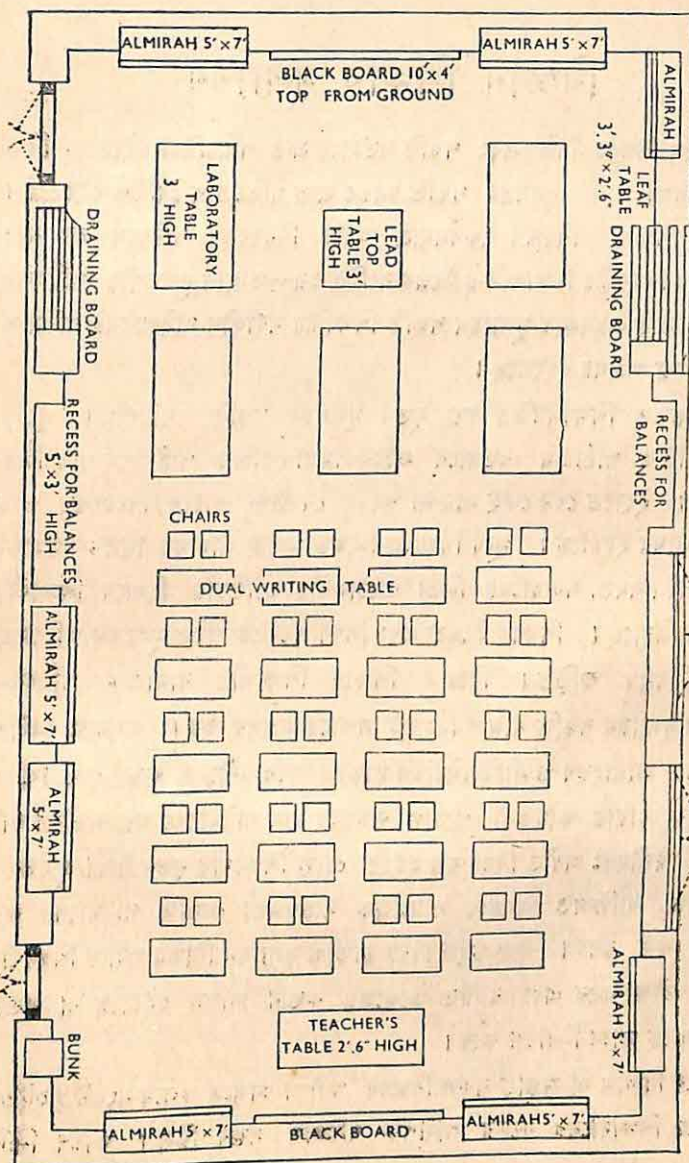
সম্মিলিত বক্তৃতা ও পরীক্ষা ঘর

বিজ্ঞান শিক্ষার মূল্যায়ন

বিজ্ঞান শিক্ষার নীতি এবং পদ্ধতি বর্তমানে দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা তাহার মূল্যায়ন পদ্ধতি আরও দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হইতেছে। বর্তমানে শিক্ষার পরিমাপে কেবলমাত্র অধীত বিষয়বস্তুর পরিমাপ হয় না। শিক্ষাদানে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির উন্মেষ সাধিত হয়—তাহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আসে। তাই এখনকার মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন পরিবর্তনের পরিমাপ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে।

পরিবর্তিত শিক্ষানীতির জন্য নূতন মূল্যায়ন পদ্ধতি অপরিহার্য। পূর্বের বিষয়-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম বর্তমানে জীবন-সমস্যা-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে উক্ত কারণে বিষয়বস্তুর ভার কিছুটা লাঘব হইয়াছে। পূর্বে বিষয়বস্তু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ; বর্তমানে তাহা জীবন-সমস্যা-সমাধানের নিত্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষার্থীর কাছে আসিয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষা পদ্ধতির সহিত মূল্যায়ন অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে জড়িত। বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সামগ্রিক পরিবর্তন নির্ধারণে মূল্যায়ন পদ্ধতি সাধারণতঃ দুই প্রকারে অগ্রসর হয়। প্রথমতঃ অধীত বিষয়বস্তুর জ্ঞানাহরণ ও নীতি নির্ধারণ ছাড়াও সাধারণীকৃত সূত্র এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ধারার কার্যকরী প্রয়োগ ক্ষমতার মান পরিমাপের জন্য অভীক্ষা সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ অধীত বিষয় বস্তু হইতে প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর নূতন চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গী, সৃষ্টিক্ষমতা, ব্যক্তিগত আগ্রহ, সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতি পরিমাপের জন্য কৌশল সৃষ্টি করে। উক্ত দুইটি বিষয় ছাড়াও মূল্যায়ন বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীর ক্ষমতা পরীক্ষা করে এবং বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যের কতটা আয়ত্ত হইয়াছে বা কতটা বাকী আছে তাহা নির্ধারণ করে।

পূর্বে বিজ্ঞান বা অন্যান্য সকল বিষয়ের পরীক্ষা কাগজে কলমে সংঘটিত হইত। তাহাতে শিক্ষাদানের ফলের আংশিক পরিমাপ সম্ভব ছিল। কারণ নির্দিষ্ট

বিষয়ে শিক্ষার্থী কিরূপে সাড়া দিতেছে—তাহাই ছিল পরিমাপের লক্ষ্য। এই সাড়া ও জীবনের সাড়ার কোন নিকটতম সম্পর্ক ছিল না। এই ব্যবধান দূর করিয়া যাহাতে শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন নির্ণয় করা যায় আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশে তাহারই প্রচেষ্টা চলিতেছে। শিক্ষাবিদ্গণ কাগজে কলমে শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে অন্যান্য পরীক্ষারও সুপারিশ করিয়াছেন। নীচে এইরূপ একটি সুপারিশ প্রদত্ত হইল (46th Yearbook of the National Society for the Study of Education)

(১) লিখিত পরীক্ষার দ্বারা মূল্যায়ন—

(ক) ভাষাগত পরীক্ষা (নৈর্ব্যক্তিক অথবা রচনামূলক)।

(খ) ছবি, চিত্র, চার্ট প্রভৃতি।

(গ) নম্বর দেওয়ার তালিকা এবং উত্তর পত্র।

(২) গ্রহণযোগ্য নীতি হিসাবে বিভিন্ন কার্যাবলীর বিশ্লেষণ—যন্ত্রপাতি সজ্জা, নোটবুক, সংগ্রহ, বিভাগীয় রিপোর্ট প্রভৃতি।

(৩) শ্রেণীতে প্রশ্ন ও আলোচনা।

(৪) শিক্ষার্থীর উল্লেখযোগ্য আচরণের পর্যবেক্ষণ (সাধারণভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে)।

(৫) ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে সভাসমিতি ও আলোচনা।

কার্যকরী জ্ঞান বৃদ্ধির মূল্যায়ন

যখন কোন বিজ্ঞান শিক্ষার্থী কোন সমস্যা সমাধান করে, তখন তাহার মধ্য দিয়া সে কিছু বিষয়বস্তুর জ্ঞান, নীতি, অথবা সাধারণীকৃত বুদ্ধির পরিচয় দেয়। এই জ্ঞানের মূল্যায়ন করা দরকার। কারণ শিক্ষার্থীর মানসিক বুদ্ধির একটি বৃহত্তর পরিমাপ উহাতে বিদ্যমান। চিন্তা জগতে বিষয় জ্ঞানের প্রভাব অনস্বীকার্য। অনেকে বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর পরীক্ষার পরামর্শ দেন; কিন্তু ইহা অনুচিত। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ছোট ছোট পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর বিষয় জ্ঞানকে যাচাই করিলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই উপকৃত হন। শিক্ষক

অক্ষমতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া এবং প্রয়োজনমত সাহায্য করিয়া শিক্ষার্থীদের ব্যবধান দূর করিতে সক্ষম হইবেন। ইহা ছাড়াও অনেকে কোন একক শিক্ষাদান সমাপ্তির পরে পরীক্ষা করিয়া শিক্ষার্থীর মানসিক বৃদ্ধির পরিমাপ করেন, কিন্তু পূর্বের মানসিক অবস্থার পরিমাপ না করিয়া কেবলমাত্র পাঠদানের পরীক্ষা করিলে কি করিয়া বৃদ্ধি বুঝা যাইবে? সেইজন্য পাঠদানের পূর্বে এবং পরে দুইটি পরীক্ষা করিলে পাঠদানে শিক্ষার্থীর কি পরিবর্তন আসিয়াছে তাহা ধরা যাইবে।

বর্তমানে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের কার্যকরী জ্ঞানের মূল্যায়ন চলিতেছে। নীচে একটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

(১) **প্রদর্শনী পরীক্ষা**:—একটি টিনের পাত্রে কিছু জল রাখা হইল। উপরে একটি ছিপি দিয়া টিনটিকে সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়। ছিপি খোলা অবস্থায় টিনের তলায় তাপ দিয়া জল ফুটান হইল। জলীয় বাষ্প বেগে বাহির হইলে ছিপিটি দিয়া টিনের মুখ তাড়াতাড়ি বন্ধ করা হইল এবং তাপ সরাইয়া ফেলা হইল। টিনটিকে ঠাণ্ডা করিলে দেখা যাইবে যে উহা তোবড়াইয়া গিয়াছে।

শিক্ষার্থীর জন্য প্রশ্ন:

(ক) এই প্রদর্শনীতে কি লক্ষ্য করিলে? ইহা হইতে কি সিদ্ধান্ত করিতে পার?

(খ) এই প্রদর্শনীতে যাহা ঘটিয়াছে এবং ঐ ঘটনা ব্যাখ্যা করিতে যে বিষয়গুলি প্রয়োজনীয় তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

(গ) ঘটনা ব্যাখার জন্য মূল্যবান বিষয়গুলির নাম কর।

(ঘ) কি কি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং কোন্‌গুলি ধরিয়া লইয়া ঐ সিদ্ধান্তে আসিতেছ তাহাদের নাম কর।

(ঙ) ছিপি দেওয়ার পর তাপ সরান হইল কেন?

(চ) জল উত্তপ্ত করার কারণ কি?

(ছ) জল গরম করার কাজ অন্য কি উপায়ে করা যাইত তাহাদের দুইটির নাম কর।

বিজ্ঞান শিক্ষায় অন্যান্য মানসিক উৎকর্ষতার মূল্যায়ন

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিষয় জ্ঞান ছাড়াও প্রতিফলিত চিন্তা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, কর্মে আগ্রহ, সৃষ্টির প্রচেষ্টা, সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়ে মানসিক উৎকর্ষতার মূল্যায়ন করার চেষ্টা চলিতেছে। পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানে ঐ বিষয়গুলির যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভবপর। এই মূল্যায়নে **কার্টিজ, ডেভিস, টাইলার, হর্টন** প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানে মূল্যায়নের জন্য এত বেশী ও বিবিধ হাতিয়ারের প্রয়োজন হয় যে তাহা সঠিকভাবে অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য। পরিসংখ্যানের ব্যাখ্যা, অনুমানের ক্ষমতা, দক্ষতাও কৌশল, নীতির যথাযথ প্রয়োগ, প্রমাণের প্রকৃতি, বিশ্বাসের মাত্রা প্রভৃতি পরিমাপের জন্য বিভিন্ন অভীক্ষার দ্বারস্থ হইতে হয়। প্রতি অভীক্ষার কৌশলও ভিন্ন প্রকৃতির। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নীচে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

সমস্যার আবিষ্কার ও তাহার সংজ্ঞা নির্ণয়ঃ—এই বিষয়ে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

(১) কোন বিশেষ অবস্থাকে তালিকাভুক্ত করা এবং সেই অবস্থাতে শিক্ষার্থীর আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলিকে লক্ষ্য করার মাধ্যমে উক্ত বিষয়ের সমাধান মিলিতে পারে। যেমন—"পর পর তিনটি পাত্রে (১, ২, ৩,) জল আছে। প্রথমটিতে ফুটন্ত, দ্বিতীয়টিতে ঈষৎ উষ্ণ এবং তৃতীয়টিতে ঠাণ্ডা জল আছে। প্রথম হইতে তৃতীয় পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে হাত ডুবাইলে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা বলিয়া বোধ হইবে। তৃতীয়ের পরে দ্বিতীয়টিতে হাত দিলে গরম বলিয়া অনুভূত হইবে। কেন ?" এই অবস্থাটিতে শিক্ষক 'উষ্ণতা' সম্বন্ধে সমস্যা সৃষ্টি এবং শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা তালিকাভুক্ত করিতে চাহিতেছেন।

বলাবাহুল্য এই পদ্ধতিতে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। এই ধরণের সমস্যা সৃষ্টি বিজ্ঞানাগারে, বিদ্যালয়ে এবং প্রয়োজন হইলে বিদ্যালয়ের বাহিরে হইতে পারে। এই পদ্ধতিতে বিশেষ অসুবিধা হইল পূর্ব হইতে শিক্ষার্থীর বাঞ্ছিত আচরণের সংজ্ঞা

ঠিক করিয়া রাখিতে হয়। অন্যথায় প্রয়োজনীয় আচরণের পরিববর্তে অপ্রয়োজনীয় আচরণগুলি প্রাধান্য লাভ করিবে। দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে সমস্যাসৃষ্টিকারী আচরণ বেশী হইলে শ্রেণীর কাজে ক্ষতি হয়। সেইজন্যে পাঠদানকালে চার বা পাঁচটির বেশী একরূপ আচরণ রাখা উচিত নয়।

(২) সমস্যাসৃষ্টি ও তাহার সংজ্ঞা নির্ণয়ের দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল রচনামূলক প্রশ্ন। উদাহণের সাহায্যে তাহা আলেচিত হইল।

"এড্ভোকেট্ (গোলাপ) শীতে বেশী ফোটে—গরমে তত ফোটে না বা তত বড়ও হয় না। কি-কি প্রশ্নের অবতারণা করিলে এই পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করা যাইবে?"

শিক্ষার্থীকে সমস্যার সংজ্ঞা নির্ণয়ে জ্ঞানদানের সংগে সংগে তাহাদের ফলেরও মূল্যায়ন চলিবে। যেমন কোন একক বা বিষয়বস্তু মনোনীত করিয়া শিক্ষক সমগ্র একক বা বিষয়টিকে কার্যের মাধ্যমে পরিবেশন করিলেন। শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রশ্ন সাজাইয়া বিষয়টিকে সমস্যাকারে প্রকাশ করিতে বলা হইল। সমস্যাবহুল প্রশ্নের বিস্তৃতি ও গুণ শিক্ষার্থীর সমস্যাসৃজনকারী ক্ষমতার পরিমাপ প্রদান করিবে।

সমস্যা সমাধানের জন্য সংবাদ সংগ্রহঃ—সমস্যা সমাধানের এই ধাপে বহু মৌলিক দক্ষতার প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার বহু উপাদান পঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর গোচরীভূত হয়। সেখানে যথোপযুক্ত পথপ্রদর্শনায় শিক্ষকের ভূমিকা খুব বেশী। ধারাবাহিকভাবে পাঠাগার ব্যবহার, অন্যান্য আনুষঙ্গিক পাঠ্যবিষয় অধ্যয়ন ও সুষ্ঠুভাবে পঠনের গুরুত্ব খুব বেশী। শিক্ষক এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীর অসুবিধা ও ত্রুটিগুলি নির্ধারিত করিয়া উপযুক্ত সাহায্য প্রদান করিবেন।

পঠনে সাহায্যের জন্য প্রতি শিক্ষার্থীকে অধীত বিষয়টিকে সজোরে পড়িতে বলা হইবে। কেহ শব্দ, আবার কেহ অর্থপূর্ণ শব্দসমষ্টির একত্রে ব্যবহার জানে। পঠনের পর ঐ বিষয়ে তাহাদের অর্থবোধ হইয়াছে কি না তাহার মূল্যায়নের জন্য

কয়েকটি প্রশ্ন করা হইবে। আবার অনেক শিক্ষার্থী বিজ্ঞানের ভাষা বুঝিতে পারে না। তাই যে সকল শব্দ শিক্ষার্থীর অসুবিধা সৃষ্টি করিতেছে সেগুলির সংজ্ঞা পূর্বেই নির্ণয় করা উচিত এবং ঐ গুলির ব্যাখ্যার জন্য শিক্ষার্থীরও অভিধানের ব্যবহার জানা উচিত। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে শিক্ষার্থী যদি বিভিন্ন খবরের উৎস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকে তবে তাহার পক্ষে সমস্যা সমাধান সহজ হইয়া দাঁড়ায়। খবরের উৎস জানিবার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা যাইতে পারে—

(১) পৃথিবীর উৎস সম্বন্ধে তথ্য কোথায় পাওয়া যাইবে?

(২) বাঁশের আড় বাঁশিতে যে ছেঁদা থাকে তাহাকে সজ্জিত করার নিয়মাবলী কোথায় পাওয়া যাইবে?

(৩) মরীচিকা দেখার কারণ কোন প্রসংগে আসে? তাহা কোথায় আলোচিত হইয়াছে?

উক্ত প্রশ্নে শিক্ষার্থী কোন্ পুস্তকে, বা ম্যাগাজিনে বা খবরের কাগজে সেই তথ্য পাওয়া যায় তাহা নির্দেশ করিবে। অক্ষম হইলে শিক্ষক তাহাকে সংবাদ সংগ্রহের কাজে সাহায্য করিবেন। কোন কোন খবর সংগ্রহে শিক্ষার্থীকে আবার পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্য লইতে হয়। সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ শিক্ষার্থীর পক্ষে খুব মূল্যবান কাজ। তাহার মূল্যায়ন করা উচিত। খবর সংগ্রহের দক্ষতার' মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর কাজের বিশ্লেষণের মধ্যে বিশেষ করিয়া ধরা পড়ে। শিক্ষার্থীর কার্যতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) লিখিত ও মৌখিক বিবরণ।

(খ) প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ।

(গ) পরীক্ষার লিখিত বিবরণ।

(ঘ) নোট বই।

(ঙ) যন্ত্রপাতির সজ্জা।

(চ) অংকন, চিত্রণ প্রভৃতি।

নীচে যন্ত্রপাতির সজ্জা ও সংবাদ সংগ্রহে শিক্ষার্থীর দক্ষতার মূল্যায়ন করার উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

(১) লবন, খড়ির গুঁড়া, লোহাচুরের মিশ্রণ, কিছু জল, একটি চুম্বক ও তোয়ালে প্রদত্ত হইল।

প্রশ্ন ঃ কি করিয়া উক্ত মিশ্রণ হইতে উপাদানগুলিকে পৃথক করা যাইবে?

(২) একটি বড় জলপূর্ণ চৌবাচ্চা, তাহার নীচে একটি খালি চৌবাচ্চা, কিছু কাঁচের নল ও রবারের নল প্রদত্ত হইল।

প্রশ্ন ঃ কি করিয়া সহজে ছোট চৌবাচ্চাটিকে জলপূর্ণ করা যাইবে?

সমস্যা সমাধানের জন্য ঘটনার ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তে পৌঁছান ঃ

সমস্যা সমাধানের জন্য কতকগুলি ঘটনার সম্মুখীন হইতে হয়। সেই ঘটনাগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করা একান্ত দরকার হইয়া পড়ে। সিদ্ধান্তে পৌছানর প্রথম ধাপই হইতেছে—ঘটনাকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা। বিভিন্ন প্রকারে এই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্ভবপর। নীচের উদাহরণে তাহার একটি পদ্ধতি দেখান হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে তিন ধরণের উত্তর আশা করা হইয়াছে।

নির্দেশনা ঃ একটি পরীক্ষার বিবরণ এবং তাহার নীচে পরীক্ষার ব্যাখ্যা হিসাবে কয়েকটি উক্তি দেওয়া হইয়াছে। মনে করা হইল যে পরীক্ষার বিবরণটি নির্ভুল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া প্রতি উক্তিকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর।

১। উক্তিটি যদি প্রাপ্ত ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে উক্তিটিকে 'ক' দ্বারা চিহ্নিত কর।

২। উক্তিটি সত্য বলিয়া অনুভূত হইলেও ব্যাখ্যাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে ঘটনা অপ্রচুর হইলে উক্তিটিকে 'খ' দ্বারা চিহ্নিত কর।

৩। পরীক্ষালব্ধ ফলের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য অসত্য প্রমাণিত হয় এমন উক্তিকে 'গ' দ্বারা চিহ্নিত কর।

পরীক্ষা ঃ—জল ও পটাশপারমাঙ্গানেট দ্রবণে হাইড্রোজেন গ্যাস চালিত করা

হইল। পরীক্ষাটি কয়েকবার করা হইল; কিন্তু কোন বারই দ্রবণের রং পরিবর্তিত হইল না।

পরে ঐ গ্যাস চলা কালে ঐ দ্রবণে কিছু সাল্‌ফিউরিক এসিড দেওয়া হইল। রং-এর পরিবর্তন হইল না। দুই চার টুক্‌রা দস্তা দেওয়া হইল। এইরূপ পরীক্ষা ১৫/২০ বার করা হইল এবং প্রতি বারই দেখা গেল যে দ্রবণটি রংবিহীন হইয়াছে।

(অ) দস্তা ও সাল্‌ফিউরিক এসিডে যে নূতন হাইড্রোজেন হইয়াছে তাহাই দ্রবণকে রংবিহীন করিয়াছে (২)।

(আ) জল ও পটাশ পারমাঙ্গানেট দ্রবণকে পূর্বে তৈরী হাইড্রোজেন রং বিহীন করিতে পারে না (১)।

(ই) হাইড্রোজেন পটাশ পারমাঙ্গানেট দ্রবণকে রং বিহীন করে (৩)।

(ঈ) নূতন হাইড্রোজেন পটাশ পারমাঙ্গানেট দ্রবণকে রংবিহীন করে (২)।

(উ) সাল্‌ফিউরিক এসিড মিশ্রিত পটাশ পারমাঙ্গানেট দ্রবণকে হাইড্রোজেন গ্যাস রং বিহীন করে (৩)।

উক্ত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করার সময় দেখা গিয়াছে যে শিক্ষার্থী সাধারণতঃ দুই ধরণের অবস্থার সম্মুখীন হয়। সেইজন্য অনেকে ঘটনা ও নীতির মধ্যে পার্থক্য টানিবার জন্য ভিন্ন ধরণের পরীক্ষার আশ্রয় লন। এই পরীক্ষায় লটারী পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের শতাধিক প্রশ্ন বাছিয়া শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয়। নীচে উদাহরণের সাহায্যে তাহা বুঝান হইতেছে।

নির্দেশনাঃ—নীচে একটি উদাহরণ দেওয়া হইল। ইহা ঘটনা বা নীতি তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। উদাহরণটি একটি উক্তি। ঐ উক্তিটিকে নিম্নলিখিতভাবে ক, খ, গ এবং ঘ এই চারিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে।

(ক) উক্তিটি ঘটনার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

(খ) উক্তিটি বিচক্ষণ ব্যক্তি সমর্থিত নীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

(গ) উক্তিটি বিদ্বজ্জন অসমথিত নীতির উপর দণ্ডায়মান।

(ঘ) উক্তিটি সাধারণের বিশ্বাসভাজন ; কিন্তু ঘটনা দ্বারা সমর্থিত নয়।

(১) **উদাহরণ** ঃ—সূর্য হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে।

	ক	খ	গ	ঘ
১				×
২			×	
৩	×			

	ক	খ	গ	ঘ
১				×

ধারণা সৃষ্টি ও পরীক্ষা ঃ—পরীক্ষার সময় ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া কয়েকটি অস্থায়ী ধারণা স্থির করা হয়। ঐ ধারণা সৃষ্টি করা শিক্ষকের শিক্ষাদানের এক অপরিহার্য অংগ। কিন্তু ঐ ক্ষমতাতে পারদর্শী করার পূর্বে শিক্ষার্থী তাহার কতখানি অধিকারী তাহা নির্ণয় করা দরকার। নির্ণয় পদ্ধতি একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝান হইতেছে।

নির্দেশনা ঃ—নীচে কতকগুলি উক্তি দেওয়া হইল। কাহারও কাছে সেই উক্তিটি সত্য—আবার কাহারও কাছে তাহা মিথ্যা। কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ঐ উক্তিগুলির সত্য-মিথ্যা যাচাই করিতে পারিবে ?

নীচে একটি উদাহরণে এই যাচাই পদ্ধতি দেখান হইল।

নমুনা উক্তি ঃ—দোলকের দোলনকাল ছুলের উপর নির্ভর করে না।

পদ্ধতি ঃ—উক্তিটি সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য একই বস্তুর বিভিন্ন আয়তনের ছুল লইয়া একই স্থানে ও নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে পরীক্ষা করা হইল। আবার বিভিন্ন ধাতুর ছুল লইয়া পরীক্ষা করিয়া প্রতিবার যদি একই উত্তর পাওয়া যায় তবে উক্তিটি সত্য বলিয়া ধারণা করা হইবে।

এখন নীচে কয়েকটি উক্তি দেওয়া হইল। তাহাদের সত্য-মিথ্যা যাচাই কর।

উক্তির তালিকা :

(১) দোলকের দোলনকাল তাহার দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে।

(২) বায়ুর আয়তন ও চাপের গুণফল সর্বদা সমান হইবে।

(৩) জলে ভাসমান কোন বস্তুর ওজন তাহার অপসারিত জলের ওজন অপেক্ষা হালকা।

(৪) বিকাল অপেক্ষা সকালে গাছের পাতায় শ্বেতসার অনেক বেশী থাকে।

(৫) টিনের কৌটায় বেশীদিন কমলালেবুর রস থাকিলে টকিয়া যায়।

(৬) জলীয় বাষ্প থাকার দরুণ বাতাস ভারী হয়।

(৭) ঠাণ্ডা করিলে জলীয় বাষ্পের আয়তন কমে।

(৮) সূর্যকিরণ না পাইলে গাছ খাদ্য তৈরী করিতে পারে না।

(৯) বায়ু মিশ্র পদার্থ।

(১০) বিকর্ষণই চৌম্বকত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

সিদ্ধান্তে পৌঁছান ও ঘটনার সাধারণীকরণ :

সমস্যা সমাধানের এই পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে সাহায্য করিবেন। ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও যথাযথ সাধারণীকরণের মধ্যে বিজ্ঞানের আসল অর্থ নিহিত রহিয়াছে। বিশেষ বিশেষ পরীক্ষার উপর ভিত্তি করিয়া ঘটনাগুলিকে সাজাইয়া শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করিতে হয়—যাহাতে শিক্ষার্থী সহজে অথচ মৌলিক ক্ষমতা দেখাইয়া সিদ্ধান্তে আসিতে এবং ঘটনার সাধারণীকরণ করিতে পারে। নীচে ঘটনা ও সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি উক্তি প্রদত্ত হইল। একটিকে ঠিক মত বাছিয়া লইয়া একটি সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে।

নমুনা ঘটনা :—একটি কাঁচের 'বিকারে' অবস্থিত চুণের জলের ভিতর নলের মাধ্যমে কার্বণ-ডাই-অক্সাইড পাঠান হইল। চুণের জল ঘোলা হইল। আরও কিছুক্ষণ পাঠান হইল। চুণের জল স্বচ্ছ আকার ধারণ করিল। উহাকে গরম করা হইল। ঘোলা ভাব আবার ফিরিয়া আসিল। কার্বণ-ডাই-অক্সাইড

জলে দ্রবণীয় ধরিয়া উক্ত ঘটনা হইতে কি সিদ্ধান্তে আসা যায় ? নিম্নের উক্তির মধ্যে যেটি সবচেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত তাহা স্থির কর।

(১) কার্বণ-ডাই-অক্সাইড চুণের জলকে ঘোলা করে।

(২) কার্বণ-ডাই-অক্সাইড চুণের জলকে ঘোলা করে কি না জানিবার জন্য আরও তথ্য দরকার।

(৩) কার্বণ-ডাই-অক্সাইড চুণের জলকে ঘোলা করে না।

নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে উক্ত স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তের পক্ষে যেটি সবচেয়ে বেশী খাটে তাহা স্থির কর।

(ক) কিছুক্ষণ অন্তর চুণের জলের ভিতর দিয়া Co_2 পাঠাইলে চুণের জল ঘোলা হইবে না। কারণ চুণের জল স্বচ্ছ হইয়া ছিল।

(খ) চুণের জলে Co_2 পাঠাইয়া তাপ দিলে ঘোলা হয়। কারণ তাপ দেওয়ার পর ঘোলা হইয়াছিল।

(গ) চুণের জলে Co_2 পাঠাইলে ঘোলা হয় ; কিন্তু বেশী পাঠাইলে স্বচ্ছ হয়। কারণ যখন তাপ দেওয়া হইল জলমিশ্রিত Co_2 কিছু বাহির হওয়ার ফলে আবার ঘোলা হইল।

(ঘ) Co_2 চুণের জলকে ঘোলা করে না। প্রথমে হয়ত Co_2 বিশুদ্ধ ছিল না।

(ঙ) উত্তপ্ত চুণের জলকে Co_2 ঘোলা করে ; কারণ সে তাহা করিয়াছিল।

নূতন অবস্থায় নীতি প্রয়োগ ঃ

শিক্ষা তখনই কার্যকরী হয় যখন জীবনের বিভিন্ন সমস্যায় তাহার যথোপযুক্ত প্রয়োগ দেখা যায়। শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র বিষয় জ্ঞানে পণ্ডিত করিয়া তোলাই বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। বিষয় জ্ঞানের মাধ্যমে সে নিত্য নূতন পদ্ধতি অনুসরণ করিবে—প্রয়োজন হইলে নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা নূতন পদ্ধতি সৃষ্টি করিবে। শিক্ষার্থীর কৌতূহল—তাহার ঔৎসুক্য মনের নানা প্রশ্ন সমাধানের আগ্রহ—এ সকলই তাহাকে বিষয়ের মাধ্যমে নূতন নীতি শিক্ষায় সাহায্য করিয়া থাকে। বাস্তবক্ষেত্রে সে সেই নীতিগুলিকে প্রয়োগ করিতে পারিলে খুবই

আনন্দিত হয় এবং বিজ্ঞান পাঠে অতিশয় আগ্রহী হইয়া উঠে। নূতন অবস্থায় নীতি প্রয়োগের মূল্যায়ন বর্তমানে অধিক পরিমাণে আরম্ভ হইয়াছে। নীচে একটি রচনামূলক উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

প্রশ্ন ঃ 'দোয়াতের মুখে ছিপি আট্‌কাইলে তাপ দিয়া ছিপি সহজে খোলা যায়'—এই উক্তিটি যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই নীতিসম্মত অন্যান্য উদাহরণ দাও।

এই প্রকার প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রয়োগ ক্ষমতার মূল্যায়ন করা যায়। কিন্তু তাহাতে নম্বর দেওয়া খুব কষ্টকর। কারণ প্রশ্নটি রচনামূলক। ঠিক মূল্যায়ন করা সহজ নয়। তাহা ছাড়া ইহা সময়সাপেক্ষ ও অসুবিধাজনক। বর্তমানে এই অসুবিধা দূর করার জন্য নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ধরণের একটি প্রশ্ন আলোচিত হইতেছে।

প্রশ্ন ঃ "কয়েকটি লোক মরুভূমি পাড়ি দিবে বলিয়া সংগে উটের পিঠে মাটির কুঁজাতে কিছু জল লইল। পথে রাত্রি হইল। দিনের অনুপাতে রাত্রিতে কুঁজার জলের উষ্ণতা কিরূপ থাকিবে?"

নির্দেশনা ঃ প্রশ্নটি পড়িয়া নীচের সিদ্ধান্ত হইতে যেটি সঠিক তাহা বাছিয়া লও।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) রাত্রিতে কুঁজার জল অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকিবে।

(খ) রাত্রে ও দিনে জলের উষ্ণতা একই থাকিবে।

(গ) রাত্রিতে কুঁজার জল অপেক্ষাকৃত গরম থাকিবে।

নির্দেশনা ঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির মধ্যে যেটি উক্ত সিদ্ধান্তের একান্ত কারণ সেটি বাছিয়া লও।

কারণ ঃ—(১) রাত্রিতে মরুভূমি ঠাণ্ডা হইবে এবং সংগে সংগে কুঁজার জলও ঠাণ্ডা হইবে।

(২) রাত্রিতে মরুভূমি ঠাণ্ডা হইলেও মাটির কুঁজা অপরিবাহী হওয়ায় জল একই প্রকার উষ্ণ থাকিবে।

(৩) রাত্রির তুলনায় দিনে মরুতে বেশী গরম থাকায় বেশী বাষ্পীভবন হইবে এবং সেইজন্য দিনে জল বেশী ঠাণ্ডা হইবে।

(৪) রাত্রি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকায় বাষ্পীভবন বেশী হইবে ও জলের উষ্ণতা রাত্রে কম থাকিবে।

(৫) রাত্রিতে নিম্নচাপ কম থাকায় বেশী বাষ্পীভবন হইবে ও জল ঠাণ্ডা থাকিবে।

(৬) দিনে বাষ্পীভবন যেমন বেশী হইবে, তেমনই রাত্রিতে আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকিবে। সুতরাং জলের উষ্ণতা একই থাকিবে।

(৭) দিনে আবহাওয়া বেশী গরম থাকায় জল ঠাণ্ডা বলিয়া অনুভূত হইলেও জলের উষ্ণতা একই থাকিবে।

(৮) রাত্রিতে বায়ুর চাপ বেশী হওয়ায় জলের উত্তাপও বৃদ্ধি পাইবে। কারণ জলের আয়তন একই আছে।

শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন ঃ

এই পর্যন্ত কাগজে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন পদ্ধতি দেখান হইয়াছে। কখনও কখনও শিক্ষার্থীর আচরণের মাধ্যমে শিক্ষানীতিগুলির মূল্যায়ন করা হয়। কারণ বিভিন্ন শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর আচরণ পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং আচরণ মূল্যায়নের একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। এইরূপ কয়েকটি আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

(১) **প্রশ্নপদ্ধতি ঃ** বিজ্ঞান পাঠদানকালে শিক্ষার্থীর মনে বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় হয়। সুনিয়ন্ত্রিত ধারানুসারে শিক্ষকের উচিত সেই সকল প্রশ্নের জবাব দিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করা। তবে একটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে উত্তর-দান কালে সকল শিক্ষার্থী আগ্রহের সংগে তাহা গ্রহণ করিতেছে, না উত্তরটি শ্রেণীর কয়েকটি আগ্রহী ও মনোযোগী শিক্ষার্থীর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে।

ইহা ছাড়া শিক্ষক পাঠদানের পর ঐ প্রসংগে কি কি প্রশ্ন হইতে পারে তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন। সঠিক উত্তর দান অপেক্ষা বুদ্ধিযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা মোটেই নিকৃষ্ট নয়। বরং ভাল প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উন্নততর প্রমাণ পাওয়া সম্ভবপর।

(২) **আলোচনা ঃ** অনেক সময় বিজ্ঞান শিক্ষাদানকালে দলীয় আলোচনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। শ্রেণীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া দলীয় আলোচনা, বিশ্লেষণ, সমালোচনা, সূত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞান পাঠে অনুভূত হয়। শিক্ষার্থী এই আলোচনায় কিরূপ অংশ গ্রহণ করিতেছে তাহার মাধ্যমে তাহার আচরণ বুঝা যায়। শিক্ষক এই সকল আচরণগত পার্থক্য লক্ষ্য করিবেন। ইহা মূল্যায়নে ও শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত উপদেশ প্রদানে সাহায্য করিবে।

(৩) **পরীক্ষা ও শিক্ষার্থীর সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ ঃ**

শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী থাকিলে ব্যক্তিগত সাহায্য শিক্ষকের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহাকে সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। শিক্ষার্থী যখন নিজে পরীক্ষা করিবে তখন শিক্ষক তাহাদের প্রত্যেকের কাছে যাইবেন। যন্ত্রাবলীর সুষ্ঠু সজ্জা, ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি শিক্ষার্থীর কাজ তিনি লক্ষ্য করিবেন। সুসংহত চিন্তাপ্রসূত বুদ্ধিযুক্ত প্রশ্ন, শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভজনিত আচরণ, সংযমের সহিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষার্থীর মনের অন্যান্য দিকগুলির মূল্যায়নে যথেষ্ট সাহায্য করে। এইরূপে শিক্ষক তাহার আচরণগত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করিতে পারেন।

(৪) **বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগে প্রবণতা ঃ**

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নীতির সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয়। বিদ্যালয়ে কি কি অসুবিধা আছে—কিরূপে তাহার সমাধান মিলে—এই বিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। বিদ্যালয়ে উপযুক্ত আলো, বাতাস প্রভৃতির জন্য তাহারা চিন্তা করিবে—পরিকল্পনা করিবে—

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নমুনা পরীক্ষা করিবে—তাহাদের ফল ও পরিকল্পনা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে জানাইবে। এইরূপ প্রবণতাকে শিক্ষক উৎসাহ দ্বারা বর্ধিত করিবেন এবং প্রয়োজনমতে এই সকল কাজে তাহাদের সহিত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন।

বিদ্যালয়ের বাহিরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঃ

বিজ্ঞান শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা কোন ক্রমেই উচিত নয়। বিদ্যালয়ে সকল পদ্ধতির প্রয়োগ সময় এবং অন্যান্য কারণে সম্ভবপর নয়। তাই শিক্ষার্থী বাড়ীতে অসম্পূর্ণ কাজগুলি করিতে পারে। ব্যাটারী ও তার লইয়া কত ছাত্রছাত্রীকে বাড়ীতে টুকিটাকি জিনিষ করিতে দেখা যায়। ইহাতে তাহাদের কৌতূহল প্রশমিত হয় এবং জ্ঞানেরও বিস্তৃতি ঘটে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর এই সকল প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিবেন। প্রয়োজন হইলে পরীক্ষাগারে একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া প্রদর্শনীর জন্য একটি আলমারিতে সাজাইয়া রাখিবেন। বৎসর বৎসর সেগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং পরবর্তী শিক্ষার্থীদের কাছে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করিবে।

(৬) সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঃ

শিক্ষার্থী ক্ষুদ্র হইলেও তাহাদের সদিচ্ছা ক্ষুদ্র নহে। বিজ্ঞান শ্রেণীতে বিভিন্ন রোগের কারণ তাহারা পড়িতেছে। প্রতি বৎসর ঐ সকল রোগে কত লোক অকালে প্রাণ হারাইতেছে। তাহারই প্রতিকারকল্পে শিশু-মন জাগিয়া উঠে। নর্দমা বা দূষিত জলপূর্ণ পুষ্করিণী পরিষ্কার বা বীজাণু মুক্ত করার জন্য বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য সাধারণের মধ্যে সুস্থ অভ্যাস তৈরীতে সাহায্য করা, পাড়ায় ছোট ছোট প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই বিষয়ে জ্ঞানদান, সভা সমিতিতে আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে বহু সমাজ সেবামূলক কাজ করা যাইতে পারে।

ইহা ছাড়া অন্যান্য কার্যাবলীর মাধ্যমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীর আচরণগত পার্থক্যের মূল্যায়ন করিতে পারেন।

পরীক্ষা সম্বন্ধে সুপারিশ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্বন্ধে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে যে সর্বপ্রথম **অখিল ভারতীয় সেমিনার** আহূত হয় সেই সেমিনার বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পরীক্ষা কি ভাবে চলা উচিত সেই বিষয়ে কয়েকটি সুপারিশ করেন। নীচে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

উক্ত সেমিনার ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের **ভুপাল সেমিনার** নির্দেশিত সাধারণ পরীক্ষা পদ্ধতির সুপারিশগুলি সাধারণভাবে সমর্থন করেন। Cumulative Record Card দ্বারা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নতির পরিমাপ সম্ভবপর। ঠিক মত রক্ষিত হইলে বহিঃপরীক্ষার স্থান সে দখল করিয়া বসিবে। কিন্তু ইহা রক্ষা করা খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সুতরাং যতদিন না বিদ্যালয়ে এই কার্ড রাখার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হইতেছে ততদিন আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থায় বহিঃপরীক্ষা এক বিশেষ স্থান দখল করিয়া থাকিবে।

বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ের ক্রিয়াকলাপ, প্রাক্‌টিক্যাল কাজ, পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যাবলী প্রভৃতির কোন মূল্য প্রদান করে না। এখন পুঁথিগত পাঠের সংগে ঐ সকল কার্যাবলীর মূল্যায়ন বিশেষ দরকার। প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে বিদ্যালয়ের কাজ এবং বহিঃপরীক্ষায় নিম্নলিখিত মান দেওয়া যাইতে পারে।

প্রাকটিক্যাল কাজ ঃ { সম্বৎসর কাজের জন্য.........৫০%
বহিঃপরীক্ষার জন্য............৫০%

তত্ত্বমূলক পরীক্ষা ঃ { সম্বৎসর ফলের জন্য............২০%
বহিঃপরীক্ষার ফলের জন্য......৮০%

শিক্ষার্থীকে প্রদত্ত নম্বরগুলি শিক্ষার্থীর ঠিকমত অবস্থান নির্দেশ করে না। তাই **সেমিনার** মনে করেন যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত নম্বর তালিকায় কাঁচা নম্বরের সংগে শিক্ষার্থীর percentile অবস্থানেরও উল্লেখ থাকিবে।

এতদিন পর্যন্ত রচনামূলক প্রশ্নই বহিঃপরীক্ষায় স্থান পাইয়াছে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য **সেমিনার** ভূপাল সেমিনার উল্লিখিত তিন ধরণের

প্রশ্নের সুপারিশ করিয়াছেন—(১) রচনামূলক প্রশ্ন, (২) সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য pointed প্রশ্ন এবং (৩) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন। প্রতি প্রশ্নপত্রের দুইটি বিভাগ থাকিবে। এক বিভাগে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (অর্ধ ঘণ্টার জন্য) এবং অন্য বিভাগে রচনামূলক প্রশ্ন ও সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন (দুই ঘণ্টার জন্য) থাকিবে।

পরীক্ষা পদ্ধতির এই নূতন ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরীক্ষার জন্য নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে এবং ক্রমে বিদ্যালয়ের কাজের জন্য অধিকতর মান প্রদত্ত হইবে। এইরূপে ধীরে ধীরে বহিঃপরীক্ষা অন্তর্হিত হইবে।

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সময় শিক্ষক নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলির সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

শিক্ষার্থীর রেকর্ড ঃ

(১) প্রতি শিক্ষার্থী প্রাকৃটিক্যাল নোটবই রাখিবে। প্রতিদিনের কার্যাবলী সেই নোট বইতে স্থান পাইবে।

(২) বর্হিভ্রমণ বা পরিদর্শনের বিবরণ বিজ্ঞান নোট বইতে তারিখ ও সময় সমেত নিয়মিত লিখিত থাকিবে।

(৩) শিক্ষার্থীর হাতে গড়া যন্ত্রপাতি, প্রজেক্ট প্রভৃতির কার্যাবলী ঐ নোট বইতে স্থান পাইবে।

(৪) সাময়িক পরীক্ষা বা অন্যান্য পরীক্ষার ফল Progress Book-এ লিখিত হইবে। শিক্ষার্থী সেইগুলিতে অভিভাবকের স্বাক্ষর লইবে।

শিক্ষকের রেকর্ড ঃ

(১) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পরীক্ষার হিসাব শিক্ষক একটি তালিকায় লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) শিক্ষকের দিনপঞ্জীতে বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত বহির্ভ্রমণ এবং পরিদর্শনের বিবরণ স্থান পাইবে।

(৩) শিক্ষক শ্রেণীর কার্যাবলী নিজের দিনপঞ্জীতে লিখিয়া রাখিবেন।

(৪) সাময়িক পরীক্ষায় প্রদত্ত অভীক্ষা এবং তাহার ফল শিক্ষক রক্ষা করিবেন।

(৫) তিনি ব্যক্তি এবং সমষ্টির কার্যাবলীর হিসাব রাখিবেন।

(৬) প্রজেক্টারের সহিত রক্ষিত পুস্তকে প্রদর্শিত ফিল্‌ম্ বা ফিল্‌ম্ ষ্ট্রিপের হিসাব থাকিবে।

(৭) তিনি বিজ্ঞান সমিতির কার্যাবলীর হিসাব রাখিবেন।

বিদ্যালয়ের রেকর্ড ঃ

সাময়িক পরীক্ষা সমূহের স্থায়ী রেকর্ড বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

সাধারণ-বিজ্ঞান

তত্ত্বমূলক পরীক্ষা ঃ—(১) নবম, দশম এবং একাদশ শ্রেণীর জন্য প্রতি বৎসর ছয়টি করিয়া সাময়িক পরীক্ষা হইবে।

(২) প্রশ্নপত্র নৈর্ব্যক্তিক হইবে এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিবে।

(৩) পরীক্ষার পর উত্তরপত্র শিক্ষার্থীকে ফেরৎ দিতে হইবে এবং আলোচনা করিতে হইবে।

(৪) সাময়িক পরীক্ষার ফলগুলি বিদ্যালয়ের খাতায় ও শিক্ষার্থীর Progress Book-এ লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৫) প্রতিদিনের শিক্ষণের জন্য শিক্ষক অভীক্ষা প্রস্তুত করিবেন এবং ইহা হইতে সাময়িক পরীক্ষার অভীক্ষা বাছাই করিবেন।

(৬) এই অভীক্ষা তৈরীর জন্য শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক পুস্তক দিতে হইবে।

(৭) বিজ্ঞানের জন্য বৎসরে একটি এবং দুইটির অনধিক আড়াই ঘণ্টার পরীক্ষা হইবে। ঐ পরীক্ষার দুইটি অংশ থাকিবে—অর্ধঘণ্টার জন্য নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা এবং দুই ঘণ্টার জন্য রচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত উত্তরের অভীক্ষা। পুরা

নম্বরের এক তৃতীয়াংশ প্রথম বিভাগে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

ব্যবহারিক পরীক্ষা ঃ

(১) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পরীক্ষা শিক্ষক তত্ত্বাবধান করিবেন, তাহাতে নম্বর দিবেন এবং প্রাকৃটিক্যাল নোট বইতে তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) বাৎসরিক ফলের হিসাবের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচিত হইবে—

(ক) সারা বৎসরের ব্যক্তিগত পরীক্ষা।

(খ) প্রজেক্টর প্রভৃতির ব্যক্তিগত কাজ।

(গ) বিজ্ঞান সমিতি প্রভৃতির অন্যান্য কার্যাবলী।

বৎসরের শেষে ব্যবহারিক কোন পরীক্ষা হওয়া উচিত নয়।

নম্বর বিভাগের সুপারিশ

ব্যবহারিক পরীক্ষা	তত্ত্বমূলক পরীক্ষা
বৎসরের কাজ···৩০%	সাময়িক পরীক্ষাসমূহ······৪০%
	বাৎসরিক পরীক্ষা·········৩০%

পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যার নম্বরের বিভাগ ঃ

সাধারণ বিজ্ঞানের জন্য যে সকল সুপারিশ করা হইয়াছে এই সকল বিষয়ে (Electives) সেগুলি প্রযোজ্য। তবে এখানে বহিঃপরীক্ষা বিদ্যমান—সেইজন্য তাহাদের নম্বরের বিভাজন নীচে প্রদত্ত হইল।

তত্ত্বমূলক পরীক্ষা···৬০	সাময়িক পরীক্ষা······৩০
	বাৎসরিক পরীক্ষা······৩০
ব্যবহারিক পরীক্ষা···৪০	সারা বৎসরের কাজ··· ২০
	বাৎসরিক পরীক্ষা······২০
	মোট·········১০০

বহিঃপরীক্ষার নম্বরের সার্টিফিকেট (Certificate of marks)

(ক) সাধারণ বিজ্ঞান :

(১) শিক্ষার্থীর তিন বৎসরের (IX, X এবং XI) নম্বরের হিসাব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিঃপরীক্ষার কর্তৃপক্ষকে পাঠাইয়া দিবেন।

(২) শিক্ষার্থীর নম্বরের সার্টিফিকেটের পৃষ্ঠায় ঐ নম্বরটি বিদ্যালয়ের নম্বর বলিয়া উল্লিখিত থাকিবে।

(৩) (ক) ব্যবহারিক কাজের মান, (খ) তত্ত্বমূলক কাজের মান এবং (গ) মোট নম্বর—এই তিনভাগে নম্বরটি বিভক্ত হইবে।

(৪) বহিঃপরীক্ষার মোট ফল ঘোষণার সময় সেখানে সাধারণ বিজ্ঞানের ফল প্রদত্ত হইবে।

(খ) **Electives** :—পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা

নিম্নলিখিতভাবে উক্ত বিষয়গুলির (Electives) নম্বর বিভক্ত হইবে।

ব্যবহারিক পরীক্ষা···৪০	বৎসরের ব্যবহারিক পরীক্ষা···৫০%	(২০)
	বাৎসরিক পরীক্ষা···········৫০%	(২০)
তত্ত্বমূলক পরীক্ষা··· ৬০	বৎসরের কাজ··············২০%	(১২)
	বহিঃপরীক্ষা················৮০%	(৪৮)
১০০		১০০

পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ নম্বরগুলি নিম্নলিখিতভাবে নির্দিষ্ট করিবেন।

	আভ্যন্তরীণ	বহিঃপরীক্ষা	মোট
ব্যবহারিক			
তত্ত্বমূলক	ঐ	ঐ	ঐ

প্রতি Elective বিষয়ে শিক্ষার্থীকে পাশের জন্য তত্ত্ব ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় একত্রে পাশের নম্বর পাইলেই চলিবে ; তবে ন্যূনতম নম্বর হিসাবে ঐ দুইটিতে ২০% হইতে ২৫% নম্বর পাওয়া দরকার।

বিজ্ঞান শিক্ষকের সামাজিক ও বৃত্তিগত দায়িত্ব

সামাজিক দায়িত্ব ঃ—বিজ্ঞান শিক্ষকের প্রধানতঃ দুইটি সামাজিক কর্তব্য বিদ্যমান ; একটি—যে সমাজে তিনি বাস করেন সেই সমাজের প্রতি ; অপরটি তাঁহার বিদ্যালয়ের প্রতি। প্রথমটির সহিত সামাজিক খাপ খাওয়ানোর সম্পর্ক রহিয়াছে। যখন শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত, নৈতিক এবং সামাজিক মান উন্নয়নের সহায়তা করিবার জন্য তিনি সমাজে প্রবেশ করেন তখন সমাজেরই একজন হিসাবে সেখানে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হয়। শিক্ষক নিজের জীবনযাত্রা প্রণালী, নৈতিক আদর্শ স্থাপন এবং সামাজিক ব্যবহারের দ্বারা অপরের অনুকরণীয় হইবেন। শাসন বা ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা নয়—বন্ধু এবং উপদেষ্টার ভূমিকায় শিক্ষক সমাজে আবির্ভূত হইবেন। অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীসমাজের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া নিজের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। সহানুভূতি, উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিবেন। কেবল পরিচিতি নয়—বন্ধুবোধে উদ্বুদ্ধ তরুণ শিক্ষক সকলের নিকট সম্মানিত হইবেন।

সমাজের প্রতি আর একটি কর্তব্য বিজ্ঞান শিক্ষকের রহিয়াছে। নাগরিক ও ধর্মীয় জীবন এবং শিক্ষা ও অবসর সময়ের শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহাকে কিছুটা নায়কের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। তবে মনে রাখা দরকার ঐ সকল বিষয়ে নিজে উৎসাহী হইলে তবেই অংশ গ্রহণ করিবেন—নতুবা নহে। অর্ধসমাপ্ত বা অনিচ্ছাকৃত কাজ করা অপেক্ষা ঐ সকল কাজে না প্রবেশ করাই ভাল।

শিক্ষক বন্ধুদের প্রতি দায়িত্ব ঃ—অন্যান্য শিক্ষক বন্ধুর সহিত সহযোগিতা করিয়া বিদ্যালয়ের কাজ করা শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য। সহযোগিতা বলিতে এই বুঝায় যে নিজে এমনভাবে চলিবেন যে অন্যে আগ্রহী হইয়া সেই কাজে সাহায্য করিবে। বর্তমান সমাজে সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের কোন স্থান

নাই। কি জীবিকানির্বাহ—কি অবসর সময় উদ্‌যাপন—এ সবই সহযোগিতার মধ্য দিয়াই সম্ভবপর।

পরিচালক সমিতির প্রতি দায়িত্ব ঃ—বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সদস্যদের সহিত শিক্ষকের সদ্ভাব থাকিবে। শিক্ষকের ব্যক্তিগত মনোভাব থাকা স্বাভাবিক। বিদ্যালয় পরিচালনার বিভিন্ন কাজে শিক্ষকের মতামত বহুক্ষেত্রে দরকার হইয়া পড়ে। শিক্ষক এই সকল ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপন মতের যৌক্তিকতা সদস্যদের গোচরীভূত করার চেষ্টা করিবেন। এই বিষয়ে আলোচনার স্বাধীনতা তাঁহার থাকিবে। তবে মনে রাখা উচিত যে এই সকল আলোচনায় যেন হৃদ্যতা নষ্ট না হয়—বেশ সহানুভূতি এবং সহযোগিতামূলক আলোচনার মাধ্যমে তাঁহারা কোন এক বিশেষ সিদ্ধান্তে আসিবেন। শিক্ষকের মনোমত না হইলেও এই সম্মিলিত দলের আলোচনাপ্রসূত মতকে তিনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিবেন। তখন সেটি তাঁহার মত হইবে; প্রধান শিক্ষক বা সম্পাদকের সহিত এই বিষয়ে মতভেদ উৎকট আকার ধারণ করার পূর্বেই শিক্ষক সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিবেন। তিনি মনে রাখিবেন যে পশ্চাৎ ভাগ হইতে "মিছরীর ছুরি" ব্যবহার অপেক্ষা প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ অনেক বীরত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক কাজ।

বিদ্যালয়ের প্রতি দায়িত্ব ঃ—বিদ্যালয়ের প্রতি দায়িত্ব পালনের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষকের সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ হইতেছে পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতির তত্ত্বাবধান। এত উচ্চ মূল্যের যন্ত্রপাতি অন্য কোন বিভাগে সাধারণতঃ দেখা যায় না। এ বিষয়ে বিজ্ঞান শিক্ষক যেমন কিছুটা ভাগ্যবান তেমনই তাঁহার দায়িত্বপূর্ণ আচরণও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাম্য। সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজ বিভাগের সমস্ত যন্ত্রপাতিকে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ব্যবহারোপযোগী করিয়া রাখিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে যে বহুদিকে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া পরীক্ষাগার পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। নিজের জিনিষ মনে করিয়া তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দামী ও সূক্ষ্ম যন্ত্রের আমদানী করা হইয়াছে।

আনাড়ি হাতে পড়িয়া সেগুলি নষ্ট না হয় বা শিক্ষকের অসাবধানতায় সেগুলি চুরি না যায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। দামী যন্ত্রপাতিগুলিকে তালা চাবির মধ্যে রাখা উচিত। মিতব্যয়িতার সহিত এসিড বা রিএজেণ্ট ব্যবহার প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীকে শিখাইতে হইবে। নতুবা ময়লা ফেলা বাক্সে বা ড্রেনে বহু অপচয় ঘটিবে। শিক্ষক নিজে উদাহরণস্বরূপ হইয়া এই অপচয় বন্ধ করিবেন। এ ছাড়া বিদ্যালয় কক্ষের পরিচ্ছন্নতা, চেয়ার, বেঞ্চ বা ডেস্কের সজ্জার দিকে শিক্ষক বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। যে কোন দিন কেহ তাঁহার ঘর পরিদর্শন করিতে আসিলে তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন। ছুটির পর আলমারিতে চাবি লাগান বা ঘরের দরজা জানালা ঠিকমত বন্ধ করা উচিত। ডেস্কগুলিতে কালির দাগ, ছুরি বা ব্লেডের কাটা দাগ না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। নিজের নামটি অক্ষয় করিয়া রাখিতে বহু শিক্ষার্থীর এই সকল অবান্তর প্রচেষ্টা থাকে। নিজের জিনিষ মনে করাইয়া দিলে তাহারা এইরূপ ক্ষতিকর এবং নোংরা কাজ করিবে না। বুদ্ধিমান শিক্ষক শ্রেণীতে কিছু হিসাবের সময় শিক্ষার্থীকে কাগজ ব্যবহার করিতে বলিবেন। প্রথম হইতে এই অভ্যাস তৈরী করাইলে শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ের জিনিষের উপর মায়া জন্মিবে এবং এ সকল কাজে বিরত হইবে।

পাঠ্যপুস্তক ও পড়ার সামগ্রী :—পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও শিক্ষকের অনেক করণীয় রহিয়াছে। বিজ্ঞানের সব কিছুর দায়িত্ব বিজ্ঞান শিক্ষকের থাকার জন্য প্রধান শিক্ষককে তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিবেন। সেইজন্য বিজ্ঞান শিক্ষককে সে বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে ; তিনি সক্রিয়ভাবে প্রধান শিক্ষককে সাহায্য করিতে উদ্যোগী থাকিবেন। তিনি উপযুক্ত বইএর জন্য সুপারিশ করিবেন ; অর্থের সংকুলান হইলে প্রধান শিক্ষক ক্রয়ের জন্য আদেশ দিবেন। বিভিন্ন শ্রেণীতে অন্তর্বর্তীকালীন পাঠ্যসূচী নির্ণয় বা হাতে গড়া যন্ত্র তৈরীর ব্যাপারে বিজ্ঞান শিক্ষকের প্রচুর স্বাধীনতা থাকিবে।

পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত কার্যাবলী :—প্রতি শিক্ষককে এক বা একাধিক পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত কার্যাবলীতে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষক

সানন্দে এই সকল কাজে যোগ দিবেন। অক্ষম হইলেই পূর্বেই প্রধান শিক্ষককে জানাইয়া দিবেন ; কিন্তু অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া হাল ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়।

বৃত্তিগত দায়িত্ব ঃ—শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা করা এবং তাহাদিগকে শ্রেণীভুক্ত করা শিক্ষকের এক সুমহান দায়িত্ব। প্রতি শিক্ষার্থীকে তাহার শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনার শীর্ষে পৌছাইয়া দিবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। অনেকের ধারণা শিক্ষার্থী সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত না হইয়াই শিক্ষার্থীকে শ্রেণীতে গ্রহণ করিবেন। কারণ তাহা হইলে পূর্ব ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি ভিন্ন দৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদিগকে দেখিবেন। এ ধারণা ভ্রান্ত। পূর্বে শিক্ষার্থী সম্বন্ধে সম্যক অবহিত না হইলে শিক্ষার্থীর সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে বৎসর এমন কি সমগ্র শিক্ষার সময়টিও অতিবাহিত হইতে পারে। চিকিৎসক যেমন ঔষধ দেওয়ার পূর্বে রোগের পূর্ব খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করেন—শিক্ষার্থীকে ঠিকমত শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে শিক্ষকও তাহার বাড়ীর অবস্থা, আর্থিক এবং শারীরিক অবস্থা বিশেষ করিয়া জানিয়া লইবেন। বাড়ীর অবস্থা খারাপ হইলে তাহার মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হইবে। সে সহপাঠীর সহিত ঝগড়া ও মারামারি করিবে—শ্রেণীতে গোলমাল করিবে—পড়াশুনায় অমনোযোগী হইবে এবং ক্রমশঃ তাহার মন শিক্ষা হইতে দূরে সরিয়া যাইবে।

শারীরিক অবস্থা খারাপ হইলে শিক্ষার্থীর পক্ষে পাঠে অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। শিক্ষার্থীর শ্রবণ বা দৃষ্টি শক্তি বা শারীরিক অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন দোষ থাকিলে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহাকে পরিবেশে খাপ খাওয়াইয়া লইতে শিক্ষক সাহায্য করিবেন। তিনি শ্রেণীতে উপযুক্ত আলো, বাতাস এবং শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন এবং আবেগ পরিচালিত শিক্ষার্থী কোন দোষ করিলে শ্রেণীর বাহিরে অন্যের অলক্ষ্যে শিক্ষক তাহার সহিত ব্যবহার করিবেন। সুস্থ এবং ভীতিবিহীন পরিবেশে শিক্ষার্থীকে কাজ করিতে দিবার সকল দায়িত্ব শিক্ষকের।

রোগ হইতে আরোগ্যলাভের পর শিক্ষার্থী যখন বিদ্যালয়ে আসিবে তখন শিক্ষক পাঠের পূর্বে তাহার স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। এটা স্বাভাবিক যে অসুস্থ থাকাকালীন অনধীত পাঠ সম্বন্ধে সে এখন বেশী সচেতন হইবে। ফলে

তাহার পুনরায় অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমন কি অংক, পদার্থ বা রসায়নবিদ্যাতেও অনধীত বিষয়গুলি আপাততঃ বাদ দিয়া বর্তমানের পাঠগুলিকে তৈরী করিতে বলা বিজ্ঞ বিজ্ঞান শিক্ষকের কর্তব্য। ইহাতে কিছু অসুবিধা হইবে সত্য; কিন্তু সময় ও সুযোগমত শিক্ষার্থী ঐগুলির ক্ষতিপূরণ করিবে। মনে রাখিতে হইবে জীবন অপেক্ষা শিক্ষা বড় নয়। স্বাস্থ্য ঠিক রাখিয়া পাঠে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কয়েকদিন পাঠের ক্ষতির জন্য জীবনকে মৃত্যুর সম্মুখে লইয়া যাওয়া উচিত নয়—বাঞ্ছনীয়ও নয়।

শিক্ষার্থী সম্পর্কে সকল তথ্য Cumulative Record Card হইতে পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট তাঁহার ব্যবহারের জন্য ইহা থাকিবে। তিনি তাহাদের মানসিক ক্ষমতা, শারীরিক ও আর্থিক অবস্থা এবং পরিবারের তথ্যও তাহাতে পাইবেন।

শ্রেণী বিভক্ত করার সময় শিক্ষক বিদ্যালয়ের কাজ ছাড়াও বিদ্যালয়ের বাহিরে শিক্ষার্থীর আচরণ ও কার্যাবলী বিবেচনা করিবেন। তাহাতে শিক্ষার্থীকে ন্যায়-সঙ্গতভাবে বিচার করা হয়। এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে কোন একটি বিশেষ পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া দৈনন্দিন কাজ ও আচরণের মধ্যে বিস্তৃত করিয়া দিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়া যাইবে।

শ্রেণীর পরীক্ষায় সকল শিক্ষার্থী যেন কমপক্ষে ন্যূনতম নম্বর পায় তাহার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। শিক্ষার্থীর অকৃতকার্যতা যে সকল সময় উচ্চ পর্যায়ে পরীক্ষা গ্রহণের দরুণ হয় তাহা নহে। শিক্ষাদানের ত্রুটিও তাহাতে বিদ্যমান। বিষয়বস্তুতে ঔৎসুক্য, শিক্ষার আবহাওয়া সৃষ্টি, সহানুভূতিপূর্ণ আগ্রহ এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদানের উপর দরদ—এইগুলি শিক্ষার্থীকে অকৃতকার্যের হাত হইতে রক্ষা কবিবে। প্রথমে সহজ হইতে ধীরে ধীরে যদি কঠিনতর ধাপে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া চলে তবে শিক্ষার্থী পরিবেশের সঙ্গে সহজে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। অকৃতকার্যতায় শাস্তির ভয় দেখান অপেক্ষা পরিমাণগত ও গুণগতভাবে শিক্ষার্থী উক্ত প্রক্রিয়ায় অনেক বেশী শিক্ষালাভ করিবে। শিক্ষার্থী কৃতকার্য হইলে তিনি তাহাকে উৎসাহিত করিবেন। তাহাতে সে বৃহত্তর কর্মে

আত্মনিয়োগ করিবে। বিষয়বস্তুতে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষার মনস্তত্ব. এবং শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে অবহিত থাকিবেন। তাঁহাকে অফুরন্ত উৎসাহ এবং অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে। শিক্ষার্থী তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে প্রীতি লাভ করিবে এবং ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইবে। এই সকল গুণগুলি ধারাবাহিকভাবে সংযোজিত হইলে শিক্ষার্থী স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কাজে অগ্রসর হইবে। শিক্ষককে বর্তমানে মনে রাখিতে হইবে যে তিনি শিক্ষক বন্ধু, দার্শনিক ও উপদেষ্টা—কেবলমাত্র সংবাদ পরিবেশনকারী নহেন।

বৃত্তিগত প্রস্তুতির দায়িত্ব ঃ—শিক্ষককে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিতে হইবে। জ্ঞানের বিস্তৃতির সংগে সংগে নিত্য নূতন তথ্য ও আইন চক্রবৃদ্ধি হারে বর্ধিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন বিষয়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সঞ্চার করিয়াছে। কখনও কখনও পরিবর্তনের মাঝে নূতন পরিবর্তন আসিয়া অগ্রগতির ধারাকে ভিন্ন মুখে পরিচালিত করিতেছে। বিষয়বস্তু ছাড়াও সাধারণ মনস্তত্ব, শিক্ষার মনস্তত্ব, পাঠ্যক্রম প্রস্তুত, বিদ্যালয় পরিচালনা, ব্যক্তিগত পরিচালনা প্রভৃতি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন চলিতেছে। সেইজন্য কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাওয়ার সংগে সংগে শিক্ষকের পাঠ শেষ হয় না—ইহা শিক্ষাজগতের প্রবেশপথ মাত্র। শিক্ষণ হইতেছে সমাজের জন্য সেবার প্রস্তুতি মাত্র। নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার সংগে তাঁহার পরিচয় ঘটাইবে—শিক্ষকের নিকট নূতন জগতের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। সেখানে দরকার একনিষ্ঠ সাধনা—যাহার ফলে জ্ঞান সমুদ্রের অমৃত পান করিয়া তিনি পরম তুষ্টি লাভ করিবেন। ইহা যে কেবল ব্যক্তিগত আনন্দ তাহা নহে—ইহা সামাজিক চাহিদা। শিক্ষণের পরে অনেকের মুখেই নূতন পদ্ধতির অক্ষমতার কথা শুনি। কিন্তু শিক্ষক যদি সচেতন থাকেন তবে কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে নূতন পদ্ধতি প্রয়োগের একটি সুনির্দিষ্ট পথ দেখাইয়া দিবে। সময় ও সুযোগ অনুযায়ী তিনি নূতন পদ্ধতি প্রয়োগ করিবেন। পরিবেশ অনুযায়ী যদি কিছু সংশোধন করার দরকার বলিয়া অনুভূত

হয় তবে সেই পরিবর্তন করার সুপ্রচুর স্বাধীনতা শিক্ষকের থাকিবে। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা এবং উৎসাহের উপর সকল প্রকার প্রয়োগ নির্ভরশীল।

স্নাতক হইবার পর যাঁহারা শিক্ষকতা জীবনে পদার্পণ করিতেছেন তাঁহারা যদি শিক্ষা বিভাগে থাকিতে চান তাহা হইলে পরবর্তী পাঁচ কি ছয় বৎসরের মধ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের সচেতন প্রয়াস থাকিবে। পরে তিনি শিক্ষক শিক্ষণ প্রাপ্ত হইবেন। মাঝে মাঝে যখন রিফ্রেসার্স কোর্সের জন্য ডাকা হইবে তখন তিনি আগ্রহ ও আন্তরিকতার সহিত সাড়া দিবেন। এ ছাড়া বিজ্ঞানের সাময়িক পত্রিকা, ম্যাগাজিন বা রিসার্চ পত্রিকাগুলির সহিত তিনি ওয়াকিবহাল থাকিবেন। তিনি বৎসরে একটি বা দুইটি শিক্ষামূলক সভায় অংশ গ্রহণ করিবেন এবং বিভিন্ন স্থানের শিক্ষকের সহিত নিজের মতের আদান প্রদান করিবেন।

সুপরিচালনা ও বিজ্ঞান শিক্ষক ঃ—বিজ্ঞান শিক্ষক নিজের নিয়ন্ত্রনাধীনে শিক্ষা এবং বৃত্তিতে কার্যকরীভাবে শিক্ষার্থীকে পরিচালিত করিতে পারেন। শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহিত মেলামেশার সর্বাপেক্ষা বেশী সুযোগ পান তাই পরিচালনার অনেকখানি দায়িত্ব শিক্ষককেই গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষার্থীর অক্ষমতার দিকে সংশোধনী দৃষ্টি থাকিলেও তিনি শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রবণতার দিকে সমান দৃষ্টি দিবেন। সেই গুলিকে আবিষ্কার করিবেন এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক হইবেন। মনে রাখিতে হইবে প্রতি শিক্ষার্থীর মধ্যেই একটি সুপ্ত সম্ভাবনা আছে। তাহাকে বিকশিত করিবার সকল দায়িত্ব শিক্ষকেরই।

বিজ্ঞান শ্রেণীতে পরিচালনা ঃ—শিক্ষার্থীর বুদ্ধিগত, সৌন্দর্যগত, কায়িক, যান্ত্রিক, সামাজিক এবং সৃষ্টিমূলক বিভিন্ন ক্ষমতার মূল্যায়ন করার সুযোগ বিজ্ঞান শিক্ষকের রহিয়াছে। কোন এককে যখন বিভিন্ন শিক্ষাগত কর্মের তালিকা প্রস্তুত হয় তখন শিক্ষার্থীর মৌলিক চিন্তা বা প্রবণতা শিক্ষকের কাছে ধরা পড়ে। তখন শিক্ষক তাহাকে উৎসাহ প্রদান এবং ঐ প্রবণতার অনুশীলন করিয়া তাহার ঐ ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন করিতে পারেন। বহু ব্যক্তির নিকট শোনা যায় যে বিশেষ

প্রবণতায় শিক্ষকের এই আন্তরিকতাপূর্ণ উৎসাহ প্রদানে ভবিষ্যৎ জীবনে সে সেই বৃত্তিই গ্রহণ করিয়াছে।

সুপরিকল্পিত কোন একক পাঠদানের Assimilation পর্যায়ে শিক্ষার্থীর পরীক্ষা করার দক্ষতা, অল্পবিস্তর আবিষ্কার, চিত্রাঙ্কন, রং ব্যবহারের দক্ষতা, নেতৃত্ব, বাচন ও লিখন ক্ষমতা, যান্ত্রিক ক্ষমতা, হাত ও আঙ্গুলের যথাযথ ব্যবহার, সামাজিক খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যাইতে পারে। এ ছাড়া স্বাভাবিক পঠন, সমস্যা সমাধানে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টা, ঐ সংক্রান্ত বিষয়ে মৌখিক ও লিখিত বিবরণ প্রদান প্রভৃতি বিষয়েও বিশেষভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব শিক্ষকের। প্রখ্যাত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের জীবনী শিক্ষার্থীর মনে স্থায়ী রেখাপাত করে। তাহাদের মেজাজ ও চরিত্রকে সুনিয়ন্ত্রিত করে। বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণের জন্য তাঁহাদের ধৈর্য, অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা—জীবনব্যাপী সাধনা শিক্ষার্থীর কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এ ছাড়া শিক্ষক নিজ গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত বিষয়, উদাহরণ বা পরীক্ষার মধ্যে শিক্ষার্থীকে আবদ্ধ না করিয়া অন্যান্য বৃত্তি যেমন, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, ধাত্রী-শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান দিতে কার্পণ্য করিবেন না।

বিজ্ঞান সমিতি ও পরিচালনা: শিক্ষার্থী বিজ্ঞান সমিতির মাধ্যমে প্রচুর কাজ করিবার সুযোগ পায়। প্রতি কাজই সুপরিচালিত হওয়া উচিত। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সমিতির কাজ সাধারণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। সেখানে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই যথেষ্ট হইবে। উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবণতা বিশেষে বিভিন্ন সমিতি গঠন করা উচিত। রেডিও বিষয়ে যাহার বিশেষ ঝোঁক আছে সাধারণ বিজ্ঞান সমিতি অপেক্ষা রেডিও সমিতিভুক্ত হইলে সে অনেক বেশী উপকৃত হইবে।

দ্বিবিধ উপায়ে বিজ্ঞান সমিতি শিক্ষার্থীকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারে। প্রথমটি বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের কার্যাবলী এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে বহির্ভ্রমণ। প্রথমটিতে বিজ্ঞান সমিতির নিয়মিত সভায় শিক্ষার্থী যোগদান

করিবে। নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করিবে এবং বিভিন্ন বৃত্তিগত কার্যাবলীর আলোচনায় যোগ দিয়া নিজের দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করিবে। দ্বিতীয়টিতে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে লইয়া গিয়া তাহাদের কার্যাবলী প্রদর্শনে এবং প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের সহিত কথোপকথনের সুযোগ দিতে হইবে। একদিন বাহিরে লইয়া গিয়া যে লাভ হয় তাহা দশদিনের বিদ্যালয় অভ্যন্তরের কাজের সমান। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আরোগ্য নিকেতন, হাসপাতাল, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র, ব্যবসাকেন্দ্র, বাণিজ্যকেন্দ্র প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে যাওয়ার ব্যবস্থা করিলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গী বিস্তৃত হইবে এবং নিজের প্রবণতা ও ক্ষমতানুযায়ী কোন বৃত্তির জন্য নিজেকে তৈরী করিবে। সেইজন্য পূর্বেই বলা হইয়াছেযে অন্য শিক্ষক অপেক্ষা বিজ্ঞান শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সুপথে পরিচালিত করার অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ পান।

পূর্বে শিক্ষকের কাজ ছিল বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর নিকট কেবলমাত্র উপস্থাপিত করা। বর্তমানে প্রতি শিক্ষককে অধিকতর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, গতিশীল, কর্মঠ, প্রাণচঞ্চল, সচেতন এবং আন্তরিকতাপূর্ণ হইতে হইবে। বর্তমানে শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনও ধীরে ধীরে জটিল হইতেছে। এই সামাজিক পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য—সুস্থ নাগরিক হিসাবে জীবনধারণের জন্য অধিকতর দক্ষতা, উচ্চাঙ্গ অভ্যাস, সুসংহত ক্ষমতা একান্তই প্রয়োজনীয়। আমাদের ক্রমবর্ধমান সামাজিক জীবনের পরিবর্তন, আধুনিক যুগে অসংখ্য যন্ত্রদানবের আবির্ভাব, সমাজ উন্নয়নের নূতন পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক লেন-দেন ও মতবিরোধ নূতন ধরণের শিক্ষক সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছে। এই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যখন শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ভার নিজ হস্তে তুলিয়া লইতেছেন তখন তাঁহার দায়িত্ব কতখানি তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। একদিকে তাঁহাকে বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে—অপরদিকে শিক্ষার্থীর মনে বিশেষ প্রবণতা জাগাইয়া তুলিয়া তাহাকে সুপরিকল্পিত পথে পরিচালিত করিতে হইবে। শিক্ষার্থী সম্পর্কে জ্ঞান ও আগ্রহ আমাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সুদক্ষ শিক্ষকের সম্মুখে জটিল মানবজীবনের কার্যকরী জ্ঞানের

সামগ্রিক রূপ আজ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহাকে আজ একাধারে বিষয় ও শিক্ষার্থীকে অধ্যয়ন করিতে হইবে। সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ হইতেছে বিশেষ দক্ষতা ও রুচিসম্পন্ন এবং জটিল আচরণের অধিকারী শিক্ষার্থীকে জটিল সামাজিক কাঠামোর ভিতরে অহরহঃ সার্থক খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টা।

সেইজন্য বর্তমানের শিক্ষককে শিক্ষা-বিজ্ঞানী হইতে হইবে। তিনি আগ্রহের সঙ্গে নিত্য নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিবেন—তাহাকে বিশ্লেষণ করিবেন এবং তাহার মূল্যায়ন করিবেন ; শ্রেণীতে পরীক্ষা করিবেন—শিক্ষাগত নূতন উপকরণ তৈরী বা সংগ্রহ করিবেন। তাহার জন্য বিভিন্ন গবেষণা পদ্ধতি, শিক্ষায় পরিসংখ্যান এবং বৈজ্ঞানিক ভাষা সম্বন্ধে তাঁহাকে অবহিত হইতে হইবে। শিক্ষার্থীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের জ্ঞানের বিস্তৃতি একান্ত অপরিহার্য। শিক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের সংগে সংগে পরিচালনা ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব বহুগুণ বর্ধিত হইয়াছে। তাহার জন্য বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষকের চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। কারণ শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ সাধনে উন্নত ধরণের অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকিলে শিক্ষার আবহাওয়া সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাহার জন্য শিক্ষার্থী-পরিচিতি শিক্ষাদানের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ। ইহাতে তাঁহাকে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। শিক্ষার্থীর ফলের খবর, ব্যক্তিগত বিবরণ, পর্যবেক্ষণ, অভীক্ষা, প্রশ্নাবলী, ব্যক্তিগত আলাপ, যৌথকার্যাবলী, আত্মজীবনী, শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া, অভিভাবকের সহিত যোগাযোগ স্থাপন প্রভৃতি উপায়ে তাহার সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ খবর আহরণ করা যাইতে পারে। শিক্ষার্থীর পূর্ব ইতিহাস, আগ্রহ, চাহিদা এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া শিক্ষক কার্যকরীভাবে শিক্ষাদান করিতে পারেন।

সামগ্রিক শিশুর দায়িত্ব যখন শিক্ষককে লইতে হইতেছে তখন তাহাদের বৃত্তিগত, সামাজিক, শিক্ষাগত, নৈতিক, শারীরিক, প্রক্ষোভগত এবং অবসর-যাপনের চাহিদার দিকে তিনি লক্ষ্য রাখিবেন। সেইজন্য শিক্ষাতত্ত্ব, পদ্ধতি

প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষকের নূতন অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। সেইজন্য সুষ্ঠু পরিচালনা শিক্ষাজগতে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে। তবে ইহা আন্দোলনমূলক না হইয়া বিবর্তনমূলক হইবে।

'হোম্ রুম' (Home Room) পরিচালনা :—শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন দেশে 'হোম্ রুমের' ব্যবস্থা চালু আছে। ইহার সাহায্যে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ফাঁকগুলির পূর্তি সাধিত হয়। দুইটি বিশেষ কারণে 'হোম রুমের' উপযোগিতা অনুভূত হইয়াছে—(১) ফ্যাকাল্‌টি মনস্তত্ত্বের উচ্ছেদ এবং (২) বিশেষ শিক্ষার জন্য বিশেষ বিভাগের সৃষ্টি। এক বিষয়ের জ্ঞান অন্য বিষয়ে সম্পূর্ণ সঞ্চারিত হইবে এই ধারণা বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন না। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে তাঁহারা ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা বিশেষ শিক্ষার স্বপক্ষে মত পোষণ করেন। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কোন কোন ক্ষমতা ভিন্ন বিষয়ে সঞ্চারিত হয়। যেমন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য যথা—একাগ্রতা, অধ্যবসায়, সততা প্রভৃতি। বিশেষ শিক্ষার সুপারিশে বিষয় বিভাজন আরম্ভ হইয়াছে। তাই বিদ্যালয়েও বিভিন্ন বিষয়ে ভীড় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বিদ্যার্থী যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসিতেছে তখন বিদ্যালয় কক্ষ, তাহার সজ্জা, বিভিন্ন বিষয়-শিক্ষক এবং নানা বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীবন্ধুদের মধ্যে আসিয়া সে দিশাহারা হইয়া পড়ে। সমগ্র আবহাওয়াই তাহার কাছে বিসদৃশ বলিয়া অনুভূত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বল্প শিক্ষকের কাছে তাহার নিজস্ব একটি সত্বা ছিল। এই অকূল সমুদ্রে নিজেকে সে বড় একাকী—বড় অসহায় বোধ করে। এই অস্বস্তির মধ্যে খাপ খাওয়াইতে তাহার বেশ কিছুদিন কাটিয়া যায়। এই বয়স্ক শিক্ষার্থীর মানসিক ও প্রক্ষোভগত কাঠামোর দিকে দৃষ্টি দিতে 'হোম রুমের' সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

'হোমরুমে' শিক্ষার্থী নিজের চাহিদা অনুসারে প্রত্যহ যাইবে সেখানে নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষক উপস্থিত থাকিবেন। শিক্ষার্থীর সহিত অন্যান্য বন্ধু শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ট

যোগাযোগ স্থাপিত হইবে। শিক্ষার্থীর মানসিক স্থৈর্য এবং সন্তোষের জন্য এই মিলন বিশেষ কার্যকরী।

হোমরুমের কাজ ঃ 'হোম রুমের' কাজকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) শিক্ষার্থীর orientation এবং (২) শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত পরিচালনা।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসার পর শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা এক অপরিহার্য কাজ। সেখানে নূতন শিক্ষক, নূতন বিষয় এবং নূতন পরিবেশ ও আইন কানুন বিদ্যমান। এই নূতন পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়ানোর দায়িত্ব 'হোমরুমের' শিক্ষকের উপর আসিয়া পড়ে। শ্রেণীতে পাঠদানকালে এই খাপ খাওয়ানোর কাজে অনেকটা ফাঁক থাকিয়া যায়। এখানে তাহার পূর্তি ঘটে। পরিবারকক্ষের শিক্ষক নূতন বন্ধুত্ব স্থাপন, সহযোগিতা সৃষ্টি প্রভৃতি সামাজিক গুণ এবং পোশাক পরিচ্ছদ, পরিচ্ছন্নতা, ব্যবহার প্রভৃতি ব্যক্তিগত গুণের অধিকারী করিতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করিবেন।

শিক্ষা এবং বৃত্তিগত পরিচালনায় 'হোমরুমের' দান অসীম। বিদ্যালয়ের সকলের চেয়ে বেশী মেশার সুযোগ কক্ষের শিক্ষকই পাইয়া থাকেন।

বিষয় নির্বাচন, বিভিন্ন কার্ড ভর্তি করা, সমিতি নির্বাচন, পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যাবলী নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি উপযুক্ত সাহায্য করিতে পারেন। শিক্ষাগত বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন বৃত্তির খবর শিক্ষার্থী এখানে পাইবে। ইহার অর্থ এই নয় যে এখানেই শিক্ষার্থী বৃত্তিশিক্ষা লাভ করিবে। তবে শিক্ষক পর্যাপ্ত খবর পবিবেশন করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে প্রবণতা সৃষ্টিতে সাহায্য করিবেন।

'হোমরুমের' শিক্ষকের কর্ত্তব্য ঃ এখানে শিক্ষকের কাজ পর্যাপ্ত। প্রথমতঃ তিনি এই কক্ষের প্রতি শিক্ষার্থীর সহিত আত্মীয়তা সৃষ্টি করিবেন। তাহার জন্য তিনি প্রত্যেকের "কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড" পাঠ করিবেন, অভিভাবকদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিবেন এবং শ্রেণীতে শিক্ষার্থীকে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। তিনি শিক্ষার্থীর ক্ষমতা, দক্ষতা, প্রবণতা, বাড়ীর আবহাওয়া, স্বাস্থ্যের অবস্থা, আর্থিক অবস্থা, প্রক্ষোভজনিত অশান্তি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা

সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত থাকিবেন। শ্রেণীতে তিনি উক্ত বিষয়গুলিকে অনুশীলন করিবেন।

'হোম রুমের' শিক্ষকের দ্বিতীয় কাজ উক্ত কক্ষের কার্যাবলীকে নির্দিষ্ট ভাবে পরিচালিত করা। প্রথমে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব করিলেও পরে এই কক্ষের সব কাজে তাঁহার প্রভাব পরোক্ষভাবে আসিবে। শিক্ষার্থী অক্ষম হইলে এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে শিক্ষক সানন্দে সমস্যার সমাধান করিয়া দিবেন। বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক, পত্রিকা, ম্যাগাজিন পাঠের সুযোগ দিয়া কক্ষটিকে সজীব ও কর্মবহুল করিয়া রাখা শিক্ষকের কাজ। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন স্মরণীয় লোকের জন্মতিথি পালন, স্বাস্থ্য দিবস প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন।

পরিশিষ্ট

পাঠটীকা

(ক) পাতার কাজ
(খ) দহন ক্রিয়া

পাঠটীকা নং ১

তারিখ—
বিদ্যালয়—রাজগ্রাম শশিভূষণ রাহা সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়
শ্রেণী—অষ্টম
ছাত্রসংখ্যা—৪০
গড় বয়স—১৩+
সময়—৪৫ মিঃ
শিক্ষক—

বিষয় — সাধারণ বিজ্ঞান
পাঠক্রম ঃ
(ক) মূলের কাজ
(খ) কাণ্ডের কাজ
* (গ) **পাতার কাজ**
* অদ্যকার পাঠ

উদ্দেশ্য ঃ—চিন্তা, যুক্তি, বিচার এবং পর্যবেক্ষণ সহকারে পাতার কাজ সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞানের বিস্তার লাভে সহায়তা করা।

উপকরণ ঃ—বিকার, কাঁচের ফানেল, পরখনল, একখণ্ড কাল কাপড়, একটি বড় বেলজার, কয়েকটি নীলভ কোবাল্ট নাইট্রেট কাগজ, একটি এস্‌পিরেটার, একটি ছোট টবের গাছ এবং ঝাঁঝিদাম।

আয়োজন ঃ—পূর্বজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া অদ্যকার পাঠে মনোযোগী করিবার নিমিত্ত ছাত্রদিগকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হইবে।

(১) প্রাণীর ন্যায় আর কি সজীব পদার্থ আছে?
(২) সজীব পদার্থের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অপরিহার্য বিষয় কি কি?
(৩) উদ্ভিদেরও কি এইসব ক্রিয়া হইয়া থাকে?
(৪) কাণ্ড ও মূলের কাজ কি কি?
(৫) মূল হইতে কাণ্ডের পর এই খাদ্য কোথায় যায়?

পাঠঘোষণা ঃ—"আজ আমরা '**উদ্ভিদের পাতার কাজ**' সম্বন্ধে আলোচনা করিব"—এই বলিয়া শিক্ষক অদ্যকার পাঠ ঘোষণা করিবেন।

উপস্থাপন :—শিক্ষকের কর্তব্য—পরীক্ষার সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ পূর্ব হইতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এবং ছাত্রদের সহযোগিতায় সংগ্রহ করা দরকার। পরীক্ষা প্রণালী শ্রেণীতে দেখাইবার পূর্বে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। শ্রেণীতে পরীক্ষা প্রণালী সহজ ও সরল হইবে। পরীক্ষার পরিবেশ তৈরী করা শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য।

ছাত্রদের কর্তব্য :—পরীক্ষা দেখিবার জন্য আগ্রহশীল হওয়া এবং শিক্ষকের কাজে সহযোগিতা করা ছাত্রদের কর্তব্য।

১ম শীর্ষ :

বিষয়	পদ্ধতি
পাতার গঠন—পাতার বাহ্যিক গঠনে তিনটি অংশ দেখা যায়, যথা—(ক) পত্রমূল, (খ) বৃন্ত, এবং (গ) ফলক। ফলকের দুইটি স্তর এবং ইহার মাঝে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষ আছে। ইহাতে পাতার গঠন মোটা হয়। ঐ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষের দুই বা এক স্তরের মাঝে মাঝে অসংখ্য ছিদ্র—স্টোমা থাকে। এই স্টোমার দ্বারা পাতার অভ্যন্তর এবং বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। দুই স্তরের কোষ ভিন্ন; অন্য সব কোষগুলিতে সবুজ কণা (ক্লোরোফিল) বর্তমান। সম্পূর্ণ ফলকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা উপশিরার জাল বিস্তৃত। এই শিরা উপশিরার দ্বারা খাদ্যের উপাদান (মূল দ্বারা শোষিত) পাতার প্রতিটি কোষে পৌছায় এবং খাদ্য শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হয়।	[একটি গাছের পাতা এবং পাতার চার্ট দেখান হইবে।] প্রশ্ন :—আমাদের শরীরের ঘাম কোন্ স্থান হইতে নির্গত হয়? প্রশ্ন :— ঘাম শরীরের পক্ষে উপকারী না অপকারী? কারণ কি?

বোর্ডের কাজ :—পাতার বাহ্যিক তিনটি অংশ, যথা—(ক) পত্রমূল, (খ) বৃন্ত, এবং (গ) ফলক। ইহা ছাড়া পাতায় অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্টোমা এবং শিরা ও উপশিরা থাকে।

২য় শীর্ষ ঃ

পাতার কাজ বিষয়ে যে তিনটি পরীক্ষা করা হইবে সেই বিষয়ে—

শিক্ষকের কর্তব্য ঃ যে সমস্ত পরীক্ষা সময়সাপেক্ষ, তাহা পূর্ব হইতে ছাত্রদের সহযোগিতায় ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। পরে পরীক্ষার শেষাংশ দেখাইতে ও তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ছাত্রদের কাছ হইতে পরীক্ষার সিদ্ধান্ত আদায় করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে ছাত্রগণ পরীক্ষা প্রণালীর বর্ণনাও দিবে। সহজ ও সরল প্রক্রিয়ায় পরীক্ষার পূর্ণ চিত্রটি বোর্ডে আঁকিয়া দেওয়া দরকার।

ছাত্রদের কর্তব্য ঃ পরীক্ষার বর্ণনা চিত্রসহ খাতায় লিখিয়া লইবে।

পরীক্ষা	নিরীক্ষা	সিদ্ধান্ত
(১) **উদ্ভিদের প্রস্বেদন ঃ** (ক) একটি ছোট টবের গাছ একটি আলোকপূর্ণ টেবিলের উপর বসান হইল। পরে টবের মাটি সম্পূর্ণভাবে রবার ক্লথ দিয়া এবং গাছের কাণ্ডের গোড়ায় মোম দিয়া ঢাকা হইল। পরে টব সমেত গাছটিকে একটি বড় শুষ্ক বেলজার দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল।	কিছু সময় পর দেখা যাইবে যে বেলজারের ভিতর-কার গায়ে বিন্দু বিন্দু জলকণা জমিয়াছে।	জল বিন্দুগুলি গাছের পাতায় স্টোমা হইতে বাষ্পাকারে বাহির হইয়া বেলজারের গায়ে জমিয়া জলে পরিণত হয়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে গাছ বাষ্প মোচন করে। ইহাই উদ্ভিদের প্রস্বেদন।
(১) (খ) একটি **নীলাভ কোবাল্ট নাইট্রেট কাগজের** এক অংশে একটি সূক্ষ্ম জলবিন্দু দেওয়া হইল।	(খ) জল বিন্দু অংশ-টুকু গোলাপী হইয়া গিয়াছে।	(খ) নীলাভ কোবাল্ট নাইট্রেট কাগজে জল লাগিলে গোলাপী হয়।

পরীক্ষা	নিরীক্ষা	সিদ্ধান্ত
এইরূপ কয়েকটি কাগজ গাছের পাতায় আটকাইয়া দেওয়া হইল।	কাগজগুলির রং গোলাপী হইল।	গাছ পাতার সাহায্যে বাষ্প-মোচন করে। ইহাকে **প্রস্বেদন** বলে।
(২) **পাতার শ্বাসকার্যঃ** একটি টবের গাছকে শুষ্ক বেলজার দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল ঐ বেলজারের মুখ হইতে কর্কের মধ্য দিয়া দুইটি কাঁচ নল এইরূপ ভাবে পরান হইল যাহাতে একটির মুখ বাতাসে খোলা থাকে এবং অপরটির মুখ চূণের জলে ডুবান থাকে। ঐ বোতল হইতে অপর একটি নল এসপি-রেটারে ঢুকানো হয়। পরে বেলজারটি একটি কাল কাপড়ে সম্পূর্ণভাবে ঢাকিয়া দেওয়া হইল এবং এসপিরেটার হইতে ধীরে ধীরে জল পড়িতে লাগিল	কিছু সময় পরে দেখা যাইবে যে চূণের জল ধীরে ধীরে ঘোলা হইয়া যাইতেছে।	পাতা হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হইয়াছে, ইহাই পাতার **শ্বাসকার্য**। [শিক্ষক প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্বাস-ক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ এবং অক্সি-জেন গ্রহণ প্রসঙ্গ-টির উল্লেখ করিবেন।

এইরূপ ভাবে সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ যদি দিনের পর দিন ক্রমাগত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ে তাহা হইলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইত। বস্তুত তাহা হয় না। নীচে দেখা যাইবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিণতি কি—

পরীক্ষা	নিরীক্ষা	সিদ্ধান্ত
আলোকপূর্ণস্থানে একটি টেবিলের উপর কাঁচের বিকারের মধ্যে ৩/৪ অংশ জলে পূর্ণ করা হইল। কিছু ঝাঁঝিদাম (পাতা সমেত ডাল) বিকারের ভিতর রাখিয়া উহার উপর একটি কাঁচের ফানেল উল্টাইয়া ফানেলের দণ্ডটি সম্পূর্ণরূপে জলের নীচে রাখা হইল। পরে পরখ নলটি জল দিয়া পূর্ণ করিয়া সাবধানে ফানেল দণ্ডের উপর এরূপভাবে উপুর করিয়া দেওয়া হইল যাহাতে পরখ নলের জল এক বিন্দুও বাহিরে না পড়ে।	দেখা যাইবে যে বাতাস বুদ্ বুদ্ করিয়া জলজ উদ্ভিদের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে এবং নলের জল ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে।	আলোকের উপস্থিতিতে গাছের সবুজ পাতার ক্লোরোফিল (কার্বন-ডাই-অক্সাইড আত্মসাৎ করিয়া) অক্সিজেন ত্যাগ করে। আত্মসাতের পর কার্বন খাদ্য প্রস্তুত করে। ইহাকে **সালোকসংশ্লেষ বলে।**
এইরূপে পরখ-নলটিতে কিছু গ্যাস জমা হইলে খোলা মুখটি বন্ধ করিয়া একটি শিখাহীন জলন্ত কাঠি লইয়া পরখনলের উপর হইতে আঙ্গুল সরাইয়া ইহার মধ্যে ঢুকান হইল।	দেখা গেল যে কাঠিটি আবার উজ্জল শিখাযুক্ত হইয়া জলিয়া উঠিল।	সালোক - সংশ্লেষে আলোকের উপস্থিতি অপরিহার্য।

অভিযোজনঃ—অদ্যকার পাঠ শিক্ষার্থী কতটা অনুধাবন করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

(১) উপযুক্ত শব্দ বসাইয়া **শূন্যস্থান পূরণ কর**ঃ—

(ক) সূর্যকিরণের উপস্থিতিতে গাছের সবুজ পাতা — ত্যাগ করে এবং — গ্রহণ করে।

(খ) মূলের দ্বারা শোষিত যৌগিক পদার্থগুলির সহিত — রাসায়নিক মিলন না ঘটাইলে উদ্ভিদের — প্রস্তুত হয় না।

(২) (ক) অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড — এইগুলির মধ্যে কোন্ বস্তুটি সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় আলোকের সাহায্যে ক্লোরোফিলের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়।

(খ) দলমণ্ডল, গর্ভকেশরচক্র, ক্লোরোফিল, বৃতি—এইগুলির মধ্যে কোন্ বস্তুটি গাছের পাতায় থাকে ?

(৩) সম্পর্ক ঠিক রাখিয়া **শূন্যস্থান পূরণ** কর :—

(ক) প্রাণীরা নাকের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়, উদ্ভিদ······।

(খ) প্রাণীরা খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, উদ্ভিদ······।

(৪) কোন্‌টি গাছের খাদ্যের উপাদান নহে সেই শব্দটিতে **টিক্ দাগ দাও** :—

হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, পারদ, ক্যালসিয়াম।

(৫) (ক) জল না হইলে উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না, তাই বলিয়া অগাধ জলের মধ্যে রাখিয়া দিলে ক্ষতি কি ?—এই উক্তির মধ্যে এমন কি আছে যাহা **সত্যসত্যই সম্ভব নহে ?**

(খ) ছত্রাগ গাছকে যদি সর্বদা আলোকপূর্ণ স্থানে রাখা হয়, তাহা হইলে তাহার খাদ্য প্রস্তুতিতে যথেষ্ট সুবিধা হয়—এই উক্তির মধ্যে এমন কি আছে যাহা **সত্যসত্যই সম্ভব নহে ?**

(৬) (ক) প্রস্বেদন, শ্বাসগ্রহণ এবং সালোক-সংশ্লেষ বলিলে কি বোঝায় ?

(খ) গাছের নীচে মানুষের বাস কোন্ সময় ক্ষতিকারক ? এবং কেন ?

(গ) উদ্ভিদের পাতার কাজ কি কি ?

(ঘ) দুপুরবেলা গাছের নীচে যাইলে আরাম লাগে কেন ?

বাড়ীর কাজ :—চিত্রসহ প্রস্বেদন, শ্বাসকার্য এবং সালোক-সংশ্লেষ পরীক্ষা প্রণালী ছাত্রগণ সহজ কথায় লিখিয়া আনিবে।

পাঠটীকা—নং ২

তারিখ— বিদ্যালয়—নর্থ্যাণ্ড বহুমুখী উচ্চতর বিদ্যালয় শ্রেণী—৭ম (ক) ছাত্রসংখ্যা—৪০ গড় বয়স—১২+ সময়—৪৫ মি: শিক্ষক—	বিষয়—সাধারণ বিজ্ঞান অদ্যকার পাঠ— **দহন ক্রিয়া**

উদ্দেশ্য :—ছাত্রদিগকে দহন ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে সাহায্য করা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দহন ক্রিয়ার প্রয়োগ প্রদর্শন করা এবং পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা শক্তির উন্মেষ সাধন।

উপকরণ :—মোমবাতি, বড় কাঁচের পাত্র, কাঁচের চিম্নী, বেলজার, ফস্ফরাস্, লোহার দণ্ড।

প্রস্তুতি :—ছাত্রদিগের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে পাঠাভিমুখী করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হইল :

(১) বায়ুর উপাদানগুলির নাম বল।
(২) আমরা শ্বাসকার্যের সময় বায়ুর কোন্ উপাদানটি গ্রহণ করি?
(৩) বায়ুতে অক্সিজেনের আয়তন কত?
(৪) এক টুকরা কাগজ জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠির উপর ধরিলে কি হয়?

পাঠঘোষণা :—"অদ্য আমরা দহন ক্রিয়া এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দহন ক্রিয়ার প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব"—এই বলিয়া শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করিবেন।

উপস্থাপন :—**শিক্ষকের কাজ**—শিক্ষক উপকরণগুলি টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিবেন। অতঃপর নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি শ্রেণীকক্ষে করিবেন এবং ছাত্রদের সাহায্য লইয়া পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত বোর্ডে লিখিবেন।

ছাত্রদেরকাজ—ছাত্রগণ মনোযোগের সহিত পরীক্ষাগুলি দেখিবে এবং নিজেদের ভাষায় প্রকাশ করিবে। সিদ্ধান্তটিও তাহারাই করিবার চেষ্টা করিবে।

১নং পরীক্ষা ঃ

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
(ক) একটি জ্বলন্ত মোমবাতি কাঁচের পাত্রের মধ্যে বসাইয়া জল ঢালা হইল। দুই মুখ খোলা কাঁচের চিমনী দিয়া বাতিটি ঢাকা হইল।	(ক) তখনও বাতিটি জ্বালিতেছিল।	কোন বস্তু জলিবার জন্য বায়ুর প্রয়োজন আছে।
(খ) অতঃপর চিমনীর উপরিভাগে একটি পিচবোর্ড দিয়া অল্প সময়ের জন্য ঢাকিয়া রাখা হইল।	(খ) বাতিটি ক্ষীণ হইয়া গেল ঢাকনীটি সরাইবার সংগে সংগে বাতিটি উজ্জল হইবে।	
(গ) পরে চিমনীর মুখটি পিচবোর্ড দিয়া কিছুক্ষণ ঢাকিয়া রাখা হইল।	(গ) বাতিটি নিভিয়া গেল।	

২নং পরীক্ষা ঃ

একটু ফস্‌ফরাসের টুক্‌রাতে আগুন ধরাইয়া বড় পাত্রের জলে ভাসমান একটি বেসিনে রাখিয়া বেলজার দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল।	ফস্‌ফরাসের টুক্‌রাটি উজ্জল আলো বিকিরণ করার পরেই নিভিয়া যাইবে এবং বেলজারের ভিতর জল উঠিয়া যাইবে।	অক্সিজেন ব্যতিত দহন অসম্ভব এবং দহনের সময় আলো ও তাপের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় শীর্ষ ঃ—[এই সময় শিক্ষক পরীক্ষা করিবেন। ছাত্রগণ পর্যবেক্ষণ করিবে এবং একে একে পরীক্ষা-টেবিলের সম্মুখে আসিয়া শিক্ষককে কাজে সাহায্য করিবে।]

বিষয়	পদ্ধতি
দহনের সময় তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়। মোমবাতি জ্বলিবার সময়ে তাপের সহিত আলো উৎপন্ন হয়। এই তাপ পরিবহন, পরিচলন এবং বিকিরণ দ্বারা সঞ্চালিত হয়।	(১) মোম বাতি জ্বলিবার সময় কি কি উৎপন্ন হয় ?
(১) একটি লোহার দণ্ডের এক দিক হাতে ধরিয়া অন্য প্রান্ত আগুনে গরম করিলে হাতে গরম অনুভূত হইবে। লোহার গরম দিকে উষ্ণতা বেশী ও ঠাণ্ডা দিকে গরম কম। এইরূপে তাপের পরিবহন হইয়া থাকে।	
(২) ঐ লোহার দণ্ডটি মোমবাতি হইতে সরাইয়া লইয়া উহার গরম প্রান্তের কয়েক ইঞ্চি উপরে হাত রাখিলে গরম অনুভূত হয়। গরম লোহার সংস্পর্শে বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উপরের দিকে উঠিয়াছে এবং হাতে আসিয়া লাগিতেছে। এখানে উষ্ণ বায়ু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালিত হইল। এই প্রকার তাপ সঞ্চালনকে **পরিচলন** বলে।	(২) পরিবহন কাহাকে বলে ? (টেবিলের উপর একটি মোমবাতি জ্বালান থাকিবে। ছেলেরা আগুনে লোহার দণ্ড ধরিবে।) (২) পরিচলন কাহাকে বলে ? [ছাত্ররাই পরীক্ষা করিবে, শিক্ষক 'পরিচলন' শব্দটি উপস্থাপিত করিবেন]।

বিষয়	পদ্ধতি
(৩) উষ্ণদণ্ডের উপরিভাগে হাত না রাখিয়া কয়েক ইঞ্চি নীচে রাখিলেও হাত গরম হইবে। তবে উপরে যতটা নীচে ততটা গরম নয়। এই অবস্থায় তাপ পরিবাহিত বা পরিচালিত হইয়া আসে না। এবারে যে উপায়ে তাপ আসিয়াছে তাহাকে **বিকিরণ** বলে।	(৩) তরল পদার্থে তাপের পরিচলনের উদাহরণ দাও। (৪) সূর্য হইতে পৃথিবীতে কোন্ প্রক্রিয়ায় তাপ আসে ?

তৃতীয় শীর্ষ ঃ—[শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠদানে অগ্রসর হইবেন। শিক্ষার্থী আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে।]

বিষয়	পদ্ধতি
মোমবাতি যখন বাতাসে জলে তখন মোমবাতির মোমকে বলে দাহ্য ও বাতাসকে বলে দহনের সহায়ক। কোন কোন অবস্থায় দহনের সময় তাপ, আলো ও শব্দের স্থষ্টি হয়। তাই বিস্ফোরণকে দ্রুত দহন বলে। **প্রাণীর শ্বাস** ঃ প্রাণী মাত্রই শ্বাসকার্যের সময় বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। শ্বাসকার্য এক প্রকার **মৃত্যু দহন**। মোমবাতি পুড়িবার সময় তাপ উৎপন্ন হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের সময় আমাদের শরীরেও তাপ উৎপন্ন হয়। ইহারই ফলে আমাদের শরীর গরম থাকে। কিন্তু প্রাণীর শ্বাসকার্যের সময় আলো উৎপন্ন হয় না।	(১) দাহ্যবস্তু ও দহনের সহায়ক কাহাকে বলে ? উদাহরণ দাও। (২) বোমা ফাটিলে কি কি উৎপন্ন হয় ? (৩) প্রাণী শ্বাস-কার্যের সময় কি গ্যাস গ্রহণ করে এবং কি ত্যাগ করে ?

বিষয়	পদ্ধতি
উদ্ভিদের শ্বাসকার্য ঃ গাছের পাতায় অবস্থিত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে বায়ু পাতার ভিতরে প্রবিষ্ট হয় এবং অক্সিজেন পৃথক হইয়া পাতার কোষগুলির পদার্থের সহিত মিলিত হয়। ইহার ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও তাপের সৃষ্টি হয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বায়ুর সহিত বাহির হইয়া আসে এবং তাপ উদ্ভিদের নানা কাজে সাহায্য করে। এইরূপ **মৃদুদহনে** উদ্ভিদের শ্বাসকার্য হইয়া থাকে। **লোহায় মরিচা পড়া ঃ** সাধারণ লোহাকে ভিজা বাতাসের সংস্পর্শে রাখিলে তাহার উপরিভাগে বাদামী রঙের আবরণ পড়ে। এরই নাম লোহার মরিচা। লোহা, অক্সিজেন ও জলের রাসায়নিক সংযোগে এই বাদামী রঙের মরিচার সৃষ্টি। ইহা একটি **মৃদু দহন**। লোহায় মরিচা পড়ার সময় তাপ বা আলো কিছুই উৎপন্ন হয় না।	(৪) উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বাসকার্যের সহিত মোমবাতির জলনের মিল ও পার্থক্য কোথায় ? (৫) মরিচা পড়া লোহাকে কি চুম্বক আকর্ষণ করিবে ? উত্তরের কারণ দেখাও। (৬) লোহার মরিচা ধরার জন্য কি কি দরকার ? (৭) মোমবাতি জলা এবং লোহায় মরিচা পড়ার মধ্যে মিল বা পার্থক্য দেখাও।

অভিযোজন ঃ—অদ্যকার পাঠ শিক্ষার্থী কতটা অনুধাবন করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নের সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

(১) (ক) দহনের জন্য কি কি প্রয়োজন ?
(খ) দহনের সহিত শ্বাসকার্যের তুলনা কর।
(গ) শ্বাসকার্যের সহিত মরিচা ধরার তুলনা কর।

(ঘ) কামারেরা আগুনের মধ্যে ক্রমাগত হাপর চালাইতে থাকে কেন?

(ঙ) হারিকেন, টেবিলল্যাম্প বা কেরোসিন ষ্টোভের নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে কেন?

(২) (ক) নীচে যে প্রশ্নটির উত্তর 'হাঁ' হইবে তাহার পাশে Y এবং যাহার উত্তর 'না' হইবে তাহার পাশে N লিখ—

(১) লোহায় মরিচা পড়িতে বায়ুর নাইট্রোজেন সাহায্য করে।—

(২) বায়ুতে মোমবাতি দহনের ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।—

(৩) লোহায় মরিচা পড়িতে জলীয়বাষ্প সাহায্য করে।—

(খ) নিম্নে বামদিকের শব্দগুলির সহিত সম্বন্ধযুক্ত কতকগুলি শব্দ এলোমেলো-ভাবে ডানদিকে সাজান আছে। ডানদিকের শব্দগুলির পাশে বামদিকের সম্পর্ক-যুক্ত শব্দগুলির **নম্বর** বসাও :—

(১) শ্বাসকার্য	লৌহ—
(২) দহন	মাছ—
(৩) মরিচা	কাগজ—

(গ) নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শেষে বন্ধনীর মধ্যে কয়েকটি করিয়া বাক্যাংশ দেওয়া আছে; যেটি ঠিক তাহার নীচে **রেখা** টান :—

(১) কার্বন-ডাই-অক্সাইড শ্বাসকার্যের { সহায়ক / সহায়ক নয় / গৌণ সহায়ক }

(২) অক্সিজেন দাহ্য বস্তুর দহনে { সাহায্য করে / সাহায্য করে না / বাধা দেয় }

(৩) জলীয় বাষ্প মরিচা ধরায় { সাহায্য করে না / বাধা দেয় / সাহায্য করে }

(ঘ) ঠিক উত্তরটির নীচে রেখা টান :—

(১) শ্বাসকার্যের ফলে (নাইট্রোজেন/অক্সিজেন/কার্বন-ডাই-অক্সাইড) উৎপন্ন হয়।

(২) শ্বাসকার্যের সময় (তাপ/আলো/শব্দ) সৃষ্টি হয়।

(ঙ) যেটি খাটে না সেইটি কাটিয়া দাও :—

(১) তাপকে এক প্রকার (শক্তি/পদার্থ) বলা হয়।

(২) আলো-কে (পদার্থ/শক্তি) বলা হয়।

(চ) ডানদিকের শব্দগুলি হইতে উপযুক্ত শব্দটি বাছিয়া লইয়া **শূণ্যস্থান পূরণ** কর :—

(১) কঠিন পদার্থ —— প্রণালীতে উত্তপ্ত হয় { পরিবহন / পরিচলন / বিকিরণ }

(২) —— প্রণালীদ্বারা সূর্য হইতে তাপ আসে { পরিবহন / পরিচলন / বিকিরণ }

(ছ) **শূণ্যস্থান পূরণ** কর :—

(১) তাপ দিলে জল সাধারণতঃ —— প্রণালীতে উত্তপ্ত হয়।

(২) মোমবাতি দহনের ফলে —— এবং —— শক্তি উৎপন্ন হয়।

(জ) সত্য উত্তরের পাশে '√' এবং মিথ্যা উত্তরের পাশে '×' চিহ্ন দাও :—

(১) শ্বাসকার্য এক প্রকার দহন ক্রিয়া।

(২) মরিচা পড়া দহন ক্রিয়া নহে।

(৩) তাপ এক প্রকার সূক্ষ্ম বস্তু।

(৪) কার্বন-ডাই-অক্সাইড দহন কার্যে সাহায্য করে।

(৫) তাপ আমরা চোখে দেখিতে পাই না।

(ঝ) দাহ্যবস্তুর পাশে '+' এবং অদাহ্য বস্তুর পাশে '−' চিহ্ন দাও :—

কাঠ	মোম
লোহা	হাইড্রোজেন গ্যাস
লবণ	কাঁচ
বালি	অক্সিজেন গ্যাস
গন্ধক	নারিকেল তৈল

বাড়ির কাজ :—(১) ছাত্রগণকে নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলির চিত্র বাড়ি হইতে আঁকিয়া আনিতে বলা হইবে।

(ক) দহনের জন্য বায়ুর প্রয়োজনীয়তা।

(খ) দহনের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা।

(২) দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে দহন ক্রিয়ার প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ লিখিয়া আনিতে বলা হইবে।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিবর্তন

(ক) পৃথিবীর উৎস সন্ধানে
(খ) পদার্থ রহস্য

পৃথিবীর উৎস সন্ধানে

অন্তহীন ঐ নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে তার বিচিত্র ও মহান রূপের কথা বার বার মনে আসে। একদিকে কঠোর তপস্যারত ধ্যানমৌন শৈলরাজী—অপরদিকে দিগন্তবিস্তৃত ঊর্মীবিক্ষুব্ধ উত্তাল বারিধি—মাঝে সেতু রচয়িতা গহন বনানী—বিস্তীর্ণ তৃণপ্রান্তর—ঊষর মরু—সুজলাসুফলা শস্যশ্যামলা এই মাটি। বিচিত্র এর জীবজন্তু, উদ্ভিদ—এর প্রতিটি অংশ। দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র-অংশ-ভাগের মধ্যে নিপীড়িত মানবাত্মা পৃথিবীর পরে নক্ষত্র খচিত ঐ নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে স্তব্ধ হ'য়ে যায়। গতিশীল জীবনের মাঝে সতত সঞ্চরণশীল ঐ তারকারাজী তার কাছে অধিকতর সত্য ব'লে অনুভূত হয়। বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সংগে সে এই গতিশীলতার উৎস খুঁজতে চায়। কোথায় এর আরম্ভ—আর কোথায়ই বা এর শেষ? এই জিজ্ঞাসা কেবলমাত্র সভ্য মানুষেরই জিজ্ঞাসা নয়। আদিযুগ থেকে এই প্রশ্ন মানুষকে পীড়িত ক'রে এসেছে। তার জ্ঞান ও বুদ্ধির মাত্রা নির্ধারণ ক'রেছে এর সময়োপযোগী জবাব। পুরাতন ও নূতন তথ্যের সংঘাতে দিন দিন বেড়ে চ'লেছে সীমিত জ্ঞানের পরিধি, নিত্য নূতন তথ্য পুরাতন জ্ঞানের স্বল্পতা প্রমাণ ক'রতে গিয়ে বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েছে—জটিল সমস্যার আবর্তে নিমজ্জিত হ'য়েছে। কিন্তু তাই ব'লে কি সে হতাশ হ'য়েছে কোন দিন? সমস্যাসঙ্কুল তথ্যের মধ্যেই কি সে সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছে?

প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীর উৎপত্তির রহস্যোৎঘাটন করার চেষ্টা হ'য়েছে। অতি প্রাচীন কালে মানুষের ধারণা ছিল যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কৌটা থেকে তুলে নিলেন সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও তারকারাজীকে—আকাশের গায়ে তাদেরকে এঁটে দিলেন নিজের খেয়াল ও খুশীমত, আবার গ্রীকবিজ্ঞানী প্লেটোর মতে—সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি এসেছে 'দৈবক্রমে'। ভগবানের খেয়াল বা কোন অদৃশ্য মনের ক্রিয়া দ্বারা তারা সৃষ্ট হয়নি।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রথম এই প্রশ্নের জবাব মিল্‌লো ফরাসী গণিতজ্ঞ ল্যাপ্লাসের কাছ থেকে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাই বিখ্যাত নীহারিকা-বাদ। ক্যাণ্টের তথ্যের মধ্যে এর বীজ সুপ্ত থাকলেও অঙ্কশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় ক্যাণ্ট ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হ'লেন। ল্যাপ্লাস্ ধারণা ক'রলেন যে প্রথমে একটি জলন্ত গ্যাসপিণ্ড ঘুর্ণায়মান অবস্থায় ছিল। সেই অবস্থায় ঐ গ্যাসপিণ্ড ধীরে ধীরে শীতল হওয়ায় সঙ্কুচিত হ'ল এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুত ঘুর্‌তে লাগ্‌লো। সেইজন্য তার মধ্যদেশ অপেক্ষাকৃত স্ফীত হ'ল এবং ভারসাম্য রক্ষা করতে অক্ষম হ'য়ে ঐ স্ফীত অংশের কিছুটা বাইরে ঠিক্‌রে পড়্‌লো। কারণ ঘুর্ণায়মান অবস্থায় কেন্দ্র হ'তে বহির্মুখী শক্তি যদি কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির চেয়ে বেশী হয়, ভারসাম্য রক্ষার ব্যাঘাত ঘট্‌বে এবং সেইজন্য কিছু অংশকে বাইরে ছুঁড়ে দেবে। ল্যাপ্লাসের মতে ঐ পরিত্যক্ত দূরে নিক্ষিপ্ত অংশই একটি গ্রহ। জলন্ত গ্যাসপিণ্ড ঘুর্ণায়মান অবস্থায় একই প্রকারে পুনরায় কিছু অংশ দূরে নিক্ষেপ ক'রেছে—পরে একের পর একটি। উল্লিখিত দুই শক্তির সমতা যতক্ষণ পর্যন্ত না রক্ষিত হ'য়েছে ততক্ষণ এই অংশচ্যুতি ঘ'টেছে। এইরূপ অবস্থায় বাকী জলন্ত গ্যাসপিণ্ডটির নাম সূর্য এবং নিক্ষিপ্ত অংশগুলির নাম গ্রহ। গ্রহগুলিও নিজ নিজ অক্ষের উপর ঘুরবার ফলে একই প্রকারে সৃষ্টি ক'রেছে এক বা একাধিক উপগ্রহ।

বহুদিন ধ'রে ল্যাপ্লাসের তথ্য মানুষের মনে স্থান পেলেও তা স্থায়ী হ'ল না। প্রতিবাদ এলো যে গ্রহ-উপগ্রহসমন্বিত সৌর জগতের ভর এত বেশী ছিল না যে সেই শক্তির প্রভাবে সে গ্রহদের দূরে নিক্ষেপ ক'র্‌তে সক্ষম হবে। ল্যাপ্লাস যে স্ফীত অংশের কথা ব'লেছেন তা দূরে নিক্ষিপ্ত হ'লে, জলন্ত অবস্থায় থাকার দরুন বাতাসে ছড়িয়ে যাবে। ঐ নিক্ষিপ্ত গ্যাসপিণ্ডকে কঠিন হ'তে হ'লে ল্যাপ্লাস যে আয়তনের নীহারিকার কথা ব'লেছেন তার চেয়ে কোটী কোটী গুণ আয়তনের নীহারিকার কল্পনা ক'রতে হয়। আবার এ কল্পনাও ঠিক অলীক নয়। কারণ স্প্রীংএর আকারে নীহারিকা এখনও পরিদৃশ্যমান। তাদের আকৃতির পরিবর্তন খানিকটা ল্যাপ্লাসের অনুমানসদৃশ। তবে নীহারিকা থেকে গোলাকার আংটির পরিবর্তে মাঝে মাঝে স্প্রীংএর মত হাত বার হ'য়ে আসে এবং এই হাতগুলির এক

একটিতে যে পদার্থ আছে তা গ্রহ তো তুচ্ছ এক একটা তারা সৃষ্টি হ'তে পারে। তাই মনে হয় ল্যাপ্লাসের তথ্য গ্রহসৃষ্টির ক্ষেত্রে না হ'য়ে তারকাসৃষ্টির ক্ষেত্রেই বেশী প্রযোজ্য হবে।

বহুজন-পরীক্ষিত যে তথ্যটি সত্য ব'লে মনে হয় সেটি হ'ল জিন্‌স্-এর সৌর-জগৎ সম্বন্ধীয় তথ্যটি। তাঁর ধারণা—সৌরজগতের সৃষ্টি হ'য়েছে এক আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে। সূর্যের খুব নিকট দিয়ে হঠাৎ যাওয়ার সময় কোন এক নক্ষত্র সূর্যের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের আলোড়ন তোলে এবং ঐ নক্ষত্রের আকর্ষণে কিছু অংশ সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়; কিন্তু নক্ষত্রটি হঠাৎ আসার মত হঠাৎ চ'লে যাওয়ায় সূর্যের আকর্ষণের মধ্যে অবস্থিত ঐ বিচ্ছিন্ন পটলের মত অংশটি সূর্যকেই প্রদক্ষিণ ক'রতে থাকে। পরে পটলের বিভিন্ন স্থানের ভর বিভিন্ন থাকায় এক একটি ভরকেন্দ্র বিভিন্ন সময়ে ঠাণ্ডা হয় এবং কালে বিভিন্ন গ্রহের সৃষ্টি করে। এই তথ্যের মধ্যে বহু প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। প্রথমতঃ এই বিচ্ছিন্ন পটল আকৃতি পিণ্ডের সংগে পর্যায়ক্রমে সজ্জিত গ্রহগুলির আকৃতির যথেষ্ট মিল দেখা যায়। তাই বৃহস্পতি ও শনি পটলের স্ফীতস্থানে অবস্থিত। আবার দেখা যায় যে ঐ দুই গ্রহের প্রত্যেকটির নয়টি করিয়া ক্ষুদ্র উপগ্রহ বিদ্যমান। কিন্তু পৃথিবী ও নেপচুনের একটি করিয়া বড় উপগ্রহ আছে। ইহার কারণ এই যে বিভিন্ন ধৃতবস্তুর ঠাণ্ডা হওয়ার হারের উপর বিভাজন নির্ভরশীল। গণিত বলে যে জন্মের সময় যে গ্রহ যে অনুপাতে হাল্‌কা ছিল, সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য তাহার বিভাজনের সম্ভাবনা সেই অনুপাতে কম ছিল। কিন্তু একবার যদি বিভাজিত হয় তবে সে বড় উপগ্রহের জন্ম দিবে। সুতরাং এটা ধারণা করা মোটেই কষ্টের নয় যে বৃহস্পতি এবং শনি, নেপচুন এবং পৃথিবী অপেক্ষা বেশীদিন গ্যাসীয় অবস্থায় থাকায় তারা একাধিক উপগ্রহের জন্ম দিয়েছে। যেমন অপেক্ষাকৃত ছোট গ্রহদ্বয়—শুক্র এবং বুধের কোন উপগ্রহ নেই। অবশ্য অন্য দুটি গ্রহ মঙ্গল এবং ইউরেনস্‌কে নিয়ে কিছু বিপদে প'ড়তে হয়। পটলের আকৃতি ও গ্রহদের অবস্থান অনুযায়ী তাদের যে আয়তন হওয়া উচিত ছিল তা থেকে তারা ছোট। এ ছাড়া মঙ্গলের দুইটি এবং ইউরেনসের চারটি উপগ্রহ বিদ্যমান। ইহা কিরূপে সম্ভব হ'ল?

কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে গ্যাসীয় অবস্থায় হয়ত ক্ষুদ্রায়তনেই তাদের জন্ম হয়েছিল এবং এও হ'তে পারে যে তাদের তাপ বিকিরণের ক্ষমতা কম ছিল। মনে হয় তাই তাদের থেকে অনেক অংশ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে একাধিক উপগ্রহ সৃষ্টি ক'রেছে।

গ্রহের সৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও ল্যাপ্লাসের মত গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজত্ব ক'রেছে। ঐ সময় পদার্থ, রসায়ন, ভূ, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি উন্নয়ন ক্রমবর্দ্ধিত হারে বেড়ে চ'ল্‌লেও পৃথিবী বা অন্য গ্রহের উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা কিছু হয়নি। তাই একদিকে ল্যাপ্লাসের মত এবং অপরদিকে বাইবেলের গল্প—এই দুইয়ের মাঝে পিষ্ট হ'য়ে গ্রহবিদ্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌তে পারে নি।

বিজ্ঞানে নিত্য নূতন 'তথ্য' এসেছে এবং প্রয়োজনের তাগিদে সে সকলের মাঝে স্থান পাওয়ার চেষ্টা করেছে। সব তথ্যের মধ্যেই যে সমান সত্য নিহিত আছে তা নয়। জ্ঞাত সকল প্রকার ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে তথ্য ভবিষ্যৎবাণী ক'রবার ক্ষমতা রাখে বা ভবিষ্যৎ জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উদ্ভাসিত করে—সেই তো গতিশীল বিজ্ঞানের প্রকৃত তথ্য! অন্যথায় হয় সে মূল্যহীন—নতুবা ক্ষণ-ভঙ্গুর।

বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা আমাদিগকে জানায় যে কোন জটিল সমস্যার সমাধানের পথ যে ভাবে সূত্রগত হ'য়েছে তার উপর নির্ভর করে। আবার ঐ পথ ও তার সমাধান কোন্ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গৃহীত হ'য়েছে তার উপর নির্ভরশীল। ঘটনার মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান মিলে। কতকগুলি ঘটনার সাধারণী-করণের মাধ্যমে 'ধারণা' গড়িয়া উঠে। কিন্তু তাকে সত্য বলে গ্রহণ ক'রবার পূর্বে সংখ্যাগতভাবে তার যেমন চতুর্দিকে বিস্তৃত প্রয়োগ দরকার—তেমনই তথ্য দ্বারা তার সত্যতা নিয়ত যাচাই হওয়ারও প্রয়োজন। কোন একটি মৌলিক 'ধারণা' যদি সংশ্লিষ্ট সব রকম অবস্থার কারণকে ব্যাখ্যা ক'রতে সক্ষম হয়, তবে সে ধারণা 'তথ্যে' পরিণত হয়। কিন্তু তথ্য হওয়ার পূর্বে ঐ ধারণার নিখুঁত সংখ্যাগত বিস্তৃতি অপরিহার্য।

আমাদের আলোচ্য বিষয় সৌরজগতে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের উৎপত্তির

উৎস নির্ধারণ। পূর্বে যে সকল ধারণা বা তথ্যের অবতরণা করা হ'য়েছে তার কোনটি কি উপরোক্ত নিয়মানুসারে গঠিত? সে ধারণা বা তথ্য কি তৎসংলগ্ন সব বিষয়ের কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয়ে সক্ষম? সে তথ্য কি সৌরজগতের গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা, ধুমকেতু, ছায়াপথ প্রভৃতির কারণ নির্দেশ ক'রতে, এবং কল্পনা ও দৃষ্ট ঘটনার মধ্যে সব ব্যবধান ঘুচাতে সক্ষম? তার উত্তর দেওয়ার আগে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক যে সকল দৃষ্ট ও সমথিত ঘটনাগুলিতে আস্থাশীল—সেই ঘটনাগুলিকে নিম্নোক্ত চার শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে আলোচিত হ'চ্ছে। সংগে তার মাধ্যমে পূর্বালোচিত ধারণা বা তথ্যের সত্য-মিথ্যা যাচাই-এর চেষ্টা করা হবে।

(ক) কক্ষপথের সুনিয়ন্ত্রণ—গ্রহগণের কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকার, একই সমতলে অবস্থিত, সূর্য সহ সকলেই একই দিকে ঘূর্ণায়মান এবং সূর্যের বিষুবরেখা ও গ্রহগণের কক্ষতল প্রায় একই তলে অবস্থিত।

(খ) গ্রহগণের দূরত্বের সুনিয়ন্ত্রণ—গ্রহগণের মধ্যে দূরত্ব নিশ্চয়ই দৈবাৎ গ'ড়ে উঠেনি। গত শতাব্দীতে এই সুনিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হ'লেও অল্পদিন হ'ল তার ব্যাখ্যা সম্ভব হ'য়েছে।

(গ) দ্বিবিধ ধারায় গ্রহগণের বিভাজন (১) অন্তবর্তী গ্রহ—যেমন বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল। আকৃতিতে অপেক্ষাকৃত ছোট হ'লেও ঘনত্ব বেশী। এরা নিজ নিজ অক্ষের উপর ধীরে ঘুরে এবং এদের অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক উপগ্রহ বিদ্যমান। (২) বহির্বিভাগের গ্রহ—যেমন, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্ এবং নেপচুন। এরা আকৃতিতে বড়, ঘনত্ব কম, দ্রুততর বেগে ঘূর্ণায়মান এবং এদের বেশী সংখ্যক উপগ্রহ আছে। প্লুটো এই এলাকার মধ্যে আসে না। কারণ সৌরজগতের প্রান্তে অবস্থিত ব'লে এর কাছে সুনিয়ন্ত্রণ আশা করা উচিত নয়।

(ঘ) কৌণিক ভরবেগ (Angular momentum) বিতরণ—সূর্য সমগ্র সৌরজগতের শতকরা ৯৯ ভাগ ভরের মালিক হ'য়েও মাত্র শতকরা ২ ভাগ কৌণিক ভরবেগের অধিকারী, বাকী ৯৮ ভাগ ভরবেগ, সৌরজগতের অন্যান্য সকলের ভরবেগের যোগফল।

উপরোক্ত চারটি তথ্য বর্তমানের বৈজ্ঞানিকগণ সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করেন। এই তথ্যগুলির উপর ভিত্তি ক'রে যে গ্রহবাদের ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর তাকেই আমরা নিঃসন্দেহে ও নিঃসংশয়ে গ্রহণ ক'রতে পারি। আর তা না হ'লে ঘটনাকে অস্বীকার ক'রে আকাশকুসুম রচনাই সম্ভব হবে মাত্র। বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞগণ বর্তমানে প্রচলিত সব তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে কোন একটি তথ্য উক্ত ঘটনার এক বা দুইটিকে মাত্র বিশ্লেষণ ক'রতে সক্ষম। এমন কি তাঁরা এও দেখিয়েছেন যে সকল তথ্যের এলাকা আংশিক ভাবে প্রথম তিনটি ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। চতুর্থ ঘটনাকে পুরাতন কোন তথ্যই স্পর্শ ক'রতে পারে না।

কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা প্রকৃতির একটি মৌলিক নিয়ম। ভর এবং শক্তির সংরক্ষণশীলতার মত বহুভাবে পরীক্ষা ক'রে এবং যাথার্থতা প্রমাণ করা হ'য়েছে। কৌণিক ভরবেগ ঘূর্ণায়মান ভরের গতির পরিমাপক। এই নিয়ম অনুসারে কোন আবদ্ধ এলাকায় ঘূর্ণনের সংখ্যা সব সময়েই ধ্রুবক। সেই এলাকায় একটি হ'তে অন্যে কিছু আত্মসাৎ ক'রলে ঘূর্ণনের সংখ্যা সব সময়েই সমান থাক্‌বে—হ্রাসবৃদ্ধি হবে না।

এই প্রমাণিত তথ্যের উপর নির্ভর ক'রলে গ্রহবাদের তথ্য যাচাই করা যাবে। কাণ্ট এটিকে স্বীকার করেন নি। তাঁর ধারণা—নীহারিকা প্রথমে স্থির ছিল—পরে ঘুরতে আরম্ভ করে। উপরোক্ত নিয়মের ফলে কাণ্টের তথ্য মূল্যহীন হ'য়ে দাঁড়ায়। এই অসুবিধা দূর করার জন্যে ল্যাপ্লাস শুরু থেকেই ঘূর্ণায়মান নীহারিকাকে অনুমান ক'রলেন। সূর্য থেকে গ্রহগণের সৃষ্টি হ'য়েছে—ল্যাপ্লাসের এই ধারণা যদি সত্য হ'ত, তা হ'লে গ্রহগণের তুলনায় অনেক বেশী ভর বিশিষ্ট সূর্যের ভরবেগও খুব বেশী হ'ত এবং সেই কারণে তার ঘুরবার গতিও খুব বেড়ে যেত। কিন্তু আমরা, জানি যে সূর্যের ঘুরবার গতি খুবই কম—২৫ থেকে ২৭ দিনে সে নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করে। তাই অন্য ঘটনার কারণ নির্দেশে সক্ষম হ'লেও ল্যাপ্লাস এই কৌণিক ভরবেগের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছিলেন। এই এড়ানই তাঁর তথ্যে ফাটল সৃষ্টি ক'রে তাঁর বহু কষ্টার্জিত তথ্যকে বানচাল ক'রবার উপক্রম ক'রেছে।

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বিভিন্ন গ্রহবাদ আবার মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ ক'রেছে। উপরে পুরাতন মতবাদগুলির আলোচনা ক'রে—তাদের ত্রুটি দেখিয়ে বর্তমানের একটি নূতন ধারণা নীচে আলোচিত হ'চ্ছে। মনে রাখ্‌তে হবে যে ঐ গ্রহবাদেরও হয়ত একদিন ফাটল দেখা দেবে। তবে অধুনাদৃষ্ট ঘটনাগুলির সন্তোষজনক ব্যাখ্যাদানে সে বর্তমানে সক্ষম—এ ভরসা করা যেতে পারে।

বর্তমানে এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী সূর্য থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি স্বীকার করেন না। তাঁরা এটাও স্বীকার করেন না যে একটি বৃহৎ পদার্থপিণ্ড হ'তে সৌরজগতের সৃষ্টি হ'য়েছে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে তাঁরা দেখিয়েছেন যে আকাশে ভাসমান ছায়াপথ থেকে সূর্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ধূলিমেঘকে ছিনিয়ে নিয়ে তার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করাচ্ছে। গ্রহ-সৃষ্টি সম্বন্ধে ঐ শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের ধারণা নীচে দেওয়া হ'ল।

আকাশে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রূণ কঠিন পদার্থের সংযোজনে বৃহত্তর কঠিন পদার্থের সৃষ্টি হ'য়েছে। কালক্রমে ঐ সকল কঠিন পদার্থের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হ'য়েছে গ্রহ। পৃথিবী গ্যাসীয় থেকে তরল এবং পরিশেষে কঠিন পদার্থে পরিণত হ'য়েছে—এ তথ্য ভ্রান্ত। বিভিন্ন কঠিন পদার্থের ভাসমান ধূলি-মেঘ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে বিভিন্ন কক্ষে ঘূর্ণায়মান ছিল। এই মেঘ-ঘূর্ণী চলার পথে একে অন্যের সংঘর্ষে চূর্ণ-বিচূর্ণ বা সংযোজিত হয়। সংযোজনে আয়তন বাড়ে এবং ঘনীভূত ধূলি-মেঘের রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় পুনর্বার সংঘর্ষের সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পায়। বার বার এই সংঘর্ষ ধূলি-মেঘের গতি-শক্তির হ্রাস ঘটায় এবং তাদের বিভিন্ন গতিবেগের একটা সমতা আনে। ঘূর্ণায়মান অবস্থার এই ধূলি-মেঘ মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রভাবে ঘনীভূত হ'য়ে প্রথমে নক্ষত্রপুঞ্জ এবং পরে ধীরে ধীরে অল্প সংখ্যক বৃহত্তর-পিণ্ড বা গ্রহে পরিণত হয়।

ঘূর্ণায়মান ধূলি-মেঘের গ্রহে রূপান্তরিত হওয়ার প্রতিটি ধাপের বিবরণ দেওয়া এখনও খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সংযোজন ছাড়াও বিয়োজনের সময় চূর্ণিত ধূলি মাধ্যাকর্ষণের বলে বিধ্বস্ত পিণ্ডেই ফিরে এসেছে। সুতরাং উপর্যুপরি সংঘর্ষের মাধ্যমে পদার্থের সংযোজন এবং বিয়োজন—দুই প্রক্রিয়াই পিণ্ডের আয়তন ও

ভর বাড়াতে সাহায্য ক'রেছে।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে সমস্ত গ্রহ প্রায় একই তলে অবস্থিত থাকে কেন? কেনই বা তারা একই দিকে গতি পেল? সৌরমণ্ডলের মধ্যে কৌণিক ভরবেগের বিতরণেই এটা সম্ভব হ'য়েছে। এই কৌণিক ভরবেগ কি? ভর, রৈখিক গতি এবং অক্ষ হ'তে লম্বদূরত্বের গুণফলকে কৌণিক ভরবেগ বলে। সংঘর্ষ-জর্জরিত পিণ্ডদের মধ্যে কৌণিক ভরবেগের দেওয়া-নেওয়া চলে—যাতে সীমিত এলাকায় মোট কৌণিক ভরবেগের ভারসাম্য বজায় থাকে। সৌরজগতে ঘূর্ণায়মান সকল পদার্থেরই বিভিন্ন কৌণিক ভরবেগ আছে; কিন্তু বিভিন্ন গ্রহ-স্রষ্টিকারী বৃহত্তর পিণ্ডসমূহের মোট কৌণিক ভরবেগের দিকসমূহ বিভিন্ন নয়—প্রায় সমান্তরাল। তাই গ্রহসমূহ প্রায় একই কক্ষতলে অবস্থিত থেকে একই দিকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ধূলি-মেঘমণ্ডলের কক্ষপথ প্রথমে ডিম্বাকৃতি ছিল। কিন্তু সংঘর্ষের ফলে সকল কক্ষপথের সমতা রক্ষিত হ'য়েছে। কক্ষপথ তাই গড় গতির প্রভাবে বৃত্তাকারে পরিণত হ'য়েছে।

উপরোক্ত নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যথাযথ পর্যবেক্ষণ কর'লে দেখা যাবে যে গ্রহের আবর্তন ও উপগ্রহ সৃজন একই কারণের সূত্রে গাঁথা। নিজ অক্ষে আবর্তন ও সূর্যের চারপাশে নিজ কক্ষে প্রদক্ষিণ এক প্রক্রিয়া নয়। যখন ধূলি-মেঘ ধীরে ধীরে গ্রহে রূপান্তরিত হয়, তখন তাদের গতি শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পূর্বেই বলা হ'য়েছে যে গ্রহসৃষ্টির সময় পদার্থের বিভিন্ন শক্তি ও কৌণিক ভরবেগের গড় দেখা যায়। কিন্তু সংঘর্ষের সময় শক্তি ও ভরবেগের গড় সূত্রানুসারে বিভিন্ন হওয়ায় গ্রহের ভারসাম্য নষ্ট হয়। সেখানে কক্ষ-ভরবেগের তুলনায় গ্রহের সামগ্রিক ভরবেগ কম বা বেশী হয় এবং গ্রহকে নিজ অক্ষে ঐ একই দিকে আবর্তনে বাধ্য করায়।

গ্রহের সঙ্গে সঙ্গে একই পদ্ধতিতে উপগ্রহের সৃষ্টি হ'য়েছে। ঘূর্ণায়মান ধূলি-মেঘের সংঘর্ষের সময় কিছু কিছু অংশ ভাবী গ্রহ হ'তে বিচ্ছুরিত হ'য়ে পূর্বের গতিবেগ হারিয়ে নূতন ভ্রূণের সৃষ্টি করে। এই প্রকারে সৃষ্ট উপগ্রহ ধূলি-মেঘের চারদিকে প্রথমে ডিম্বাকৃতি পথে প্রদক্ষিণ করে। পরে গ্রহের নিয়মে তার পথও

বৃত্তাকার হয়। এইরূপে গ্রহ ও উপগ্রহ প্রায় একই সময়ে একই নিয়মে সৃষ্টি হ'য়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উপগ্রহ সৃষ্টি গ্রহ-সৃষ্টির একটি সম্পূর্ণাঙ্গ রূপ মাত্র।

পৃথিবীর উষ্ণতা সম্বন্ধেও গবেষণা হ'য়েছে উপরোক্ত ধারণাকে কেন্দ্র ক'রে। অন্যান্য গ্রহের ন্যায় পৃথিবীর সৃষ্টির সময় ধূলিমেঘের সংঘর্ষ ভ্রূণ গ্রহকে উত্তপ্ত করে বটে; কিন্তু শীঘ্রই সেই তাপের বিকিরণ ঘটেছে। সুতরাং গ্যাসীয়-তরল-কঠিন অবস্থায় পৃথিবীর ক্রমবিবর্তন কল্পনা করা অযৌক্তিক। সৃষ্টির সময় পৃথিবীর যে উষ্ণতা ছিল আজও তা বিদ্যমান। তাঁদের মতে পৃথিবীর বয়স প্রায় ৫×১০^{৯} বৎসর। প্রথম ২×১০^{৯} বৎসর বয়স পর্যন্ত তেজস্ক্রীয় উপাদানগুলি পৃথিবীর সর্বাংগে বিস্তৃত ছিল। পরে ভূত্বক দেখা দিল এবং সংগে সংগে ঐ উপাদানগুলি উপরকার স্তরের নিকটবর্তী হ'ল। পৃথিবীর জন্ম থেকেই ঐ উপাদানগুলির বিয়োজন আরম্ভ হ'য়েছে এবং বিয়োজনের ফলস্বরূপ তাপের উদ্ভব হ'য়েছে। ভূ-ত্বক প্রায় অপরিবাহী—ভিতরের তাপ ভূ-ত্বক ভেদ ক'রে সহজে বাইরে আসতে পারে না তাই তেজস্ক্রীয় পদার্থের বিয়োজন উদ্ভুত তাপ সংরক্ষিত হ'য়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরকে উত্তপ্ত রেখে আসছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ এই ভাঙ্গাগড়া পৃথিবীর জন্মের গোড়া থেকে চ'লে আস্‌ছে—এর বিশ্রাম নেই। বর্তমান বিজ্ঞানীর কাছে পৃথিবী আজ মৃত নয়—জীবন্ত।

পৃথিবী সম্বন্ধে উক্ত ধারণা পৃথিবীর সকল দেশের বিজ্ঞানীদের কাছে উপস্থাপিত হ'য়েছে। তার বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে—হয় আসল রূপ ধরা পড়বে—নতুবা পৃথিবীর জন্মের নূতন তথ্যপূর্ণ পথের সন্ধান মিলবে। বৈজ্ঞানিক কোন তথ্যই চিরন্তন নয়। জ্ঞানের বিস্তৃতি মানুষের সুসংহত চিন্তাধারাকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

পদার্থ রহস্য

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই পদার্থের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়ে আসছে। দেখি আগুনের আবিষ্কার ও ব্যবহার মানুষকে এক নূতন জগতে নিয়ে গেছে। দেখি মিশরীয় সভ্যতা চারু ও কারু শিল্পের অবদানে সমৃদ্ধ। মানুষ সেখানে ধারাল অস্ত্র তৈরী ক'রেছে—বস্ত্র রঙ্গীন ক'রেছে—কাঁচ ও এনামেল দিয়ে তৈরী আসবাবপত্রে ঘর সজ্জিত ক'রেছে। এই জ্ঞান নিশ্চয়ই পদার্থ এবং রসায়ন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা ছাড়া সম্ভব হয় নি।

পদার্থ জগতের দিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে তার বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপকে জল, মেঘ, গাছ, শিলা, ঘাস, ফুল, ফল, আমাদের দেহ, পোশাক প্রভৃতি রূপে সে প্রকাশমান। এই অগণিত রূপের শ্রেণী বিভাগ কিরূপে সম্ভবপর? গ্রীকগণ ঘনত্বের ক্রম অনুসারে পদার্থকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। (১) মাটি, (২) জল, (৩) বাতাস এবং (৪) আগুন। কারণ তাঁরা আগুনকে লঘু বাতাস ব'লে মনে করেছিলেন। প্রথমটি লঘু হ'লে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রূপে প্রকাশিত হয়। চতুর্থটি ঘন হলে বিপরীতক্রমে সে তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং পরে প্রথমটির আকার ও ঘনত্ব অর্জন করে। আলেস্ ধরলেন জলকে প্রাথমিক উপাদান হিসাবে—এনাক্সিমিনেস্ বাতাসকে—হেরাক্লিটাস বাছ্‌লেন আগুনকে। সিসিলির দার্শনিক এম্‌পেডোক্লেস্ বললেন যে বস্তু জগতের সব কিছুই উপরোক্ত চার উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত। এই গঠনের মূলে আছে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ জাতীয় দুইটি বিপরীতধর্মী স্বর্গীয় ক্ষমতা। এমন কি ইহারই কারণে মানুষে মানুষে কোলাকুলি—ইহার কারণে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা। মানুষের মনে বিশ্বাস আনার জন্য কাঁচা কাঠ পোড়ান হল—তাঁদের ধারণা ছিল যে পোড়ালে যে কোনও জিনিস তার মৌলিক উপাদানে বিভক্ত হয়। কাঠ পোড়ার সময় আগুন দেখা গেল—আরও দেখা গেল বাতাসে মিশে যাওয়া ধোঁয়াকে। কাঠের প্রান্ত থেকে বুদ্‌বুদ্ আকারে বার হ'ল জল—শেষে প'ড়ে রইল ছাই—যার গুণ

মাটির ন্যায়। এই পরীক্ষার নীতিগত ত্রুটি বহু ছিল এবং বহু শতাব্দী লেগেছিল তার সংশোধন হ'তে।

তবে গ্রীকদের এই অপরিণত চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। ডিমোক্রিটাস্ পদার্থের পরমাণু সম্বন্ধীয় তথ্য নিয়ে প্রবেশ করলেন রঙ্গমঞ্চে। একটি পদার্থকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করলে কি তার গুণ একই থাকে? একটি সবুজ পাতার সর্বশেষ ছিন্ন অংশও কি সবুজ? একটি চিনির দানার সর্ব কনিষ্ঠ ভগ্নাংশও কি মিষ্টি? তৎকালীন লোকের ধারণা ছিল যে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশটি ও পদার্থটি সমধর্মী। বজ্র-নির্ঘোষে প্রতিবাদ জানালেন ডিমোক্রিটাস্। এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থ বিভিন্ন। এই কারণে যে সকল পরমাণু দিয়ে ঐ দুই পদার্থ গঠিত তাদের আকৃতি, গঠন এবং গতি বিভিন্ন।

ডিমোক্রিটাসের এই দৃঢ় ঘোষণার মধ্যে আধুনিক কালের পদার্থ নীতির যথেষ্ট মিল দেখা যায়। কিন্তু গুণগতভাবে ঠিক হলেও পরিমাণগত তথ্যের অনুপস্থিতিতে ঐ মতবাদ শক্তিহীন হয়ে পড়লো। কারণ পরিমাণগত ফল ছাড়া তথ্যের বিশদ বিবরণ দেওয়া বা ভবিষ্যৎবাণী করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

Alchemist-দের পক্ষেও পদার্থের মৌলিক উপাদানের বিভাজন ফলপ্রসূ হ'ল না। তাঁরা প্লেটোর দর্শনে উদ্বুদ্ধ হ'লেন। ব'ললেন—মৌলিক উপাদান হ'ল তার রং—যেমন সোনা হ'ল সূর্যের পার্থিব ছায়া বা সূর্যের প্রতিভূ; রূপো হ'ল চাঁদের; তামা হ'ল শুক্রের এবং পারা হ'ল বুধের; লোহা হ'ল মঙ্গলের; টিন হ'ল বৃহস্পতির এবং সীসা হ'ল শয়তানের প্রতিভূ। তাঁরা মনে ক'রলেন সব পদার্থই ঊর্ধ্বগমনেচ্ছু। তাই অন্যান্য ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করলে পদার্থের এই স্বাভাবিক চলমান পথ সুগম হবে—এই আশা পোষণ করলেন তাঁরা এবং এই ধারণা চ'লল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

রবার্ট বয়েল প্রথমে পদার্থের ভিন্ন বিভাগের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করলেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর বিখ্যাত বই "The sceptical chymist" বার ক'রলেন। এই বই-এ তিনি জানালেন যে তাপ দিলেই পদার্থ মৌলিক উপাদানে বিশ্লেষিত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন তাপে পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা পায়, এবং তাপের

পরে কখনও কখনও ঐটির পরিবর্তে একটি জটিল পদার্থের উপস্থিতিও দেখা যায়। সোনাকে Aqua regis-এ দ্রবীভূত করে তা থেকে আবার পূর্বের সোনাকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ কি? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে ঐ দ্রাবে দ্রবীভূত হওয়ার এবং পরে নিত্য অবস্থায় পরিবর্তনের সময় সোনার পরমাণুগুলি অবিকৃত ছিল, তাই তিনি যৌগিক পদার্থ এবং মৌলিক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক পার্থক্যের প্রাচীর দাঁড় করালেন।

রবার্ট বয়েলের উক্ত মতবাদ পদার্থ বিশ্লেষণে প্রবল গতি আন্‌লো। দুর্বার বেগে খোঁজা চ'ললো—কোন্‌টি মৌলিক এবং কোন্‌টি যৌগিক। কিন্তু এই খোঁজা পর্ব চ'ল্‌লো দীর্ঘ দিন ধরে। ইতিমধ্যে এই মতবাদ বার বার ধাক্কা খেয়েছে তদকালীন রাসায়নিকদের কাছ থেকে। আগুনে পোড়ার রহস্য এই বিষয়ে ধোঁয়া ছড়াতে লাগলো। পদার্থ পোড়ালে 'কিছু একটা' বার হয়—এবং এই 'কিছু একটা' তাঁদের কাছে 'গন্ধক'। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই 'কিছু একটা'র নূতন নাম দিলেন তাঁরা। নাম হলো Phlogiston। এই বস্তুটির নাকি ঋণাত্মক ওজন আছে। বয়েল যখন দেখালেন যে তাপ প্রয়োগে পদার্থের ওজন বাড়ে—তখন তাঁরা তার ব্যাখ্যা করলেন এই ভাবে যে তাপ দিলে পদার্থে অবস্থিত Phlogiston চ'লে যায় এবং যেহেতু Phlogiston-এর ওজন ঋণাত্মক—সুতরাং তার অনুপস্থিতিতে পদার্থের ওজন বাড়বে বৈ কি?

বাতাসের যে ওজন আছে তা পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন বয়েল; কিন্তু এটা তখনও অজ্ঞাত ছিল যে বাতাস একটি মৌলিক পদার্থ নহে—উহা কতকগুলি গ্যাসের সমষ্টি। তৎকালে বাতাসকে একমাত্র গ্যাস হিসাবে ধরা হ'ত। অন্যান্য গ্যাসগুলি বাতাসেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ব'লে কল্পনা করা হ'ত। এমনকি হেনরী ক্যাভেনডিসের মত বিজ্ঞ লোকও জলকে একটি মৌলিক পদার্থ হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি জলকে বিশ্লেষণ করে যে দুটি গ্যাস পেয়েছিলেন তার একটিকে (অক্সিজেন) Phlogiston এবং অন্যটিকে (হাইড্রোজেন) Phlogiston-বিহীন বাতাস বলে ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেননি। তাই দেখি Phlogiston-এর মত এমন বিভ্রান্তকারী শব্দের আবির্ভাব বিজ্ঞান জগতে আর আসে নি।

দহন কার্যের মূল নীতি বার হ'ল পরিমাপ ও ওজনের মাধ্যমে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক কৃতকার্য হ'লেন পরীক্ষায়। খানিকটা পারাকে পরিমিত আবদ্ধ বাতাসে উত্তপ্ত করা হ'ল; পারার উপর লাল রংএর সর প'ড়লো এবং বাতাসের আয়তন হ্রাস পেল। সেই সরকে বেশী উত্তপ্ত করাতে তা দু'ভাগে বিভক্ত হ'ল—পারা ও গ্যাস। যে গ্যাস বার হ'ল—পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে তা হৃত বাতাসের আয়তনের সমান। তাই তাপে কিছুই নষ্ট হয়নি—রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র। তিনি আরও দেখলেন যে পূর্বের হ্রাসপ্রাপ্ত বাতাস দহনে বা প্রাণীর জীবনধারণে সাহায্য করে না। দুইটি বিপরীতধর্মী গ্যাস নিয়ে বাতাস গঠিত। এতে Phlogiston ভক্তেরা প্রচণ্ড আঘাত পেলেন।

ধীরে ধীরে পদার্থের শ্রেণী বিভাগ দেখা দিল সুষ্ঠুভাবে। একই পদার্থ যে কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থায় থাকতে পারে তা দেখান হ'ল, পদার্থ যে অসংখ্য অবিভাজ্য বস্তু দিয়ে গঠিত—এ তথ্য পূর্বেই স্বীকৃত হয়েছে। এখন জন ডালটন এসে তাদের পরিমাণগত গঠনের কথা উল্লেখ ক'রলেন। ব'ললেন এক যৌগিক পদার্থে দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ থাকতে পারে এবং একই যৌগিক পদার্থ গঠনে মৌলিক পদার্থগুলি সমহারে বর্তমান থাকে। তিনি আরও জানালেন যে ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক উপাদানের ওজন ভিন্ন ভিন্ন। আজ আমরা প্রায় শতের কাছাকাছি মৌলিক উপাদানের কথা জানি—তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন মাত্র ২০টির।

আণবিক সূত্রকে হাতিয়ার ক'রে পদার্থ বিশ্লেষণ চললো রাসায়নিক পদ্ধতিতে। এই রসায়নবিদ্দের প্রচেষ্টায় বার হ'ল পদার্থের অগণিত অবিশ্বাস্য নিখুঁত গঠন-পদ্ধতি—তার ব্যবহারিক মূল্য—কি যুদ্ধক্ষেত্রে—কি শান্ত সামাজিক পরিদৃশ্যমান হ'ল। কিন্তু জটিল রসায়ন জগতের সীমিত গণ্ডী পেরিয়ে পদার্থবিজ্ঞান জগতে এসে সে মুক্ত বিহঙ্গের মত স্বাধীনভাবে ডানা মেলে দিলো।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞান জগতে হলো নবযুগের সূত্রপাত। ১৮৯৫ খ্রীঃ থেকে ১৯০০ খ্রীঃ-এর মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের ধারণা আমূল পরিবর্তিত হ'ল। সব পদার্থের মূল উপাদান যে হাইড্রোজেন নয়—তার চেয়েও যে ছোট জিনিস

থাকতে পারে—তা পরীক্ষিত হ'ল। বিদ্যুৎপ্রাপ্ত এমন অনেক বস্তু আছে—যেগুলি হাইড্রোজেন থেকে অনেক ছোট। বায়ুমুক্ত মোটা কাঁচের নলের মধ্যে বিদ্যুৎ চালিত করলে কোন একটা বস্তু সরলরেখাক্রমে নলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্রোতের ন্যায় চলতে থাকে। সেটি কি? দেখা গেল সেটি বিদ্যুৎপ্রাপ্ত, এবং হাইড্রোজেন পরমাণু সেটির তুলনায় দু হাজার গুণ ভারী। প্রথমে সেটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। কিন্তু পরে তার স্বরূপ চেনা গেল—নাম দেওয়া হ'ল—ইলেক্‌ট্রন। পরীক্ষা ক'রে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল—কোন বস্তুকে বিদ্যুৎ চালিত করলে পূর্বাপেক্ষা তার ভর বৃদ্ধি পায়। ইলেকট্রনগুলির এই সমগ্রভর বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্যই সম্ভব। আবার ইলেক্‌ট্রনগুলি সাধারণ বস্তুর মত নহে—ইহা একটি বিদ্যুৎশক্তি মাত্র।

এই পর্যায়ে ইলেক্‌ট্রনসমন্বিত পরমাণুর আকৃতি কল্পনা করা কঠিন নয়। পরমাণুর পাশে বৃত্তাকার অক্ষে ইলেক্‌ট্রনের উপস্থিতি। কিন্তু কেবলমাত্র ইলেক্‌ট্রন দিয়ে পরমাণু গঠিত নয়। যেহেতু ইলেক্‌ট্রনগুলি অপরাবিদ্যুৎসমন্বিত এবং পরমাণুর কোন বিশেষ বিদ্যুৎ মাত্রা নাই—সুতরাং পরমাণুর মধ্যে এমন কিছু বিদ্যমান যা পরাবিদ্যুৎসমন্বিত এবং ইলেক্‌ট্রনগুলির বিদ্যুৎমাত্রার সমান। রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন সম্পর্কে একটি চিত্ররূপের অবতারণা করলেন। তাঁর মতে গোলাকার ইলেক্‌ট্রনগুলি পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নিউক্লিয়াসের চারিদিকে গোলাকার অক্ষে বিচরণ করে। তাদের মাঝে আছে সৌরজগতের মত শূন্য স্থান। ইলেক্‌ট্রনগুলির ব্যাস পরমাণুর ব্যাসের ১/৫০,০০০ গুণ। নিউক্লিয়াসের ব্যাস একটি ইলেক্‌ট্রনের ব্যাসের সমান।

উপরোক্ত পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর ক'রে বহু উল্লেখযোগ্য তথ্যের সন্ধান মিললো। অত্যন্ত ভারী ধাতু রেডিয়াম পরমাণুর জটিল চিত্ররূপ পাওয়া গেল। সব থেকে সরল ও হাল্‌কা পরমাণু হ'ল হাইড্রোজেনের। তার একটি ইলেক্‌ট্রন—তাকে সামাল দিচ্ছে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পরাবিদ্যুৎসমন্বিত অতিথি—নাম তার প্রোটন। কোন পরমাণুর ওজন নির্ভর করে তার প্রোটনের ওজনের উপর।

পদার্থবিজ্ঞানী বর্তমানে পরমাণু-চিত্ররূপে কেবলমাত্র কেন্দ্রে অবস্থিত নিউক্লিয়াস

নিয়েই সন্তুষ্ট নন। বিভিন্ন রশ্মির উপস্থিতি লক্ষ্য করে মত দিয়েছেন—সেখানে আছে বিদ্যুৎবিহীন এবং প্রোটনের মত ভরসমন্বিত—নিউট্রন; সেখানে আছে পরাবিদ্যুৎসমন্বিত এবং ভরবিশিষ্ট—পজিট্রন, আছে ইলেক্ট্রনের ন্যায় বিদ্যুৎসমন্বিত এবং গড়ে তার চেয়ে প্রায় দুইশত গুণ ভারী—মেশন; এ ছাড়া আছে বিভিন্ন রশ্মি। পরমাণুর ওজন যত বৃদ্ধি পাবে—তার গঠনের চিত্ররূপ হবে জটিল থেকে জটিলতর এবং সম্ভাবনা থাকবে তার আকৃতি-ভঙ্গের। অবস্থা বিশেষে পরমাণুগুলির মধ্যে এই ভাঙ্গন ধরে। কিন্তু এই ভাঙ্গনে যে শক্তির উদ্ভব হয় তা আসে কোথা থেকে? একই কারণে জানা দরকার—সূর্য বা তারকারাজি কোটি কোটি বৎসর ধরে যে শক্তি ক্ষয় করছে—তার পূরণ হচ্ছে কি উপায়ে? দেখা গেল হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে পরিবর্তিত হওয়ার কালে প্রবল শক্তির উদ্ভব হ'ল। সূর্য বা তারকাদির পরমাণুও হয়ত সেইভাবে নিত্য নূতন ভাবে পুনর্গঠিত হয়ে নূতন শক্তি সৃষ্টি করছে।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা পরমাণুগুলির ওজন তাদের নিউট্রন ও প্রোটনের ভর সমষ্টি অপেক্ষা কম। কেন এই কম হ'ল? নিউট্রন ও প্রোটনগুলির সংযোগকালে কিছু উত্তাপের প্রয়োজন হয়। কিছু ভর সেই উত্তাপে রূপান্তরিত হয়ে এই সংযোগ ঘটায়। কতটা ভর কতটা উত্তাপ দেবে—তা সমীকরণ সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন। আবার বিপরীতক্রমে পরমাণুর আংশিক ভরচ্যুতি হলেই দেখা দেবে প্রচণ্ড তাপশক্তি এবং ভয়াবহ বিস্ফোরণ। বর্তমান বিজ্ঞানী পদার্থবিদ্যার 'শক্তি' এবং রসায়ন বিদ্যার 'পদার্থের' মধ্যে সকল পার্থক্য ঘুচিয়ে তাদের সমন্বয় সাধন করেছেন। পরীক্ষা ক'রে দেখিয়েছেন যে অবস্থার তারতম্যে শক্তি পদার্থে এবং পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হ'তে পারে। তাপ সৃষ্টির জন্য এই নীতি অবলম্বন ক'রে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের পুনর্গঠন বা ভাঙ্গনের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে—তৈরী হয়েছে মানুষের জিঘাংসা প্রবৃত্তির উৎকট সফলতাদানে বিশ্বত্রাস 'এটম্ বোম্'।

পদার্থ অনুশীলনের বাকী তথ্য সত্যানুসন্ধিৎসু ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকদের হস্তে অর্পিত। তাঁদের জ্ঞানদ্যুতি অধুনাপরাজিত রহস্যাবৃত পদার্থ কন্দর উদ্ভাসিত করুক।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ

* * * *

[নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি গ্রন্থকারকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। বিশেষ পাঠের জন্য বইগুলি শিক্ষার্থীর উপকারে লাগিবে]

Heiss E. D., Obourn E. S., Hoffman C. W. Modern Science Teaching.

Saunders H. N. The Teaching of General Science in Tropical Secondary schools.

Sumner W. L. The Teaching of Science.

Owen C. Brewster. Methods for Science Masters.

Hoff. Secondary Science Teaching. Blakiston.

Nunn. Handbook for Science Teachers. Murray.

Science Masters' Association & I. A. A. M. The Teaching of Science in Secondary schools. Murray.

Westaway. Seience Teaching. Blackie.

Downing. An Introduetion to the Teaching of Science. University of Chicago Press.

Preston. The High School Science Teacher and His work. Mcgraw-Hill.

Proceedings of the First All-India Seminar on the Teaching of Science in Secondary Schools. A. I. C. S. E., Ministry of Education, Govt.of India, New Delhi.

* * * *